KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৪৪ সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher নীল পুরুষ
Title ছড়ার	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number 46/1 46/2 46/3 46/4 46/5	Year of Publication May 1985 Jun 1985 July 1985 Aug 1985 Sep 1985
	Condition : Brittle Good
Editor : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, অতীন্দ্রকুমার সরকার	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

অগস্ট
১৯৮৫

ব্রিটিশ ভারতে বামপন্থী রাজনীতির কী ভূমিকা ছিল? এখন তার ভূমিকা কী? ভবিষ্যতে বিপ্লব, না প্রতিবিপ্লব—কোন্‌টির সম্ভাবনা বেশি? **সুনীল সেনের** প্রবন্ধে এইসব প্রশ্ন আলোচিত।

মধ্যযুগে আরব বিদ্যাজীবীরা ছিলেন বুদ্ধি-মুক্তি আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা। আজ সেখানে তাঁদের চিন্তার স্বাধীনতাকে কী বর্বরভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে তারই পরিচয় এবারের **'দেশে বিদেশে'**-র আলোচনায়।

পূর্ব-বাঙলা থেকে বাংলাদেশ—এই অভিযাত্রায় নাট্যান্দোলনের ভূমিকা নিয়ে এবারের **'ঢাকার চিঠি'**।

'পথের পাঁচালী' দিয়ে ভারতের আর্ট-ফিলমের যাত্রা শুরু। পরের কুড়ি বছরে তৈরি কটি ছবি কালোত্তীর্ণতার দাবি করতে পারে? 'চলচ্চিত্র-বিচার' প্রবন্ধে **কিরণময় রাহার** প্রশ্ন।

এই সংখ্যা থেকে শুরু হল **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের** উপন্যাস—গত একশ বছর ধরে এক পির-পরিবারের উত্থান-পতন নিয়ে অতি-প্রাকৃত বিন্যাসে রচিত কাহিনী।

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ৪
অগস্ট ১৯৮৫
শ্রাবণ ১৩৯২

ভারতবর্ষে বামপন্থার স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ সুনীল সেন ২৫৯
কালিদাস-কাব্যে কয়েকটি আদিকল্প সুকুমারী ভট্টাচার্য ২৮০
চলচ্চিত্র-বিচার কিরণময় রাহা ৩১১

নগরে কৈলাসে, হা-ঘরে দাউদ হায়দার ২৭৬
কাঁচের গোলক তরুণ সেন ২৭৭
বাস্তবের সাদা বাড়িটায় সৈয়দ আমিনুল হক ২৭৮
যুগলে সুকুমার চৌধুরী ২৭৯

অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২৬৬
ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২৮৯
গ্রহান্তর নির্মলকুমার দাস ২৯৭
পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৩০৪

গ্রন্থসমালোচনা ৩১৬
অমলেন্দু দে, আবদুর রউফ, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়,
তুহিন চট্টোপাধ্যায়

ঢাকার চিঠি ৩২৬
সৈয়দ আবুল মকসুদ

আলোচনা ৩৩০
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বর্ণালী দাস

স্মরণে ৩৩৫
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ,
জগদীশ ভট্টাচার্য, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

পাঠকের দৃষ্টিতে ৩৪৬
কল্যাণকুমার দত্ত, তাপস রায়, তন্ময় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদচিত্র : রনেনআয়ন দত্ত

মুখপাতের ছবি। সুভো ঠাকুর

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

নানা ভাষা, নানা গল্প

চতুরঙ্গের অকটোবর ১৯৮৫ সংখ্যা ভারত-উপমহাদেশের ছোটোগল্প সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে।

আসাম থেকে গুজরাত, কাশ্মীর থেকে কেরালা—সুবিস্তৃত এই উপমহাদেশের নানান প্রান্তের গল্পে সজ্জিত এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রত্যেক ছোটোগল্প-অনুরাগী পাঠকের সংগ্রহে স্থানলাভের যোগ্য হবে।

বাংলাদেশ, নেপাল এবং পাকিস্তানের গল্পও এই সংগ্রহে বিন্যস্ত হবে।

প্রতিটি রচনাই উপস্থিত করবে অচেনা মানুষদের, অজানা পরিবেশকে।

এই সংখ্যার দাম **দশ টাকা**। সীমিত সংখ্যা ছাপা হবে। যাঁরা দু টাকা দিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করাবেন, তাঁরা ২০% কমিশনে, অর্থাৎ আরও ছ টাকা দিয়ে সংখ্যাটি পাবেন। নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে ৫ সেপটেমবরের মধ্যে।

গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

MCMXLIV MAY DAY MCMXLIV

DEDICATED TO MY COMRADES WHO ARE FIGHTING AGAINST AGGRESSION—*SUBHO TAGORE*

THE ENTIRE SALE PROCEEDS OF THIS FOLDER WILL GO TO THE RUSSIAN RED CROSS

ভারতবর্ষে বামপন্থার স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ

সুনীল সেন

মার্কস তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক লেখা 'এইটীনথ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্টি'-তে জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষুদ্র কৃষকদের ভূমিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, ভারতীয় বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে তা মনে রাখা ভালো। ফরাসি বিপ্লবের পরে ক্ষুদ্র জোতের মালিক কৃষকদের উদ্ভব ; ছড়ানো-ছিটানো এই ক্ষুদ্র কৃষকেরা যেন "আলুর বস্তা"। ক্ষুদ্র কৃষকের সমর্থন পেয়ে নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন হয়েছিলেন। যে রক্ষণশীল কৃষক তার "অতীত দেখে, ভবিষ্যৎ দেখে না", তার অবিচল আস্থা এবং সেনাবাহিনীর সাহায্য ভিত্তি করে তৃতীয় নেপোলিয়নের মতো "গ্রোটেসক মীডিয়োক্রিটি" ১৮৪৮-এর স্মরণীয় বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্বেচ্ছাতন্ত্র।

কেমব্রিজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, ভারতে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে নি ; স্বাধীনতা-আন্দোলন মূলত উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের সংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, বিষণ্ণ। পিছনের দিকে তাকালে বলা চলে, ভারতের আজাদি ঝুটো হয় নি ; সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ বছর বছর আত্মপ্রকাশ করলেও ভারতের অখণ্ডতা এখনও অটুট। লেসে ফেয়ার বর্জন করে ভারত পরিকল্পনার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। কোনো "গ্রোটেসক মীডিয়োক্রিটি"-র স্বেচ্ছাতন্ত্র দেশে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

কিন্তু কেন? এর উত্তর খুঁজতে হলে জাতীয় আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বামপন্থীদের ভূমিকা এসে পড়ে। শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ; এই শ্রেণীর ধ্যানধারণা জাতীয় আন্দোলনকে পিছনে টেনেছে। কিন্তু আর-একটি ধারা ছিল বিকাশমান। গান্ধীপর্বে দেখা গেল রাজনীতিতে কৃষকের আবির্ভাব, গ্রামে রাজনীতির প্রবেশ, কৃষকের চেতনার বিকাশ। উত্তরপ্রদেশে, গুজরাতে, বিহারে, বাঙলার মেদিনীপুরে সেই কৃষক পুরোভাগে এল যার দৃষ্টি ভবিষ্যতে প্রসারিত। ১৯৩৬ সালে বামপন্থীদের নেতৃত্বে সারা-ভারত কৃষকসভার প্রতিষ্ঠা থেকে জঙ্গী কৃষক-আন্দোলনের শুরু। কৃষক-আন্দোলনে দেখা গেল নতুন ভাবধারা, সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবের কর্মসূচী। বামপন্থীদের মডেল ফরাসি বিপ্লব আর রুশ বিপ্লব। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে প্রায় সমগ্র দেশে কৃষক-সংগ্রামের প্রসার আধুনিক গবেষণায় প্রতিফলিত। অবিভক্ত বাঙলার উনিশটি জেলায় তেভাগা সংগ্রাম, তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহ, বিহারে বকস্ত আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ, পুন্নাপ্রা-ভায়লারে শ্রমিক-কৃষকের অভ্যুত্থান

অবিস্মরণীয়। মনে হয়, কৃষকদের জাগরণ, তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাতীয় আন্দোলনের দিক-পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। গান্ধীপর্ব থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত অবিরাম কৃষক-আন্দোলন—এই ধরনের ঘটনা চীন ব্যতীত এশিয়ার অন্য কোনো দেশে দেখা যায় নি। যে গবেষণা শুধু শহুরে মধ্যবিত্তের উপর কেন্দ্রীভূত তা অত্যন্ত একপেশে। মনে রাখতে হয় যে, ফ্রান্সের মতো ভারতেও ক্ষুদ্রায়তন জমিতে চাষে নিযুক্ত কৃষক "আলুর বস্তা"-র মতো হলেও, এদেশে "এইটীনথ ব্রুমেয়ার" হয় নি। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে জমিদারি-জায়গিরদারিপ্রথা অবলুপ্ত হল, কৃষিসংস্কারের কার্যসূচী গৃহীত হল। সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লব হল না বটে, কিন্তু সামন্ততন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেল।

নেহরু সরকারের পিছনে ছিল সর্বস্তরের কৃষকের সমর্থন এবং সদা-স্বাধীন দেশের উচ্ছ্বসিত জাতীয়তাবাদ। ১৯৪৮-৫০ পর্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নেহরু সরকারকে উচ্ছেদ করার যে প্রচেষ্টা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি করেছিল, তা ব্যর্থ হয়। কমিউনিস্ট আন্দোলনে অবসাদ এলেও তা ছিল সাময়িক। তেলেঙ্গানা আর কাকদ্বীপের সংগ্রাম প্রত্যাহার করে কমিউনিস্ট পার্টি সংসদীয় পথ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিল ; অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী দলগুলিও কংগ্রেস-বিরোধী ভূমিকায় তখন অবতীর্ণ। বুরজোয়া শাসন মেনে নিয়ে সংসদীয় পথ অনুসরণের মূল্য দিতে হয়। ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনের পরে পারলামেনটে বিরোধী 'গোষ্ঠী'র (তখনও বিরোধীরা 'দল' হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি) নেতা এ. কে. গোপালন লিখেছেন : "এ এক নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ, নতুন মৈত্রী...আমার মতো যে কমিউনিস্টদের তেমন পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল না, আস্তানার অভাবে যাদের রাত্রে ঘুম হত না, তাদেই এই হঠাৎ বিলাসের স্রোতে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।" জারমান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বিপর্যয় অনেকের মনে পড়বে।

নেহরু-পর্বে গণতান্ত্রিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয় নি। স্বভাবতই সংসদীয় পথে বামপন্থী দলগুলির আস্থা অবিচল ছিল। নির্বাচনের সময় বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আসনবণ্টন মহাসমস্যার বিষয় হলেও একটা সমঝোতা হয়ে যেত। ১৯৫৭-র নির্বাচনে কমিউনিস্ট দল চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করে ; কেরালায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তাঁরা মন্ত্রিত্ব গঠন করেন। বুরজোয়া শাসনে পাশাপাশি একটি প্রদেশে কমিউনিস্ট মন্ত্রিত্বের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে অভিনব। অধ্যাপক গোপাল তাঁর শ্রেষ্ঠ বই জহরলালের জীবনীতে কেরালায় কমিউনিস্ট মন্ত্রিত্বের পতন সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করেছেন। কমিউনিস্ট মন্ত্রিত্ব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়, জমি থেকে প্রজা-উচ্ছেদ বন্ধ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি থাকায় বাগিচা-শিল্পের জাতীয়করণ করা হয় না। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্রিত্বকে কাজ করার সুযোগ দিতে নেহরু আগ্রহী ছিলেন, শুরু থেকে বিরোধী ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থ এবং রাজ্যের গভরনর রাও। শিক্ষা-বিল তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে। ক্যাথলিক চার্চ এবং নায়ার সম্প্রদায় তাদের লালিত অজস্র বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ চালু হবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট সরকারের উচ্ছেদের আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধে ; কেরল কংগ্রেস এই আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে অবস্থা জটিল হয়। নেহরু তখনো খোলা মন নিয়ে অবস্থা বিচার করার পক্ষপাতী। ১৯৫৮-র গ্রীষ্মকাল থেকে তাঁর মত পালটাতে থাকে, তাঁর মনে হয় কেরলের কমিউনিস্ট সরকার জনসমর্থন হারিয়ে ফেলেছে। কৃষ্ণ মেননের রিপোর্ট তাঁকে প্রভাবিত করে। ১৯৫৯-এর জানুয়ারিতে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়ে কেরালায় উগ্র কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ; নেহরুকে ইন্দিরা কতটা প্রভাবিত করেছিলেন, তা ঠিক পরিষ্কার নয়। ইন্দিরা কংগ্রেস-সভাপতি হবার অন্তত এক বছর আগে বিমোচন আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল। নেহরু স্বয়ং কেরালা সফর করে নামবুদিরিপাদকে নির্বাচনের পরামর্শ দেন। নামবুদিরিপাদ রাজি হন না ; ৯ই অগস্টে বিরোধীরা সুবিশাল মিছিলের আয়োজন করেন। অজয় ঘোষ এবং গোপালন প্রস্তাবিত মিছিল স্থগিত রাখতে নেহরুকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন ; নেহরু তাঁর অক্ষমতা জানান এবং ৩০শে জলাই কেন্দ্রীয় সরকার নামবুদিরিপাদ মন্ত্রিত্বকে বরখাস্ত করে।[১] এই পর্যন্ত গোপালের তথ্যের উপর আমরা নির্ভর করেছি। তিনি যা বলেন নি তা হল জনমানসে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া। কলকাতার রাস্তায় বিশাল বিক্ষোভ-মিছিল বর্তমান লেখকের মনে পড়ে। কেরালা নাটকের শেষ দৃশ্যে প্রতিফলিত হয় চরম রক্ষণশীল দলগুলির সাম্যবাদ-বিরোধিতা। সংসদীয় পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয়, মার্কসবাদী দলগুলির কাছে তা যেন আরো পরিষ্কার হল। কিন্তু সংসদীয় পথ থেকে তাঁরা সরে আসেন নি। ১৯৬৭-তে দেখা গেল, বিভিন্ন রাজ্যে অ-কংগ্রেসি সরকার গঠন ; একদলীয় শাসনে ফাটল অপ্রতিরোধ্য মনে হল। ১৯৬৯-এ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল ; ১৯৭৭-এ আবার ক্ষমতায় ফিরে এল বামফ্রন্ট সরকার (যে সরকারে সি পি আই ছিল না)। ১৯৮২-তে নির্বাচন হল ; বামফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হল। ভারতে বুরজোয়া গণতন্ত্র চুরচুর করে ভেঙে পড়বে—কিছু কিছু পণ্ডিতের এই ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এই পটভূমিকায় বামপন্থা এবং সংসদীয় পথ হয়ে গেল অবিচ্ছেদ্য।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট জগতে তুমুল আলোড়ন চলছিল, যার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আলোড়ন-সৃষ্টিকারী ঘটনা রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে গৃহীত নতুন নীতি : "যুদ্ধ অনিবার্য নয়" ; বিশেষ অবস্থায় ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে "শান্তিপূর্ণ উত্তরণ" সম্ভব। সশস্ত্র বিপ্লব ক্ষমতা দখলের একমাত্র পথ নয়। ক্রুশ্চভের গোপন রিপোর্টে প্রকাশিত হল স্তালিন-যুগে ব্যক্তিতন্ত্রের প্রসার এবং দমননীতি—অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩১ জন সভ্যের মধ্যে ৯৮ জন বন্দী আর নিহত হন চার বছরের মধ্যে। পোল্যানডের পোজনানে শ্রমিক-বিদ্রোহ (জুন, ১৯৫৬), হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ এবং রুশ সৈন্যের হস্তক্ষেপ—পঞ্চাশের দশকের এই ধরনের ঘটনাবলীর মধ্যে এক নতুন বাস্তব প্রতিফলিত। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের পক্ষে জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য ; তদুপরি বিভিন্ন দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশ অসমান। ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য কমিউনিস্ট জগতের বৈশিষ্ট্য। ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তোগলিয়াত্তির তীব্র মন্তব্য স্মরণীয় :

We must guard against a coerced uniformity ; we must believe that unity is achieved and maintained on the basis of diversity and the fullest autonomy of the individual countries[২].

ইতিপূর্বে লেনিনের নির্দেশে গঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী নির্ধারণের চেষ্টা কত অবাস্তব।

ক্রুশ্চভ-পর্বে—যে পর্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে অসামান্য—রাশিয়ার সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার বন্ধুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, গোমুলকার নমনীয় কৌশলের কল্যাণে পোল্যান্ডের অবস্থা আয়ত্তে আনা গেল, পুরনো স্তালিনপন্থীদের বিতাড়ন এবং কাদারের উদারনৈতিক সংস্কার হাঙ্গেরিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এই পর্বেই ঘটে চীন-রুশ মতাদর্শগত বিরোধ, যার পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হল এবং কমিউনিস্ট জগতে এল প্রথম ভাঙন। চীন-রুশ বিরোধের প্রভাব পড়ে ভারতীয় রাজনীতি এবং বিশেষত বামপন্থী আন্দোলনের উপর।

চীন বিপ্লবের শুরু থেকে বানদুং সম্মেলন পর্যন্ত ভারত-চীন সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। অধ্যাপক গোপালের লেখা পড়ে মনে হয়, চীন-ভারত সীমানা-যুদ্ধ নেহরু এবং কৃষ্ণ মেননের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তখন অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী দলগুলির কোনো সমস্যায় পড়তে হয় নি, দোটানায় পড়ে কমিউনিস্ট দল। সারা দেশে চলে কমিউনিস্ট-বিরোধী হিংস্র অভিযান, নামবুদিরিপাদ-সহ অনেক কমিউনিস্ট বন্দী হন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশরক্ষার প্রশ্নে অবিচল থাকে। ইতিপূর্বে দলের প্রতিনিধিরা চীনে গিয়ে বামপন্থী আন্দোলনের স্বার্থে ঝোউ এনলাইকে সীমানা-সমস্যা মিটিয়ে নিতে অনুরোধ করেন। ঝোউ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। মাওয়ের মত পরিষ্কার : "নেহরু-সহ ভারতের জাতীয় বুরজোয়া প্রতিক্রিয়াশীল।"[৩] অথচ পাকিস্তানের জাতীয় বুরজোয়া এবং আয়ুব খাঁ? এই পর্বেই চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্বের সূত্রপাত। সীমান্ত-যুদ্ধ থেমে গেল বটে, কিন্তু ভারত-সহ এশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন তখন গভীর সংকটে নিমগ্ন। তবে ইন্দোনেশিয়া ছাড়া (ওদেশের অত বড়ো কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তার ইতিহাস হয়তো অনেকের জানা আছে) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতো অবস্থা অন্য কোনো দেশে দেখা দেয় নি। ১৯৪৮-৫১-তে তীব্র মতাদর্শগত

সংগ্রাম পার্টিকে দুর্বল করলেও ভাঙতে পারে নি। ১৯৬৪-তে এল গভীর ভাঙন।

বুরজোয়া এবং পেটি-বুরজোয়া দলের ভাঙন পুরনো ইতিহাস। কংগ্রেস ভেঙেছে ; বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ভেঙেছে। পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল বেশি দিন ঐক্যবদ্ধ থাকে নি। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র পার্টি মুছে গেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি অংশ মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছে। আঞ্চলিকতাবাদ আশ্রয় করে ডি এম কে-র উত্থান, সে দলও ভেঙেছে। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। পেশাদার রাজনীতিবিদের দলত্যাগ ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গ। অসাধারণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী (সম্ভবত লেনিনের পরে তাঁর স্থান) অ্যানটোনিও গ্রামছির মন্তব্য মনে পড়ে :

Renegades are all the same, whatever party or ideal they have abandoned. They are all contemptible, you never know whether they were more insincere yesterday, or whether they are more insincere today[৪].

এতকাল একমাত্র কমিউনিস্ট দল ভাঙে নি। এবারে শুধু যে দলে ভাঙন এল তাই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক-সভা, ছাত্র ফেডারেশন, এমন কি মহিলা সমিতিও ভাঙল। ১৯৬৯-এ সি পি এম-এ ভাঙন ঘটল। নকশালবাড়ি আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে গঠিত হল সি পি আই (এম-এল) ; চারু মজুমদারের মৃত্যুর পরেই এই দল হল খণ্ড-বিখণ্ড। ১৯৬৯-৭১-এ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের তরাবহ তাণ্ডব চলল। অসংখ্য তরুণ কাডার—বিশ্ববিদ্যালয়ের কত কৃতী ছাত্র—ধ্বংস হয়ে গেল। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে ইতিপূর্বে এত ব্যাপক রাজনৈতিক হত্যা ঘটে নি। নিঃসন্দেহে বামপন্থার ভাবমূর্তি ম্লান হল, বিশেষত তরুণদের কাছে। অধুনা তরুণ বুদ্ধিজীবীদের যে বামপন্থা তেমন আকৃষ্ট করে না, সেটা একটা দৈবাৎ ঘটনা নয়। মনে রাখা ভালো, হিটলারের নাৎসী দলের প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র ছিল রাজনৈতিক হত্যা। রাজনীতিতে প্রবেশ করে লেনিন স্লেখানভের সঙ্গে মিলিত হয়ে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন নারদনিকদের (যাদের সঙ্গে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের পারিবারিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে) বিরুদ্ধে ; ১৯০৫-এ বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর স্টলিপিনের হিংস্র আক্রমণের মুখে বলশেভিক দল ব্যক্তিহত্যার আশ্রয় নেয় নি। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি কখনো সমর্থন না করলেও প্রায় দু বছর পুরনো দিনের নির্ভেজাল সন্ত্রাসবাদ অব্যাহত ছিল এই বিচিত্র রাজ্যে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, অতি স্পর্শকাতর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তখন ভগবান বুদ্ধের মতো নির্বিকার। প্রবন্ধে গল্পে কবিতায় ব্যক্তিহত্যার তাণ্ডবের ছায়া বেশি পড়েছে বলে মনে হয় না। বিবেকদংশনে বুদ্ধিজীবীরা কতটা ভুগেছেন তা ঠিক জানা নেই।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আলোচনা করা উচিত। লেনিন বলেছেন, শ্রমিকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্নত চিন্তা বিকশিত হবে না ; সমাজতন্ত্র আসবে বাইরে থেকে ("সোস্যালিজম মাসট কাম ফ্রম উইদাউট")। মার্কস, এঙ্গেলস, কাউটস্কি, রোজা লুকসেমবুরগ, প্লেখানভ, লেনিন, ট্রটস্কি, গ্রামছি, মাও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি। ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে মার্কসবাদ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মনে গভীর রেখাপাত করে, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রছাত্রী অনেক ঝুঁকি নিয়ে বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মজুর, কৃষক, ছাত্র, মহিলা আন্দোলন গড়ে তুলতে তাঁদের ইতিবাচক অবদান স্মরণীয়। বর্তমান লেখকের মনে পড়ে, চল্লিশের দশকে ছাত্রজীবন শেষ করে বা অসমাপ্ত রেখে অনেক বন্ধু গ্রামে গিয়েছিলেন রুশ নারদনিকের কল্পনাবিলাস নিয়ে নয়, কৃষক-আন্দোলন গড়ে তুলতে। গ্রামে গিয়েছেন এম-এ পাশ মহিলা। তাঁর আত্মজীবনীতে মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন, কত সামাজিক বাধাবিপত্তির মধ্যে গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরেছেন, অসীম ধৈর্য আর যত্ন নিয়ে গড়ে তুলেছেন মহিলা-কর্মীদের বাহিনী, যাদের অনেকে কৃষকের ঘরের মেয়ে।[৫] কিন্তু গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন রূপায়িত হল না। পঞ্চাশের দশক থেকে বুদ্ধিজীবীদের মূল্যবোধ, মনের কাঠামো, ধ্যানধারণার পরিবর্তন চোখে পড়ে। তাঁদের গ্রামে যাওয়া অধুনা স্বপ্নবিলাস। নিরাপদ জীবনে তাঁদের আগ্রহ। ভালো চাকরি পাবার সম্ভাবনাও বিস্তর দেশে এবং বিদেশে। উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীরা কেমন যেন ম্লান, বিবর্ণ, অরাজনৈতিক। বামপন্থী

আন্দোলনের অনেক বুদ্ধিজীবী নেতা—অজয় ঘোষ, ভবানী সেন, পি সি জোশী, ড. রামমনোহর লোহিয়া, সাজ্জাদ জাহির, ড. গঙ্গাধর অধিকারী, সোমনাথ লাহিড়ী, জয়প্রকাশ—বিগত। এঁদের মৃত্যু শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। শূন্যতা যাঁরা পূরণ করছেন তাঁরা মধ্যবিত্ত, কিন্তু বোধহয় তাঁদের ঠিক বুদ্ধিজীবী বলা চলে না। আগের মতো এখনো শ্রমিক-কৃষক কর্মীরা পিছনের সারিতে রয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক শহরে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন লুম্পেন প্রলেটারিয়েটের দাপট ; অনেক দলের স্তম্ভ এই শ্রেণী। শহুরে গরিবদের বিপ্লবী সম্ভাবনা নিয়ে নৈরাশ্যবাদী চতুর বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখছেন ; তাঁদের বক্তব্য : ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাভোগী শ্রমিকদের বিপ্লবী ভূমিকা বিশেষ নেই। সত্তরের দশকে বুদ্ধিজীবীরা কিছুটা অবসাদ কাটিয়ে উঠলেন ; এর পিছনে ছিল ভিয়েতনামের মহান প্রতিরোধ। বহু দিন পরে তাঁরা আবিষ্কার করলেন কৃষককে ; কৃষক এবং তার সংগ্রামের কথা অবশেষে গবেষণার বিষয় হল।[৬] এই ধরনের গবেষণার পথিকৃৎ মার্কসবাদীরা। বুরজোয়া লেখকদের কাছে নিম্ন বর্গের মানুষ এখনো অচ্ছুত। তবু মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা ভুল হবে। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁদের হস্তক্ষেপ সীমিত। তাঁরা যেন পিছিয়ে পড়ছেন। বুদ্ধিজীবীরা হতাশায় আচ্ছন্ন এবং সুযোগসন্ধানী হলে শারলাটনরা পুরোভাগে আসবে, ত্রিশের দশকে জারমানিতে যা দেখা গিয়েছিল।

বুদ্ধিজীবীর প্রসঙ্গে গ্রামছির মত জানা ভালো। ইটালির 'হিউম্যানিস্ট' ঐতিহ্যের তিনি অনুরাগী ; বুদ্ধিজীবীর চিন্তার স্বাধীনতায় তাঁর গভীর প্রত্যয়। বুদ্ধিজীবীর প্রধান কাজ সত্যের সন্ধান এবং বিজ্ঞানের উন্নতি। তিনিই উন্নত চিন্তাশীল যাঁর বিরুদ্ধবাদীর ভাবধারাতেও শ্রদ্ধা আছে। শোষিত শ্রেণী ক্ষমতায় এলে তাকে গড়তে হবে নতুন নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। নতুন সত্যের সন্ধানের কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত বিজ্ঞানীদের হাতে। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন "মেন অব সোবার মাইনড"। গ্রামছি 'সর্বহারার একনায়কত্বে' বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন, সেই একনায়কত্বের পাশাপাশি থাকবে বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা ; নতুন সমাজ গঠনে তার সহযোগিতা, তৎপরতা এবং গবেষণা একান্ত প্রয়োজন।[৭] লেনিনের মৃত্যুর পর আর কোনো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী চিন্তার স্বাধীনতাকে এত গুরুত্ব দেন নি।

এই প্রবন্ধের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়, সংসদীয় পথ এবং বামপন্থা অবিচ্ছেদ্য, কেননা দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো এখনো ভেঙে পড়ে নি। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিপ্লবের পথ, সামাজিক রূপান্তরের কর্মসূচী বামপন্থীরা কি বর্জন করেছেন? বুরজোয়া শাসনের মধ্যে সংসদীয় পথ অনুসরণের বিপদ আর ঝুঁকি বিস্তর, অনেক মার্কসবাদীর লেখায় তার উল্লেখ আছে। বিশ্বরাজনীতির নতুন বাস্তবের পটভূমিকায় পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কী ভাবে সংসদীয় পথ অনুসরণ করে চলেছে তা জানা দরকার। ওদেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য শতাব্দীর পুরনো ; গণতান্ত্রিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখতে, তাকে প্রসারিত করতে তারা আগ্রহী। পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ এখন আর অবাস্তব নয় ; পশ্চিম ইওরোপকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যাপকতম মোরচা গঠন তাদের প্রধান দায়িত্ব। নমনীয় কৌশল গ্রহণ করে বাস্তবের মোকাবিলা করতে হয়। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় তাদের নিরন্তর প্রয়াস। কখনো আংশিক, কখনো সাধারণ ধর্মঘটে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ প্রকাশিত। নিছক অর্থনীতিবাদে শ্রমিকশ্রেণী ডুবে থাকবে না, জাতীয় রাজনৈতিক প্রশ্নে তার হস্তক্ষেপের অজস্র দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির ভোট ১৯৭২-এ ছিল ২৭ শতাংশ, ১৯৭৬-এ ৩৪·৫ শতাংশ। ১৯৭৭-র ডিসেমবরে রোমে অভিযান করেন লক্ষ-লক্ষ শ্রমিক সরকারের পরিবর্তন দাবি করে ; এক মাসের মধ্যে সরকারের পতন ঘটে। ১৯৭৯-তে সরকারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা অনাস্থা জানালে, সরকারের আবার পতন ঘটে। অর্থনীতিতে বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বিনষ্ট করার জন্য তাঁরা কৃষক, দোকানদার, কারিগর এবং ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের নিয়ে মোরচা গঠন করেছেন ; শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন এই মোরচার সঙ্গে যুক্ত।[৮]

আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ কতটা নির্ধারক এবং কার্যকর হবে তা নির্ভর করে বামপন্থার নিজস্ব শক্তির উপর। গোটা দেশের দিকে তাকালে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে বামপন্থী আন্দোলন

এখনো দুর্বল শক্তি। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালা, বিহার বাদে সুবিশাল এই দেশে বামপন্থা ম্রিয়মাণ। স্বাধীনতার আগেও উত্তর ভারতে কমিউনিস্ট-প্রভাবিত কৃষক আন্দোলন কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল ; স্বাধীনতার পরে উত্তর ভারতে শক্তিশালী হয় জনসংঘ। ১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনের পরে সংসদে প্রধান বিরোধী দল তেলুগু দেশম, যে দলের রাজনীতি দুর্বোধ্য, আঞ্চলিকতাবাদ যে দলের প্রধান আশ্রয়। বিগত তিন দশকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, তবু মনে হয় শ্রমিক-আন্দোলনে লেনিন-বর্ণিত 'অর্থনীতিবাদ' প্রবল, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান হোয়াইট কলার শ্রমিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। কারখানায় অফিসে শুধু কংগ্রেসের নয়, বামপন্থীদেরও পৃথক ইউনিয়ন। কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকাশমান, বিশেষত পনজাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুতে ; খেতমজুর এখন জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। কিন্তু খেতমজুর আন্দোলন দানা বাঁধে নি। হরিজনহত্যার মধ্যে অনেক সময় যা প্রতিফলিত তা হল ভূস্বামী বনাম খেতমজুর দ্বন্দ্ব।

এই পটভূমিকায় আঞ্চলিকতা এবং বিচ্ছিন্নতা বিস্তার লাভ করেছে আসামে এবং পনজাবে। নেহরুর অসাধারণ তৎপরতার ফলে আসামে 'বাঙালি খেদাও' আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি, তখন নাগাল্যান্ড গঠিত হয়। ইন্দিরা-পর্বে আঞ্চলিকতাবাদের বিস্ফোরণ ঘটে। ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে আসামে কৃষক আন্দোলন দুর্বল থেকেছে ; বামপন্থীদের হস্তক্ষেপ যে তেমন কার্যকর হয় নি তা কার্যকারণহীন ঘটনা নয়। পনজাবে অকালি দল বরাবর সাম্যবাদ-বিরোধী এবং কংগ্রেস-বিরোধী ; দলের সামাজিক ভিত্তি জাঠ কৃষক, সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে বিপুল ধনী হয়ে এরা গ্রামাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অকালি দলের একটি অংশ 'খালিস্তান' দাবিতে অবিচল ; এদের পেছনে আছে ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং কানাডার বিত্তবান শিখদের সমর্থন। অনেকের ধারণা, কিছু বিদেশী শক্তির সমর্থন আছে এদের পেছনে। লক্ষ করবার বিষয়, পনজাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখনো ছড়িয়ে পড়ে নি ; অকালি দলের নেতৃত্বের একটি অংশ 'খলিস্তান' দাবি অগ্রাহ্য করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থানের মুখে দুই কমিউনিস্ট পার্টি সতর্ক ও সজাগ থেকেছে, কিন্তু সম্পন্ন জাঠ কৃষকদের মধ্যে অকালিদের প্রভাব অটুট। বাঙলার তেভাগা আন্দোলনের মতো কোনো জঙ্গী কৃষক আন্দোলন ১৯৬৪ থেকে আজ পর্যন্ত পনজাবে চোখে পড়ে নি।

সংসদীয় পথের বিপদ এইখানে। একদিকে বামপন্থার সীমিত শক্তি, অপর দিকে দেশের অখণ্ডতা আর স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী এবং নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অবিরাম আক্রমণ। এই অবস্থায় সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে গঠিত ব্যাপক মোরচার গুরুত্ব আগামী দিনে প্রতিভাত হবে। উগ্র বামপন্থীরা হয়তো মনে করেন, দেশে বিপ্লব আসন্ন। বর্তমান লেখকের ধারণা, তা স্বপ্নবিলাস। দারিদ্র্য, বেকারি, অনাহার, দুর্নীতি কালান্তরের কারণ না হয়ে নিঃশব্দ প্রতিবিপ্লবের কারণ হতে পারে। ১৯৩২-৩৩-এ জারমানির ইতিহাস অনেকের মনে পড়বে।

যারা শোষিত পদানত তাদের পাশে ত্রিশের দশক থেকে দাঁড়িয়ে আছেন বামপন্থীরা। সম্ভবত ভারতীয় রাজনীতিতে এটাই তাঁদের স্থায়ী অবদান। সামাজিক রূপান্তরের কার্যসূচী বামপন্থী আন্দোলনের অঙ্গ। আন্তর্জাতিক অবস্থা—পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ—সম্বন্ধে বামপন্থীরা, বিশেষত কমিউনিস্টরা অত্যন্ত সজাগ ; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলনে দেশে-দেশে কমিউনিস্টদের ভূমিকা এখন ইতিহাস। স্রোতের সঙ্গে অনেক সময় তাঁরা চলতে পারেন নি, বাম বিভ্রান্তি ঘটেছে। তবু আন্দোলনে ক্লান্তি আসে নি। শুধু দুনিয়ার ব্যাখ্যা নয়, তাকে বদলানো বামপন্থার মৌল লক্ষ্য। তাদের সামনে প্রশ্ন : বর্তমান বাস্তবকে অনুধাবন করে কিভাবে সামাজিক রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা যাবে।

পাদটীকা

[১] এস গোপাল, **জওয়াহরলাল নেহরু : এ বায়োগ্রাফি**, খণ্ড ৩, ১৯৮৪, পৃ ৫৫, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৭১।

[২] পি তোগলিয়াত্তি, **মেমোরানডাম**, নিউ এজ, সেপটেমবর ১৯৬৪।

[৩] এস গোপাল, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৩৭, ২২৩, ২৩০।

[৪] গ্রামছির উক্তি, গোপালের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১২০।

[৫] মণিকুন্তলা সেন, **সেদিনের কথা**, কলকাতা, ১৯৮২।

[৬] সত্তরের দশকে প্রকাশিত গ্রন্থ : এস সেন, **অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল**, ১৯৪৬-৪৭, নিউ দিল্লী, ১৯৭২ ; পি সুন্দরাইয়া, **তেলেঙ্গানা পীপলস স্ট্রাগল**, কলকাতা, ১৯৭২ ; ডি ধাঙ্গারে, **অ্যাগ্রেরিয়ান মুভমেনটস অ্যানড গান্ধীয়ান পলিটিকস**, আগ্রা, ১৯৭৫ ; জি পারুলেকর, **য়াদিবাসীজ রিভোলট**, কলকাতা, ১৯৭৫ ; এম এইচ সিদ্দিকি, **অ্যাগ্রেরিয়ান আনরেস্ট ইন নরথ ইনডিয়া**, দিল্লী, ১৯৭৮ ; এ আর দেশাই, **পেজানট স্ট্রাগলস ইন ইনডিয়া**, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯।

[৭] অ্যানটোনিয়ো গ্রামছি, **সিলেকশনস ফ্রম প্রিজন নোটবুকস**, নিউ ইয়রক, ১৯৭৫। ১৮৯১ সালে গ্রামছির জন্ম ; মুসোলিনির জেলে বন্দী থাকেন ১৯২৬ থেকে মৃত্যু ১৯৩৭) পর্যন্ত।

[৮] কার্ল মারজানি, **দ্য প্রমিস অব ইউরো-কমিউনিজম**, ১৯৮০, পৃ ১২০, ১২২, ২৪৬, ২৫৭।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

দায়রা জজ ফাঁসির হুকুম দিলে আসামি শফিউজ্জামানের একজন কালো আর একজন শাদা মানুষকে মনে পড়ে গিয়েছিল। এদেশের গ্রামাঞ্চলে শিশুরা চারদিকে অসংখ্য কালো মানুষ দেখতে-দেখতে বড় হয় এবং নিজেরাও কালো হতে থাকে। কিন্তু শাদা মানুষ, যার লোম ভুরু ও চুলও প্রচণ্ড শাদা, ভীষণ চমকে দেয়।

এর আগে শফিউজ্জামান 'বিপজ্জনক ব্যক্তি' ঘোষিত হন। একবার তাঁকে সাত বছরের জন্য জেলা থেকে নির্বাসিত করা হয়। ইংরেজের আইন একেক সময়ে ভারি অদ্ভুত চেহারা নিত।

কিন্তু শফিউদ্দিন ছিলেন আরও অদ্ভুত। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন মুসলিমদের ধর্মগুরু। শিষ্যরা তাঁকে বুজুর্গপির বলে মনে করত, যদিও পিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনিই জেহাদ করে বেড়াতেন মুলুকে-মুলুকে। তাঁর পুরো নামটি প্রকাণ্ড। সৈয়দ আবুল কাশেম মুহম্মদ বদি-উজ-জামান আল হুসায়নি আল-খুরাসানি।

বদিউজ্জামান ছিলেন যেমন অমায়িক, মিষ্টভাষী আর ভাবপ্রবণ, তেমনি খামখেয়ালি, জেদি আর হঠকারী। বারবার ঠাঁইনাড়া হওয়া ছিল স্বভাব। শফিউজ্জামানের জন্ম কাটালিয়া নামক পদ্মাতীরবর্তী এক গ্রামে। যখন তাঁর তিন বছর বয়স, তখন বদিউজ্জামান গেরস্থালি তুলে নিয়ে পোখরায় যান। শফির পাঁচ বছর বয়সে পোখরা থেকে বিনুটি-গোবিন্দপুর, দশ বছর বয়সে নবাবগঞ্জ, বারো বছর বয়সে কুতুবপুর, ষোলতে খয়রা-ডাংগা, আর পরের বছরই মৌলাহাট। শফির জন্মের আগেও এরকম ঘটেছে। তাঁর মা সাইদ-উন-নিসা, সংক্ষেপে সাইদা, সেইসব ঘটনা শফিকে হয়তো অনেকটা রঙ চড়িয়েই শোনাতেন। প্রথম স্টিমার দেখা ও ইলিশ খাওয়া আর প্রথম জঙ্গলের বাঘের মুখোমুখি হওয়ার রোমহর্ষক গল্প। একবার গোরুর গাড়িতে টাপরের পেছনকার পরদা তুলে হাত বাড়াচ্ছেন আর হাতে কচি আম ঠেকছে। এত আমের গাছ রাস্তার দুদিক থেকে ঝুঁকে এসেছে টাপরের ওপর। সেই আম খেতে খেতে শেষে পেটে নাড়ি-কচলানো ব্যথা। বুজুর্গ স্বামীর দোওয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া জল খেয়েই শেষে সেরে গেল। সারবে না কেন? মৌলানার সঙ্গে আসমান থেকে জিনেরা নিশুতি রাতে দলিজঘরে দেখা করতে আসত। জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়ত শাদা রোশনি। জিনেদের কণ্ঠস্বর ছিল গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো অর্থাৎ ধাতব ও সঙ্গীতময়। তাদের ভাষা সাইদা বুঝতেন না। তাঁর স্বামীবুড়ি মাঝরাত্তিরে বউবিবিকে জাগিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলতেন, জিনের সঙ্গে বদুর বাত-করা শুনতে চেয়েছিলে। ওই শোনো! সাইদা তখনও নাকি বালিকা। তাঁর স্বামীর বয়স তাঁর বয়সের আড়াইগুণ প্রায়। সাইদা বলতেন, আমাকে একবার জিন দেখাবেন বলায় উনি রাগ করে এক হপ্তা 'ইত্তেফাক' নিয়েছিলেন।

'ইত্তেফাক' শফি দেখেছেন। ব্যাপারটা আসলে নির্জনে মৌনীভাবে ঈশ্বরচিন্তা। কিন্তু বদিউজ্জামান তো পাহাড় বা অরণ্য এলাকার বাসিন্দা ছিলেন না যে পাহাড়ের গুহায় বা জনহীন জঙ্গলের ভেতর কুটির করে এক সপ্তাহের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ঈশ্বরচিন্তায় বসবেন। তিনি যেতেন মসজিদে। সব মসজিদই এদেশে পূর্বদুয়ারি। দক্ষিণপূর্ব কোনায় মশারি খাটিয়ে ঢুকে পড়তেন। মুসল্লি শিষ্যরা ওই কয়েকটি দিন যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নমাজ পড়ে যেত। নৈলে মসজিদ তো নমাজান্তে সামাজিক আলোচনার মজলিশ, কখনও বিচারসভাও। সেকারণে হই-হট্টগোলও চূড়ান্ত রকমের হয়ে থাকে। হুজুরে 'ইত্তেফাক'-ব্রত নিলে তারা তাঁকে বরং সাহায্য করত। মসজিদ এলাকায় জোরে কথা বলতে দিত না কাউকে। লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি কালো মশারির ভেতর আব্বা হারিয়ে গেলে বালক শফি খুব অবাক হয়ে যেত। তার বড়ভাই নূরুজ্জামান সুদূর দেওবন্দ মাদ্রাসায় তালেব-উল-আলিম—শিক্ষার্থী। মেজভাই মনিরুজ্জামান জন্ম-প্রতিবন্ধী। মুখ দিয়ে লালা বেরুত। নড়বড় করে পাছা ঘষটে উঠোন থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে ঘর, শেষে রান্নাশালে গিয়ে মায়ের পিঠে সেঁটে যেত। তাই শফিকেই আব্বার খাবার পৌঁছে দিতে হত মসজিদে। একে তো মসজিদের ভেতর আবছায়া, তাতে ওই কালো মশারি। খাবার পাশে রেখে শফি চোখদুটো তীক্ষ্ণ করে ভেতরটা দেখতে চাইত। আব্বার সঙ্গে কথা বলা বারণ। বললেও তিনি জবাব দেবেন না। কিন্তু শফির ইচ্ছে করত, মশারিটা একবার খপ করে তুলে দেখেই পালিয়ে যায়।

ভেতরে কী করছেন আব্বা? ওখানে কোনো জিনও ঢুকে পড়ে নি তো? কিংবা ভেতরে আব্বা আছেন তো? মুহুর্মুহু এইসব প্রশ্ন জাগত মনে। কখনও অজানা ভয়ে তার গা ছমছম করে উঠত। সেইসব মুহূর্তে তার ইচ্ছে করত, প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে উঠবে। অনেক কষ্টে এই ইচ্ছেকে দমন করত শফি। তারপর কোন মুসল্লি এসে পড়লে তাকে দেখে সে ভুরু কুঁচকে জিভ বের করে মাথা নাড়তে নাড়তে তার একটা হাত ধরে টানত এবং বাইরে নিয়ে যেত। ফিসফিসিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করত। শফি বলত, এ'টো থালা নিয়ে যেতে হবে না? সেজন্যেই তো বসে আছি। মুসল্লি বলত, সে ভার আমার। যানদিকিনি আপনি। ঘর যানদিকিনি।

ধর্মগুরুর বাড়ির ছেলে বলে কাচ্চাবাচ্চাদেরও লোকে আপনি-টাপনি করত। কিন্তু শুধুই মুখের ভক্তি নয়। বালক শফি দেখেছে, সারাবছরই কত জায়গার লোক দেখা করতে আসছে হুজুরের সঙ্গে। টাকাকড়ি ভেট দিচ্ছে পায়ের কাছে। কেউ আসছে গোরুরগাড়ি বোঝাই খন্দ ফলমূল নিয়ে। দলিজঘরের বারান্দায় জমে উঠছে শস্যের বস্তা। শাক-সবজির স্তূপ। পুকুরের মাছ। মুর্গি-মোরগ। আস্ত খাসি। আর কোরবানির পরবে তো দলিজঘরের একপাশে খেজুরতালাই বিছানো থাকত। আর তাতে জমে উঠত মাংসের পাহাড়। সত্যি পাহাড়। শফির চেয়ে উঁচু।

দয়ালু মৌলানা কিন্তু অনেকটাই বিলি করে দিতেন গরিব-গুরবোদের। রোজই ভিখিরির ভিড়, ফকির-ফাকরার ভিড়, মুসাফির লোকের ভিড় দলিজের সামনের চত্বরে। ওরা সবাই মুসলিম ছিল না। হিন্দুসমাজের নিচুতলার নিরন্নরাও এসে দাঁড়াত। কুনাইপাড়ার একচোখ কানা সরলাবুড়ি, যাকে মায়ের হুকুমে সল্লাপিসি বলতে বাধ্য হয়েছিল শফি, ইদ বা কোরবানির দিন সে খুব ভোরবেলাতেই এসে বসে থাকত ওই চত্বরে। একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ ছিল সেখানে। তখনও পাখ-পাখালি ডেকে ওঠেনি। বদিউজ্জামান দলিজঘরেই রাত কাটাতেন। সবে উঠে চাপাগলায় ঈশ্বরের প্রশস্তি উচ্চারণ করছেন। তামাচিনির বৃহৎ বদনা আর ময়রামুখো ছড়িটি হাতে নিয়ে মসজিদে ফজরের নমাজে যাবেন বলে দরজা খুলতেই 'আঁই বাবা!'

ওই ছিল সল্লাকানির সাড়া দেওয়া। এসেছে জানাতে আচমকা বেড়ালের মাঁও করে চেঁচিয়ে ওঠার মতো ওই দুটি শব্দ। নিঝুম দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সাইদা মেঝেয় বসে সুর ধরে বাংলা পুঁথি পড়ছেন। শাশুড়ি

কামরুন্নিসা চোখ বুজে শুয়ে কান করে শুনছেন। চৌকাঠের কাছে একদংগল পাড়ার মেয়ে জুটেছে। শুনতে শুনতে কেউ চুলছে। ভাদুর মা তো বারান্দায় গড়িয়েই পড়ত। ওদিকে ভাদু মাঠ থেকে ফিরে সারা পাড়া মা মা করে গর্জে বেড়াচ্ছে। এদিকে বাদশাহ নমরুদ খাটিয়ার শীর্ষে মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে তিনটে শকুনকে লোভ দেখিয়ে আসমানে উঠেছেন, হাতে তীরধনুক, খোদার বুকে তীর মারবেন। আর খোদা মুচকি হেসে ফেরেশতাকে বলছেন, বেচারা নমরুদকে খুশি করো। ওর ছুঁড়ে মারা তীরের ডগায় রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাও। তখন ফেরেশতারা রক্ত চেয়ে বেড়াচ্ছেন হন্যে হয়ে। শেষে মাছ দিল রক্ত। আর খোদা বললেন, হে মাছ, এর পর থেকে মরা অবস্থাতেও তুমি হারাম বলে গণ্য হবে না। সেই সময় আচমকা 'আই মা!'

ভাদুর মা তড়াক করে উঠে বসে চুল বাঁধতে লাগল। সদুর বউয়ের চুলুনি কেটে লালা মুছতে থাকল। বাকি মেয়েরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। কামরুন্নিসাও ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে মুখ তুলে বললেন, কৈ, সরো সরো। দেখি সল্লা কানিকে। সাইদা চাপাগলায় হুঁশিয়ারি দিলেন, চুপ চুপ। গলাবাজি কোরো না তো তোমরা। শুনতে পেয়ে নসিহত (ভর্ৎসনা) করবেন।

বদিউজ্জামান দলিজে। তাই এই হুঁশিয়ারি। শফি মায়ের আঁচল টেনে বলে, আম্মা! বলুন না, তারপর কী কী হল? তীরে মাছের রক্ত মাখিয়ে কী করল?

সাইদা চোখ পাকিয়ে বলেন, রক্ত না, খুন।

কেন আম্মা?

হিঁদুরা রক্ত বলে।

এসব ঘটনা কুতুবপুরে থাকার সময়। গ্রামটা ছিল বড়ো। হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান-সমান। মাঝখানটাতে নোম্যানস ল্যান্ডের মতো একটা চটান। নিমগাছের জঙ্গল। কী খেয়ালে বদিউজ্জামান কনিষ্ঠ পুত্রকে সেখানে নিসিং পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করিয়েছিলেন। নিমের জঙ্গলের ভেতর পায়েচলা পথ। চৈত্রমাসে নিমফুল ফুটে মিষ্টি গন্ধে মউমউ করত। গন্ধটা যখনই কোথাও পেয়েছে, শফির নাকে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঝাপটা মেরেছে। নিসিং পণ্ডিতের তামাকের গন্ধ। এক গন্ধ আরেক গন্ধের পেছনে ওত পেতে আছে। একটা কালো মানুষের পেছনে যেমন একটা শাদা মানুষ।

চটানটাকে বলা হত মানকের চটান। মানিক নামে কোনো লোক ছিল হয়তো। মানকের চটান পেরুলেই ছোট্ট ঘরে পাঠশালা। তালপাতার ছোট-ছোট চাটাই যার-যার তার-তারটা। সাইদা নিজের হাতে যত্ন করে শফির চাটাই বুনে দিয়েছিলেন। সফি সেই চাটাই ছিঁড়ে চিবুত। তার চেয়েও ধেড়ে পড়ুয়াদের ভিড়ে সে সবসময় সিঁটিয়ে থাকত।

শফির বৃত্তি পরীক্ষার আগেই বদিউজ্জামান তল্পি গুটোলেন কুতুবপুর থেকে। খয়রাডাঙ্গার মুসলমান জমিদার ইটের বাড়ি দিচ্ছেন হুজুরকে। সেখানে মিনার আর গম্বুজওয়ালা বিশাল মসজিদ। পাশে মাদ্রাসা, সারবন্দি তালেবুল আলিমদের থাকার ঘর। চত্বরে ফোয়ারা। ফুলবাগিচা। দুনিয়ায় যেন বেহেশতের একটিলতে প্রতিবিম্ব।

দেউড়িতে রোজ সন্ধ্যায় নমাজের পর নহবত বাজে। জমিদার আশরাফ খানচৌধুরি হুজুরের কথায় নহবত বন্ধ করে দিয়েছেন। ফরাজিমতে দীক্ষা নিয়েছেন। গানবাজনা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কড়া পরদার হুকুম জারি হয়েছে। খোঁড়াপিরের আস্তানায় হত্যে দেওয়া, মানত, আগরবাতি, পিদিম, কবরে মাথা ঠেকানো, জ্যৈষ্ঠের শেষ রবিবারে বৈকালিক মেলা—সবকিছু বন্ধ। পিরের খাদিম বা সেবক, যাঁর মাথায় জটা ছিল, গেরুয়া কাপড় পরতেন, ঝাড়ফুঁক করতেন, মাদুলি দিতেন, বেগতিক দেখে সদর শহরে পালিয়ে গেছেন। গুজব রটেছিল, বদুমোলানা একশো লোক নিয়ে থান ভাঙতে আসছেন। সদরে আবুতোরাব উকিলের মেয়ের কাঁধ থেকে হারামজাদা এক জিনকে ধরে জটাধারী খাদিম শিশিতে ভরেন এবং গঙ্গায় ফেলে দেন। কৃতজ্ঞ উকিল আদালতে তাঁর পক্ষ থেকে দরখাস্ত ঠুকেছেন নাকি। তা ঠুকুন। বদুমোলানা গঙ্গা থেকে শিশিবন্দি জিনটাকে উদ্ধার করবেন। তারপর কী হবে বোঝাই যায়।

এসব কথা শুনতেও পেতেন বদিউজ্জামান। কিন্তু এড়িয়ে থাকতেন। তিনি ফরাজি ধর্মগুরু। পূর্ববাংলার প্রখ্যাত ফরাজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজি শরিয়তুল্লার মুরিদ—শিষ্য। প্রচণ্ড পিউরিটান। হাত দুটো নাভির ওপরে রেখে নমাজ পড়েন। সুরা ফাতেহা আবৃত্তির পর উচ্চকণ্ঠে 'আমিন' বলেন। প্রার্থনারীতি ও ধর্মীয় আচরণে অসংখ্য এমন পার্থক্য মেনে চলেন অন্য তিনটি

মযহাব বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে। তবে জিনে তাঁর আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ পবিত্র কোরানে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, আমি জিন ও ইনসান (মানুষ) সৃষ্টি করেছি। জিন বানানো হয়েছে আগুন থেকে, মানুষকে মাটি থেকে। জিনরা অগ্নিজাতক। তারা আলোর মানুষ। বাস করে সপ্তস্তবক আসমানের কোনও একটি স্তবকে। (আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় অন্য একটি গ্যালাক্সিতে) কাজেই জিন আছে। জিন থাকলে দুনিয়ায় তাদের আনাগোনা ঠেকাবে কে?

নিসিং পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে বরং খুশিই হয়েছিল শফি। কথায়-কথায় বেত মারতেন পণ্ডিত। শফি ভীষণ অবাক হয়ে যেত। তাকে পাড়ার দাড়িচুলপাকা বুড়োরাও আপনি বলে! এমন কি শফি বিশ্বাস করত, তাদের বাড়ির লোকেরা মরবে না। কুতুবপুরে থাকার সময় তার আর একটি ভাই হয়েছিল। একবছর পরে একদিন সে পাঠশালা থেকে ফেরার সময় তার মরে যাওয়া শুনে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। এ তো অসম্ভব ব্যাপার। বাড়ি ফিরে কান্নাকাটি শুনে সে থ। তারপর প্রায়ই কবরখানায় গিয়ে ছোট্ট কাঁচা কবরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করত সামনের শ্যাওড়াগাছটার দিকে। শেষে রাগেদুঃখে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলত।

পণ্ডিতের বেতের কথা শফি বাড়িতে চেপে যেত। ভাগ্যিস মুসলমানপাড়ার কোনও ছেলে পাঠশালায় পড়তে যেত না। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক। তাই ছোটরা মসজিদে একজন ওস্তাদজির কাছে আরবি পড়তে যেত। ওস্তাদজিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল হুজুরের সুপারিশে। তিনি একদা তাঁর তল্পিবাহক 'তালেবুল আলিম' ছিলেন। এদিকে মেয়েরা পড়তে আসত সাইদার কাছে। উঠোনে সারবেঁধে বসে দুলে দুলে তারা পড়ত : আলেফ জবর আ। বে জবর বা। তে জবর তা।

কুতুবপুরে থেকে চলে যাওয়ার কথা শুনে শিষ্যদের সে কী হাউহাউ করে কান্না!

এসব সময় বদিউজ্জামানের চিরাচরিত একটি আনুষ্ঠানিক রীতি ছিল। একেবারে শেষ সময়ে মসজিদে নমাজের পর ভাষণ শুরু করতেন : বেরোদানে ইসলাম—ইসলামের ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ পাক আমাকে জিন্দেগি-ভর রাহি মুসাফির করেছেন। যদি বলেন, আপনার দেশ কোথায়? আমার কোনো দেশ নেই ভাইসকল! আমার দেশ সারা দুনিয়া।

এরপর হুজুর গ্রামবাসী মোমিনবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন আবেগমাখা কণ্ঠস্বরে। প্রতিটি ছোটবড় ঘটনা উল্লেখ করে বুকে হাত রেখে বলতেন, সব আমার দেলে গাঁথা রইল। ভুলি নাই। ভুলব না। তবে আমার আবার সময় হয়েছে, 'উঠো মুসাফির, কদম বাড়াও, আগেসে এক মঞ্জিল হ্যায়।'

শিষ্যবৃন্দ (সমস্বরে)॥ হুজুর! হুজুর! এ কী বলছেন! এ যে আসমান থেকে বাজ এসে পড়ল মাথায়।

(প্রবল কান্নার ধ্বনি)

হুজুর॥ ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ বলেছেন, কিছু চিরস্থায়ী নয়। কেউ কাউকে বেঁধে রাখতে পারে না। তাই আল্লাহ বলেছেন, কোনোকিছুর জন্য শোক হারাম। মৃতের জন্য শোক হারাম। নষ্ট হওয়ার জন্য শোক হারাম। কিছু হারানোর জন্য শোক হারাম। যে তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে, তার জন্য শোক হারাম।

(কান্নার ধ্বনির শ্বাসপ্রশ্বাসে রূপান্তর। চতুর্দিকে ফোঁস-ফোঁস নাক ঝাড়ার আওয়াজ।)

সর্দারশিষ্য (কাঁধের ডোরাকাটা রুমালে চোখ মুছে)॥ হুজুর, এদফা আপনার মঞ্জিল কোথায়?

হুজুর (বিষণ্ণ হেসে)॥ খয়রাডাঙ্গা।

সর্দারশিষ্য (নাক মুছে)॥ জায়গা ভালো। জমিদার মোছলমান। কিন্তু আমরা যে এতিম হয়ে গেলাম হুজুর।

হুজুর (চোখ মুছে)॥ আল্লার হাতে আপনাদের রেখে যাচ্ছি। নজর রাখবেন, যেন আউরত লোকেরা বেপর্দা না হন। গানবাজনা যেন না শোনা যায়। মোহররমে আর যেন তাজিয়া জুলুস গ্রামে না ঢোকে। কেউ যেন পিরের থানে মানত দিতে না যায়। কেউ নমাজ কামাই করলে জরিমানা করবেন। দোসরা বার করলে সাত হাত নাক খবদা সাজা দেবেন। তেসরা বার করলে পঁচিশ কোড়া মারবেন। আর তারপর করলে গ্রাম থেকে নিকালে দেবেন শয়তানকে।...

হুজুর চলে গেলে সেসব অবশ্য কিছুই করা হত না। কারণ তাতে দলাদলি ও হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল। মেয়েরা আবার বেপরদা হয়ে মাঠে মরদ-ব্যাটাদের নাশতা দিয়ে আসত। শাদি লাগলে ঢোল বাজিয়ে গীত গাইত আগের মতোই। নাচত এবং সঙ দিত। পাশের গাঁয়ের হানাফি

মর্যহাবের যোয়ানরা মোহররমের মিছিল এনে খবর পাঠাত ঢুকবে নাকি এবং অনুমতিও পেত। তবে প্রধান ফরাজিরা দেখে না-দেখা বা শুনেও না-শোনার ভান করে আড়ালে গিয়ে বসত। বাংলা পুঁথিগুলো বানান করে-করে সুর ধরে পড়ত : 'লাখে লাখে মরে লোক কাতারে কাতারে/ শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার।...' সেই কবে এসে ইরফান মৌলবি বাংলা মক্তব খুলেছিলেন। তখনই কিছু লোকে যা বাংলা হরফ শেখা, শ্লেটে দাগড়া দাগড়া 'ৰবরে অ, স্বরে আ।' পাচন আর লাঙ্গলের মুঠিধরা হাতে দড়কচা পড়ে গেছে। ধান পুঁতে হাতে পায়ে হাজা।

খয়রাডাঙ্গায় গিয়ে একটা বছর না কাটতেই আবার তল্পিপ গুটোলেন বদিউজ্জামান। জমিদার সাহেব হুজুর-কে দেখে আসন ছেড়ে সালামের জবাব দেন নি। সেদিনই সন্ধ্যায় কজন অনুগত শিষ্যকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, এশার নমাজের পর রওনা হবেন সেকেন্ডা। খান কতক গাড়ি এখনই দরকার।

বদিউজ্জামানের সংসার সবসময় তৈরি থাকত, হুকুম জারি হবে, উঠে পড়ো, গুটিয়ে নাও। কিন্তু খয়রাডাঙ্গা থেকে যেমন করে উঠে পড়তে হয়েছিল, সে যেন একটা শেকড় ওপড়ানোর ব্যাপার। সেই প্রথম ইটের ঘরে থাকা। প্রথম নিজস্ব একটি ইন্দারা। আর শফির বয়স তখন প্রায় ষোল। পৃথিবীর কিছু কিছু কুয়াশা তার চারপাশ থেকে অপসৃত। সেই প্রথম সে বন্ধুতার স্বাদ পেয়েছে। যৌনতা বুঝেছে। তার কষ্ট হচ্ছিল খয়রাডাঙ্গা ছেড়ে চলে যেতে। এখনকার মেয়েরা তার চোখে পরি হয়ে উঠেছিল।

মৃদু আপত্তি করেছিলেন সাইদা। কিন্তু বদিউজ্জামান অমনি অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন, খামোশ বুড়বক ঔরত!

কামরুন্নিসা তখন চলচ্ছক্তিরহিত। ধরে ওঠাতে হয়। খাইয়ে দিতে হয়। অর্ধাঙ্গে পক্ষাঘাত। শুধু বললেন, কেন বেটা? বদিউজ্জামান জবাব দিলেন না। জোব্বার আস্তিন গুটিয়ে কেতাব গোছাতে থাকলেন। এইসব সময় তাঁবেদার জিনেরা এসে যেত মানুষের চেহারায়। সামান্য সময়ের মধ্যে লটবহর তারা ছাড়া কে গোছাতে পারবে?

অনেক পরে শফি বুঝতে পেরেছিল আব্বার খয়রাডাঙ্গা ছাড়ার কারণ কী। খোঁড়া পিরের প্রতি নবদীক্ষিত ফরাজিদের গোপন ভক্তি থেকে গিয়েছিল। তারা বাইরে ফরাজি হলেও ভেতর-ভেতর হানাফি। তাছাড়া মাদ্রাসার আলেমরা বদিউজ্জামানের একাধিপত্য বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তার চেয়ে বড় কথা, তাঁরা ফরাজি মত মেনে নেন নি। এমন কী 'বাহাছ্' অর্থাৎ প্রকাশ্য তর্ক-যুদ্ধেরও ডাক দিয়েছিলেন। জমিদারসাহেব বিব্রত বোধ করছিলেন। বদিউজ্জামানের বহু ব্যাপারে বাড়াবাড়ি দেখে বিরক্ত হচ্ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত। বাংলা উপন্যাস ভালবাসতেন। বিকেলে আরাম-কেদারায় বসে থাকতেন এবং মাদ্রাসা থেকে পালা করে একজন পড়ুয়া এসে তাঁকে উপন্যাস পড়ে শোনাত। এমন কি আলবোলায় তামাক খাওয়া তাঁর আজীবন অভ্যাস, কিন্তু ফরাজি হওয়ার পর ধূমপান হারাম গণ্য। বদিউজ্জামান নাকি তাঁর কাছে গেলে তামাকের গন্ধ পেতেন এবং ধর্মগুরুসুলভ ভর্ৎসনা, যাকে বলা হয় 'নসিহত', করতেন। লোকের সামনে শাস্ত্রীয় এই ভর্ৎসনা সহজ মনে মেনে নিতে পারছিলেন না জমিদারসাহেব।

মাসটা ছিল চৈত্র। আগের বর্ষায় ভাল বৃষ্টি হয় নি। রাস্তাঘাট শুকনো খটখটে। বারো ক্রোশ দূরে সেকেন্ডা যেতে সিধে নাকবরাবর রাস্তাই বেছে নেওয়া হয়েছিল। শীতলগাঁয়ের কাছে মৌরালা নদী পেরুলে তিনক্রোশের একটি অনাবাদি মাঠ পড়ে। উলুশরার মাঠ। আসলে মাঠ নয়, উলুকাশের জঙ্গল। শীতের শেষে সেখানে গাড়ি চলার রাস্তা হয়ে যায়। রাস্তা বলতে শুধু কাশবন ভেঙে দুটি চাকার দীর্ঘ আঁকাবাঁকা দাগ। তারপর আবার উঁচু মাটির আবাদি মাঠ। সেখানে আবার স্থায়ী সড়ক। সেকেন্ডা পৌঁছুতে পরদিন বিকেল হয়ে যাবে।

এবার তল্পিপ গুটোনোর সময় সেই আনুষ্ঠানিক রীতির ব্যতিক্রম ঘটালেন হুজুর। তবু খবর পেয়ে ছোটখাট একটা ভিড় হল। গম্ভীর হুজুর দুচার কথার কৈফিয়ত দিলেন। কিন্তু অন্ধকারে কোনো ক্রন্দন শোনা গেল না। না কোনো দীর্ঘশ্বাস। সাতখানা গোরুর গাড়ি, দুখানায় টাপর চাপানো। পেছনে পাঁচখানা গাড়িতে গেরস্থালির লটবহর। শেষের গাড়ির পেছনে বাঁজা গাইগোরু মুশ্নি টানটান করে বাঁধা। নিঃসন্তান প্রাণীটি ছিল ভীষণ বৈরাগিনী। দড়ি ছেঁড়ার তাল করত। বারবার নিখোঁজ হয়ে বিস্তর ভোগাতও শফিকে।

ধাড়ি ছাগল কুলসুম সওয়ার হয়েছিল দ্বিতীয় গাড়ির টাপরের পেছনে। তার দুদিনের ছানাদুটোকে এক প্রধান শিষ্য পেছনের খোলাগাড়িতে কোলে নিয়ে বসে ছিল। বেচারি সারারাত ঘুমোতে পারে নি। কিন্তু খয়রাডাঙ্গার শিষ্যদের মধ্যে সেই ছিল হুজুরের সবচেয়ে অনুগত মানুষ। পুণ্যের লোভ ছিল তার অসম্ভব বেশি। ভোর-বেলা যখন এই অদ্ভুত কারাভাঁ শীতলগাঁয়ের নদীটির ধারে পৌঁছুল, তখন তার মার্কিন লুঙ্গি এবং ফতুয়া হলুদ হয়ে গেছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রায় বুজে-যাওয়া নদীর শুকনো বালিতে গাড়িগুলো দাঁড়ানোমাত্র সে ছানা দুটিকে নিয়ে লাফ দিল। সেখানেই তাদের ছেড়ে দিয়ে নদীর হাঁটুজলে উপুড় হয়ে পড়ল।

ছানাদুটি লম্ফঝম্ফ করে মাকে ডাকছিল। কুলসুমকে নামিয়ে দেওয়া হল তাদের কাছে। তখন কুলসুম ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তাদের দুধ খেতে দিল এবং ক্ষুদে লেজ দুটোকে দুধারে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শুঁকতে থাকল।

বদিউজ্জামান ক্ষীণ নদীস্রোতের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চটি খুলে রেখে তামচিনির বদনাটিতে জল ভরলেন। কিনারায় বসে উপাসনার প্রক্ষালন 'ওজু' সেরে নিলেন। সাতখানা গাড়ির সাতজন গাড়োয়ান আর তিনজন শিষ্য নদীতেই ওজু করল। তারপর হুজুরের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার বালির ওপর ফজরের নমাজ শুরু হল। সামনে হুজুরের পরিচিত ময়ূরমুখো ছড়িটি পোঁতা।

ঠিক এইসময় নদীর ওপারে পশ্চিমে ঈষৎ উঁচু পাড়ের ওপর ভোরের ধূসর আলোয় একটি ছায়ামূর্তি ফুটে উঠল।

দ্বিতীয় টাপর চাপানো গাড়ির ভেতর ছিলেন সাইদা, তাঁর রুগ্ণা শাশুড়ি আর কিশোর শফি। সাইদা গাড়ির আড়ালে বদনা নিয়ে নেমেছিলেন। প্রার্থনাকারীরা অন্য-দিকে রয়েছে দেখে আশ্বস্ত হলেন। তারপর বাকি দিক-গুলিকে দেখে নিলেন। সেসব দিকে কোনো বেগানা মরদ-লোক আছে কি না, এতে নিঃসংশয় হওয়ার পর পা বাড়ালেন নদীর দিকে। এসব সময় তাঁকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়া পাখির মতো লাগে। নড়বড় করে পা ফেলেন। দুনিয়ার প্রকাশ্য মাটিতে হাঁটতে তাঁর যেন কষ্ট হয়। বহুকাল ধরে পাতার তলায় চাপাপড়া ঘাসের মতো বিবর্ণ তাঁর গায়ের রঙ। সামান্য দূরে একটি কাশঝোপ তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কিছুতেই যেন পৌঁছুতে পারছিলেন না সেখানে। সারারাত গাড়ির ঝাঁকুনিতে শরীর অবশ। গিঁটে গিঁটে ব্যথা হয়ে গেছে। আর এই নরম বালি। বিব্রত বোধ করছিলেন সাইদা। এখনই যে সুরুজ বেরিয়ে পড়বে পুবে! দাগকাটা দুধের সরের মতো সেখানে মেঘ জমে আছে আর ক্রমশ লাল আভা ফুটে উঠছে। সাইদা যেন পয়গম্বর এব্রাহিমের পরিত্যক্তা নির্বাসিতা স্ত্রী বিবি হাজেরার মতো বিশাল মরুভূমিতে জলের খোঁজে ছুটে চলেছেন।

শফি সারারাত ঘুমোতে পারে নি। খয়রাডাঙ্গা তাকে পেয়ে বসেছিল। কতবার তার ইচ্ছে করছিল, চুপিচুপি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিল সে। মাদ্রাসার পেছনে বটগাছটার তলায় মৌলবি নাসিরুদ্দিনের মেয়ে জহুরা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার স্বপ্নটা ভেঙে গেল। একটানা শোঁ শোঁ ঘস ঘস অদ্ভুত শব্দ শুনে সে উঠে বসল। পর্দা ফাঁক করে দেখল বালির চড়ার ওপর গাড়ি চলেছে।

গাড়ি থামলে সে লাফ দিয়ে নেমেছিল। তারপর ঘুরে নদীর ক্ষীণ স্রোতটার দিকে তাকাতেই স্বপ্নের কষ্টটা চলে গেছে। সে দৌড়ে নদীর জল ছুঁয়েছিল। তারপর আব্বা তাকে ডাকলেন, শফিউজ্জমান!

শফি সাড়া দিয়ে বলল, জি!

ওজু করো বেটা! আমরা এখানেই ফজরের নমাজ পড়ব।

নমাজে দাঁড়িয়ে সামনে নদীর ওপারে তাকিয়েই শফি চমকে উঠেছিল। ছাইমাখানো আলোয় কালো এক মূর্তি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। শফির মনে হল, তার চোখদুটোকেও সে দেখতে পাচ্ছে। জন্তুর চোখের মতো কি? যেন নীল চকচকে দুটি চোখ এবং তা শুধু শফিকেই দেখছে। শিউরে উঠল শফি।

করযোড়ে মোনাজাতের সময়ও আঙুলের ফাঁক দিয়ে শফি লক্ষ্য রেখেছিল কালো মূর্তিটার দিকে। সে তেমনি দাঁড়িয়ে।

নমাজ শেষ হওয়ার পর একজন গাড়োয়ান তাঁকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, এ ভাই! উলুশরার মাঠে রাস্তা হয়েছে?

লোকটার গলা শুনে আরও চমকে উঠল শফি। খ্যান-খেনে এমন কণ্ঠস্বর কি মানুষের? সেও চেঁচিয়ে বলল, হয়েছে!

গাড়োয়ান তবু জিগ্যেস করল, হয়েছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে। তবে কি না—

তবে কিনা?

নদীটা ছোট। তত কিছু চওড়া নয়। হাওয়া বন্ধ ছিল। আস্তে কথা বললেও শোনা যেত। কিন্তু গ্রামের মানুষজনের চেঁচিয়ে কথা বলাই অভ্যাস। ততক্ষণে ওপারের উঁচুপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা স্পষ্ট হয়েছে। তার পরনে একফালি ন্যাতা। ঝাঁকড়া চুলেও একটা ন্যাতা জড়ানো। কিন্তু সে সাঁওতাল বা মুশহর নয়, সেটা তার কথাতেই বোঝা যাচ্ছিল। খুব স্পষ্ট আর জোরালো তার উচ্চারণ। আকাশের নিচে নদীর ওপর তার কণ্ঠস্বর গমগম করছিল, যেন ধ্বনি নয়, প্রতিধ্বনি।

গাড়োয়ান আবার চিৎকার করল, তবে কিনা?

সে একটু ঘুরে হাত তুলে বলল, পাকুড়গাছের কাছে যেয়ে ডাইনের লিকে গাড়ি ঘোরাতে হবে। নৈলে—

নৈলে?

বাঁয়ের লিকে গেলে গুপিডাঙ্গার নামুতে কেঁওলির বিল। তবে কিনা যাওয়া হবে কোথা?

সেকেন্ডা-মথদুমলগর।

সে তো বিরভুঁই জেলায়।

তাই বটে।

হঠাৎ লোকটা হনহন করে চলে গেল। ঠিক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতো। শফির বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। চোখ বড়ো করে উঁচুতে নীলধূসর আকাশের বিশাল পটের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা ভীষণ শূন্য করে দিয়েছে আকাশটাকে। কালো একটা রহস্যময় লোক। কে ও?

শফি আড়চোখে আব্বাকে দেখে নিল। মা বলেছিলেন, দুরকম জিন আছে। ভাল জিন, মন্দ জিন। ভাল জিনের গায়ের রঙ ফিট শাদা, ধপধপে কাফনের থানের মতো। কালো জিনের গায়ের রঙ মাটির হাঁড়ির তলার মতো ভুসকালো। বদিউজ্জমান তাঁর কেতাববোঝাই টাপর দেওয়া গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তখনও তসবিহ্ (জপমালা) জপছেন। ন্যাতা মেজভাই মনিরুজ্জামান টাপরের ভেতর থেকে মুখ বের করে হাত চুষছে আর খ্যা খ্যা করে হাসছে। সাইদা গাড়ির আড়াল দিয়ে এইমাত্র মেজছেলের খোঁজ নিতে এলেন। একটাই ভয় ছিল। বিছানায় পেচ্ছাপ করে দেয় আঠারো বছর বয়সের ছেলেটি। পবিত্র কেতাবগুলি যদিও চট আর কাপড়ে বাঁধা রয়েছে, কিছু বলা যায় না। সাইদা ফিসফিস করে বললেন, ইস্তেঞ্জা (মূত্রত্যাগ) করবি বেটা? কানে গেলে বদিউজ্জমান জপ থামিয়ে বললেন, খাওয়ার ইস্তেজাম করো। সাইদা চলে গেলেন নিজের গাড়িতে। গাড়ির তলা দিয়ে তাঁর এলোমেলো পা ফেলা এবং লাল চটি দুটো দেখতে পেল শফি।

আব্বার কোনো ভাবান্তর না দেখে অবাক হয়েছিল শফি। নিশ্চয় একটা কালো জিন এসেছিল। ও কখনও মানুষ হতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে তুমুল চেঁচামেচি করে গাড়িগুলোকে নদীর ঢালু পাড় বেয়ে যখন ওপারে ওঠানো হল, আবার শফির গা শিউরে উঠল। এ কোথায় চলে এসেছে তারা? যতদূর চোখ যায়, ধূসর উলুকাশের বন। জনমানুষহীন খাঁ খাঁ নিঝুম এক দুনিয়া। এখানে এক কালো মানুষের কথা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে। খুব আদিম এই ভূখণ্ডে মানুষের পায়ের ছাপ খুঁজে মিলবে না। সাতখানা গাড়ি সার বেঁধে চলেছে। সাতজোড়া চাকায় একটানা ঘস ঘস ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ। তার সঙ্গে উলুকাশের ঘষাখাওয়া শোঁ শোঁ শনশন অদ্ভুত ধারাবাহিক শব্দ। অবাধ এই তৃণভূমিতে এতক্ষণে সূর্যের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সবার আগে এবার কুলসুমকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে একজন প্রবীণ শিষ্য। ছানাদুটিকে অদ্ভুত দক্ষতায় বুকে চেপে রেখেছে সে। মুন্নি শেষ গাড়িটির পেছনে আগের মতোই বাঁধা। এতক্ষণে শফি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল। সাইদা পর্দা ফাঁক করে দেখেই প্রায় চেঁচাতে যাচ্ছিলেন। বলদের পিঠের ওপর এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়তে আছে? এক্ষুনি বুকের ওপর চাকা চলে গিয়ে কলজে ফেটে যেত না বাছার? গাড়োয়ান হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

শফি একা হতে চাইছিল। চ্যালেঞ্জের একটা ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল। শেষ গাড়ির পেছনে চলে গিয়ে সে ঝোপ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিল। ডালটা শক্ত করে ধরে সে তৃণভূমির চারদিকে তাকিয়ে কালো জিনটিকে খুঁজতে থাকল।

ভয় পেলে শফি এরকম করত। একবার সন্ধ্যার পর গোরস্তানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে তেমনি হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়েছিল সে। চিড়খাওয়া গলায় চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, চলে আয়, দেখি। পরে খুব লজ্জা পেয়েছিল সে। যদি কেউ

শুনে থাকে, তাকে মেজভাইয়ের মতো পাগলা ভাববে যে? কিন্তু মজার কথা, পরে তাকে মেহেদি নামে একজন লোক বলেছিল, হ্যাঁ গো, সেদিন গোরস্তানে কার সঙ্গে তকরার করছিলেন? শফি বলেছিল, ও কিছু না চাচা! কিছু না।

উলুশরার মাঠে সকালের আলোয় তারপর সে 'কালা জিনে'র কথা ভুলে গেল। ক্রমশ সে একটা নতুন আর অচেনা দুনিয়ায় ঢুকে পড়েছিল। টের পাচ্ছিল, এ কোনো মানুষের দেশ নয়। ঘাসফড়িংগুলো কিড় কিড় করে ডাকছিল। ডাকছিল পাখপাখালি। কাঁটাগাছের ফুলন্ত ঝোপ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছিল কাশের ডগা ছুঁয়ে। একখানে খরগোশ দেখে গাড়োয়ানরা হল্লা করতে থাকল। একজন হুজুরের কাছে জানতে চাইল, খরগোশ হালাল না হারাম। হুজুর ফতোয়া দিলেন, জরুর হালাল। কিন্তু তখন খরগোস উধাও। শফি একটা শেয়াল দেখল। একটা খেঁকশিয়ালি তার পায়ের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল। একটা ঢ্যামনা সাপ ছুটে গিয়ে ব্যানাবনে ঢুকে পড়ল। শফি বুঝতে পারছিল এটা মানুষের দুনিয়া নয়। সে ছিপটিটাকে শক্ত করে ধরে সতর্কভাবে হাঁটছিল। মাঝেমাঝে মুন্নিকে ছিপটির ঘা মারছিল নেহাত অকারণে। পোকামাকড়ের ডাক, পাখপাখালির ডাক, সাতখানা গোরুর গাড়ির ঘসটানো ক্যাঁচকোঁচ শব্দ, উলুকাশের শোঁ শোঁ শনশন আওয়াজের মধ্যে দিয়ে শফি চলেছে তো চলেছে। কখন হাওয়া উঠেছে। কাশবন দুলতে লেগেছে। কত অদ্ভুত নতুন-নতুন শব্দ। রোদ পড়লে মাথার টুপিটা খুলে পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে রাখল শফি।

তারপর হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে পর-পর সাতখানা গাড়ি থেমে গেল।

শফি কী হয়েছে দেখার জন্য দৌড়ে সামনে চলে গেল। তারপর থমকে দাঁড়াল। সামনে জল।

বদিউজ্জামান অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। আগের লোকটিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। কুলসুম এই সুযোগে দড়ি ঢিলে পেয়ে হাঁটু বাঁকা করে জল খেয়ে নিচ্ছে। গাড়োয়ান বোবাধরা গলায় বলে উঠল, হা আল্লা!

একটু স্তব্ধতা, হকচকানি। তারপর কথা ফুটল লোকগুলোর। একজন চিৎকার করে উঠল, হারামি! নাফরমান!

সেই কালো লোকটি যে ভুলপথে পাঠিয়ে দিয়েছে, বুঝতে পারছিল সবাই। গাড়োয়াননরা তার উদ্দেশে ক্রোধ বর্ষণ করতে থাকল। তাদের মনে ভীষণ এবং জঘন্য গালাগালি। কিন্তু হুজুরের সামনে মুখখিস্তি করা চলে না। শফি তার আব্বাকে আবার লক্ষ্য করছিল। বদিউজ্জামানের নিষ্পলক দুটি চোখ জলের দিকে। ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। হাতের তসবিহ্‌দানা স্থির। ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে আছে। শফি মনে মনে বলল, আব্বা! আমি জানতাম!

সে ঘুরে দ্বিতীয় গাড়ির দিকে তাকাল। টাপরের পরদার ফাঁকে মায়ের একটা চোখ দেখা যাচ্ছে। শফির ইচ্ছে করল, মায়ের কাছে গিয়ে কালা জিনের কথাটা তোলে। কিন্তু কারুর কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়ে নি দেখে সে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। আর তার মনের ভেতর ঘুরে বেড়াতে থাকল 'আমি জানতাম' এই শব্দটা।

একজন জলে একটু নেমেই ব্যস্তভাবে উঠে এল। বলল, সর্বনাশ হুজুর! অগাধ পানি।

আরেকজন বলল, খাগড়ির সোঁতা না এটা?

তাই বটে।

কিন্তু এত পানি থাকার তো কথা না।

সেটাই আশ্চর্য লাগছে।

একজন ডাইনে-বাঁয়ে দূরে তাকিয়ে বলল, মনে হচ্ছে কোথায় লোকে বাঁধ দিয়ে পানি আটকেছে। বোরোধান পুঁতেছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই তো হারা রঙ ঝিকমিকোচ্ছে! তাকিয়ে দ্যাখো অসিমুদ্দিন!

অসিমুদ্দিন তাকিয়ে দেখল। সে বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ। তার কপালে নমাজপড়ার কালচে ছোপ। পরনে খাটো লুঙ্গি, গায়ে কোরা থানের পাঞ্জাবি। মাথায় তালশির দিয়ে তৈরি টুপি। সে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ডাকল, হুজুর পিরসাহেব!

জি! বদিউজ্জামান আস্তে সাড়া দিলেন।

শয়তান আমাদের মুসিবতে ফেলে দিয়েছে।

জি!

হুজুর! এ মুসিবত থেকে বাঁচার রাস্তা আপনার হাতে। আপনি একটা কিছু করুন!

শফি বুঝতে পারছিল লোকটা কী বলতে চাইছে। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল সে। কালো জিনের কার-

চুপি সম্ভবত ধরতে পারছে ওরা। কিন্তু আব্বা চুপ কেন? জিনেরা তো তাঁর কথা শোনে!

এইসময় সাইদার চাপা ফুঁপিয়ে ওঠা শুনতে পেল শফি। তারপর আব্বার গর্জন শুনল। বেঅকুফ নাদান ঔরত! বেশরম কাঁহেকা!

অসিমুদ্দিন ডাকল, হুজুর!

গর্জন করার পর কান্নাটা থেমে গিয়েছিল। বদিউজ্জামান চোখ বন্ধ করেছেন। ঠোঁট কাঁপছে। নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে। তারপর সুর ধরে উচ্চারণ করলেন, আউজুবিল্লাহে শয়তান-ইর রাজিম। বিশমিল্লাহে রহমান-ইর রহিম।

বদিউজ্জামানের কণ্ঠস্বর ছিল জোরালো, উদাত্ত। জমিদারি মসজিদের মিনারে উঠে কোনো-কোনো ফজরে আজান দিতেন নিজেই। সারা খয়রাডাঙ্গার ঘুম ভেঙে যেত। মধুরস্বরে কোরান আবৃত্তিকারদের বলা হয় কারি এবং কোরান যাঁদের মুখস্থ, তাঁরা হাফিজ। বদিউজ্জামান ছিলেন কারি এবং হাফিজ দুই-ই।

কোরানের সুরা ইয়াসিন আবৃত্তি করছিলেন তিনি। বিপদে-আপদে এই সুরা আবৃত্তি করা হয়। নীলধূসর চৈত্রের আকাশের নিচে সেই গম্ভীর ও উদাত্ত ধ্বনি ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারদিকে। বলদগুলোও যেন শ্বাস ফেলতে ভুলে গিয়েছিল। চারপাশে কাশবনে শনশন হাওয়ার শব্দ, বনচড়ুইয়ের ঝাঁকের অস্ফুট ডাকাডাকি, ঘাসফড়িংদের প্রচ্ছন্ন চিৎকার, তার মধ্যে সঙ্গীতময় ওই পবিত্র ঐশী-ধ্বনিপুঞ্জ। খাগড়ির সোঁতার ওপারে দুটি শাদা সারস মর্মর পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে অলৌকিক ঘটনাটি ঘটল। একেই বলে বুজুর্গের মোজেজা—দিব্যশক্তির নিদর্শন। পরে চাপা গলায় লোকগুলিকে বলাবলি করতে শুনেছিল শফি, এ মোজেজাই বটে। হুজুরের অসাধ্য তো কিছু নাই।

বহুবছর পরে শফি ইংরেজ সাহেব দেখেছিল। কিন্তু উলুশরার কাশবনে খাগড়ির সোঁতার ওপারে যাকে দেখেছিল, তার সঙ্গে ইংরেজ সাহেবের কোনো তুলনাই হয় না। আরও পরে সে প্রথম ধুতরোর ফুলের গড়ন প্রকাণ্ড চোঙবসানো গ্রামোফোন যন্ত্র দেখেছিল এবং রেকর্ডে 'জন্মাষ্টমী' নামে নাটক শুনেছিল। সেই ধাতব কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ খুব চেনা মনে হয়েছিল—আগেও কোথায় যেন শুনেছে। কিন্তু মনে পড়ে নি। তখন শফির মন ভারাক্রান্ত, মগজে অনা দুনিয়ার ঝড়।

ভরা সোঁতার ওপারের শাদা সারসগুলি হঠাৎ উড়ে যাওয়ায় সবার দৃষ্টি পড়েছিল সেদিকে। উঁচু কাশবনের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল অসম্ভব শাদা এক মানুষ। দিনের উজ্জ্বল আলোয় তার শাদা চুল, শাদা ভুরু, শাদা চোখের পাতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার মুখে গোঁফদাড়ি ছিল না। সে চিৎকার করে বলল, রাস্তা ভুল হয়েছে! তারপর হাত তুলে ইশারায় এপারে সোঁতার বদিকটা দেখিয়ে বলল, কিনারা ধরে চলে যান।

বদিউজ্জামান আবৃত্তি বন্ধ করেন নি। কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনেছিলেন মাত্র। অসিমুদ্দিন বলল, এদিকে তো লিক (চাকার দাগ) নাই ভাইজান!

ওপারের শাদা লোকটি বলল, তাতে কী? গাড়ি ডাকান। আমি এপারে থেকে সঙ্গে যাচ্ছি।

গাড়ির মুখ ঘোরানো হল। কাশের বন ভেঙে গাড়িগুলো সোঁতার সমান্তরালে চলতে থাকল। এবার পায়ে হাঁটার সমস্যা। তাই সবাইকে গাড়িতে উঠতে হল। কুলসুমকে রাতের মতো চাপানো হল সাইদার টাপরের পেছনে। শফি চাপল মায়ের গাড়িতে গাড়োয়ানের পেছনে। সাইদা পরদার ফাঁকে ডানদিকে তাকিয়ে ওপরের শাদা লোকটিকে দেখছিলেন। তাঁর চোখের চাউনিতে বিস্ময় ঝিলিক দিচ্ছে। শফি ফিসফিস করে ডাকল, আম্মা!

কী বেটা?

শফি চুপ করে গেল। সে জিনের কথা বলবে ভেবেছিল। কিন্তু তার কথা শুনে যদি শাদা জিন অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে আব্বা হয়তো তাকে ভীষণ বকবেন।

শাদা মানুষটির পরনেও একফালি ন্যাতা। শাদা চুলগুলো খোঁচাখোঁচা। কিছু জড়ানো নেই। সে মাঝেমাঝে কাশের ভেতর ঢাকা পড়ছিল। তখন অসিমুদ্দিন চেঁচিয়ে তাকে ডাকছিল, ভাইজান! ভাইজান!

তখনই সে কাশের পরদা ফাঁক করে সাড়া দিচ্ছিল, আছি, আছি। চলেন, চলেন! তার শাদা দাঁতে রোদ্দুর ঝকমকিয়ে উঠছিল।

পোয়াটাক চলার পর সত্যি একটা বাঁধ দেখা গেল। বাঁধের ওপাশে সোঁতার বুকে গাঢ় সোনালি বালির চড়া। শাদা লোকটি বলল, এইখানে পার হয়ে আসেন। আর

ওই যে দেখছেন বাবলাবন, ওখানে গেলেই আবার লিক পাবেন। তা যাবেন কোথা আপনারা?

সেকেন্ডা-মথদুমলগর।

গাড়িতে উঁনি কে?

হুজুর পিরসাহেব।

লোকটা কপালে হাত ঠেকিয়ে বদিউজ্জামানের উদ্দেশে বলল, সালাম হুজুর! তারপর সে কাশবনের ভেতর ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ তার শাদা মাথাটা দেখা গেল। তারপর সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অসিমুদ্দিন মৃদু হেসে চাপাগলায় বলল, সবই হুজুরের কেরামতি। আমিন! রব্বুল আলামিন!

উলুশরার মাঠে একজন কালোমানুষ বিপদে ফেলেছিল, একজন শাদা মানুষ এসে তাদের উদ্ধার করে গিয়েছিল। সদরে শহরের দায়রা আদালতে ফাঁসির হুকুম শোনার পরই শফিউজ্জামানের চোখে ভেসে উঠেছিল চৈত্রমাসের সেই আশ্চর্য দিনটি। সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে একটি আশ্চর্য সময়। প্রাচীন একটি মোজেজা। আব্বা যদি আজ বেঁচে থাকতেন।...

[ক্রমশ

নগরের কৈলাসে, হা-ঘরে

দাউদ হায়দার

বস্তুত সেই আমার সহিষ্ণু সংকট—
শিল্পের দুরন্ত বিস্তারে যখন ধর্মঘট
নানা রঙে নকশায়, ফ্রেমে—
প্রকৃতির মন্তাজে, বিন্যাসে, প্রেমে
দেখি নিজেকেই, বিপ্রয়াণে।

গোধূলি দীর্ণ হল, চলো অস্তাচলের পানে
বৃত্তের অনুশাসনে'—ব'লে তুমি স্তব্ধ অবগাহনে
স্তব্ধতা আনো সাতকাহনে।

২

নগরীর গান, পাখির কূজনে
একই ভাষা, বহুর সংমিশ্রণে, গুঞ্জনে—

শুনি সন্ত্রাসে, শৃঙ্গারে
হেমন্তে-বৈশাখে, নাগরিক প্রেমের ভৃঙ্গারে।

বস্তুত সংকট এই, নগরের কৈলাসে, হা-ঘরে
নাগরিক জীবনের টপ্পাঠুমরি, নানা স্বরে।

কাঁচের গোলক

তরুণ সেন

কিছু-কিছু জড় পদার্থ বেশ স্বচ্ছ—অর্থাৎ ঠিক নজর করলে অনেক কিছুই পরিষ্কার দেখা যায়, বা সঞ্চিত দৃশ্যাবলী ভেসে ওঠে পরদার ছবির মতো—চতুর কোনো ক্যামেরাম্যান যেন কাট, ফেড-আউট, লঙ শট ইত্যাদি কেরামতি মারফত ভুলেযাওয়া দৃশ্যের তাৎপর্য নতুন করে দেখিয়ে দেয়—অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলা তুমিই এরকম ভেবেছিলে—আমি তুলে রেখেছিলাম—একটুও বদল বা কারিকুরি নেই এর মধ্যে : যেমন কখনও ভোরে হঠাৎ জেগে গন্ধরাজ, শিশির ইত্যাদি মেশানো কোনো সংগীতের রিনরিন শুনতে পাওয়া, বা শুনতে-শুনতে জেগে ওঠা।

যেমন অ্যালবাম, বাতিল বই, না-লেখা চিঠির জন্য যত্নে রাখা মসৃণ কাগজ, পাশ-ফিরে-শুয়ে-থাকা পুরনো কলমের পাশে কাঁচের গোলক, ঠিক গোলক বলা যায় না, কেননা তলাটা মসৃণ এবং সমতল—ভেতরে প্রবাল-পাহাড়, রঙিন মাছের পুচ্ছ, সমুদ্রের ফেনা, সোনালি বালির দানা, পাহাড়ের চুড়োয় ভোরের কাঁচা সোনা আর টেবিল-ল্যামপের মামুলি একটু আলোর ফিনকিতে অপূর্ব রামধনু আর তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখ নীল সমুদ্র। কোনো চোখেরই যে হয় আসল কোনো রঙ নেই বা থাকলেও ঠিক নজরে আসে না—বা সব চোখের রঙ একটাই, এরকম একটা আভাস প্রত্যক্ষ হয়।

এইসব জড়বস্তুর ভিতর দৃশ্য হয়, দৃশ্যের বদল হয়, পুরনো দৃশ্য ভেসে-ভেসে জানিয়ে দেয় কিছুই যায় না শেষতক, এবং এসবই সম্ভব যে ওরা বদলায় না নিয়ত আমাদের মতো—বস্তু আর আয়না দুটোই যদি বদলাতে থাকে তো সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ব্যাপার।

কাঁচের গোলকের তলাটা মসৃণ, তাই ওটার একটা অবস্থান ইচ্ছেমতো নির্ধারণ করে দেওয়া যায়—আসলে অবস্থান বা অস্তিত্বের জন্য সব-কিছুরই একটা মসৃণ ভিত চাই এবং দ্রুত ক্ষয় না হওয়াও একটা অনিবার্য সত্য—তারই অভাবে টের পাই টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, দেয়াল, কাগজ, চিঠি—সব গড়িয়ে যাচ্ছে, দুলছে—একটুও স্থির অবস্থান নেই—

হয়তো জড় বস্তু থেকে অবস্থান বা অস্তিত্বের মূলসূত্রটাই ঠিক-ঠিক রপ্ত হয় নি আমাদের এখনো।

বাস্তবের সাদা বাড়িটায়

সিকদার আমিনুল হক

পাখির বাসার চেয়ে ঘুমন্ত তোমার মনের যতটুকু
সিলকের অন্তর্বাসের চেয়ে বেশি পাহারাময় তোমার
স্তব্ধতার যতখানি
কিংবা হরিণের চেয়ে বেশি শঙ্কিত তোমার দৃষ্টির
যে-দূরত্ব
আজ এই প্রাসাদতুল্য গৃহের একটি কামরার ছিটকিনি
খুলে জানলাম—
তার অনেকটাই হে রাজনন্দিনী
হে সম্ভ্রান্ত সামাজিক মহিলা
হে শুভ্র স্নানরতা রাজহংসী
আমি বলতে বাধ্য নির্জলা নান্দনিক।

অশ্লীল রাত্রিতে
অশ্লীল নৈশভোজনের পরে
অশ্লীল নিদ্রার মধ্যে গিয়ে
অশ্লীল এক স্বপ্নে তুমি ক্রমশ নষ্ট নষ্ট নষ্ট
দশ লক্ষ বার নষ্ট হয়ে গেলে... ...

যুগলে

সুকুমার চৌধুরী

হেমন্তের খড়

স্পর্শের সুদূরে ছিলে, ঘুমে, যেন স্মৃতি
স্মৃতির অগম থেকে নেমে এলে সুধা
মাংসবন্দনা থেকে আমাদের প্রণয়নির্মিতি
ব্যাখ্যা পেল নিরুপম, যেন বা বসুধা

আঁধের পাতায় বাজে ভৌতগান, আর তন্দ্রাঝড়ে
তোমার চুলের গন্ধ টের পাই অমল কিশোরী
আগুনের মতো জ্বালা নেচে যায় হেমন্তের খড়ে
স্মৃতিজ্বরে তুমিও কি...এসো তবে মরি

ওগো কথামালা

যেটুকু নিবৃত্তি তুমি দিয়েছিলে কৌমার্যের হোমে
সেটুকু দূরত্বে আজো রয়ে গেছ প্রবৃত্তির ক্ষুধা
আগুন এখনো জ্বলে দগ্ধবুকে, এমনি বসুধা
যেমন কীটের আত্মা পুড়ে যায় ধিকিধিকি মোমে

রেস্তোরাঁয় কুৎসা রটে, আমি জানি
কোথায় শিকড়? আমি বুঝি অগম আত্মার জ্বালা
সমূহ বিস্ফার নিয়ে ওগো মোহ, ওগো মঙ্করানী
ভালো থেকো নিরাপদ দূরে তুমি ওগো কথামালা।

কালিদাস-কাব্যে কয়েকটি আদিকল্প

সুকুমারী ভট্টাচার্য

কাব্যরচনাকালে কবির মানসপটে যে চিত্রকল্প(ইমেজ)-গুলি আনাগোনা করে—শুধু বাক্যগত নয়, সমগ্র আলেখ্যকে ব্যাপ্ত করেও—তাদেরই আদি-উৎসকে বলছি আদিকল্প (আরকিটাইপ)। সাহিত্যের মাধ্যমে কবি তাঁর উপলব্ধি শ্রোতার মানসে সঞ্চার করতে চান। কিন্তু রচনার পূর্বে তাঁর উপলব্ধির জন্যে তাঁকে কয়েকটি বস্তুকে মনে-মনে আশ্রয় করতে হয়—কখনও সচেতন-ভাবে, কখনও-বা অবচেতনার অনুপ্রেরণায়। এগুলিই সাহিত্যের উপাদান। উপাদানের মধ্যে যেমন ভাষা, ছন্দ আর অলংকারের বহু বিচিত্র উপকরণ আছে, তেমনই আছে কথাবস্তু। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কালিদাস-সাহিত্যে কয়েকটি আদিকল্পের সন্ধান।

প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কয়েকটি আদি-কল্প পরবর্তী কালের মানুষের মগ্নচেতনো সংরক্ষিত ছিল ; সেগুলি নবরূপ ধারণ করেছে কালিদাস-সাহিত্যে। যেমন, ভারতীয় সাহিত্যে বিক্রমোর্বশীয়-কাহিনীর সংলাপ-রূপ রয়েছে ঋগ্বেদের একটি সংবাদ-সূক্তে [১০।৯৫] ; শতপথব্রাহ্মণে [১১।৫।১] এটি পূর্ণ-তর রূপ পেয়েছে। কিন্তু নিশ্চয়ই এটি অনেক প্রাচীন কাহিনী, অন্যান্য ইন্দো-ইয়োরোপীয় দেশের সাহিত্য-শিল্পে তাই এটি নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'সোয়ান লেক' নামে রুশ ব্যালেতে তাই এর দেখা পাই, ম্যাথু আরনলডের 'দ্য ফরসেকন মারম্যান' এবং অন্যত্র বহু সাহিত্যে তাই এ কাহিনী ফিরে-ফিরে এসেছে। উর্বশীর হংসীরূপপরিগ্রহ ঋগ্বেদে আছে : তা আতয়ো ন তন্বঃ শুম্ভন্ত স্বাঃ [১০।৯৫।৯]—তাদের শরীর হংসীর মতো শোভা পাচ্ছিল। শতপথব্রাহ্মণে দেখি, তদ্ধ তা অপ্সরস আতয়ো ভূত্বা পরিপপ্লুধিরে [১১।৫।১।৪]—সেখানে সেই অপ্সরারা হংসীরূপে জলে ভাস-ছিল। মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় কাহিনীতেও উর্বশীর হংসীরূপে হ্রদে বিহার করার কথা ছিল বলে মনে করার হেতু রয়েছে। নাটকে বাস্তবানুগ হতে গিয়ে কালিদাস এ অংশটি পরিহার করেছেন, কিন্তু এটি যে তাঁর অব-চেতনে আনাগোনা করছিল তার ইঙ্গিত রয়ে গেছে বিক্রমোর্বশীয় নাটকের কয়েকটি চিত্রকল্পে। মনে রাখতে হবে, মূল কাহিনীতে নায়ক যখন বিরহার্ত, তখনই নায়িকা হংসীরূপে দেখা দিচ্ছে। বিক্রমোর্বশীয়ের প্রথম তিনটি অঙ্কে হংসের চিত্রকল্প সম্পূর্ণ অনুপস্থিত,

কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে, অর্থাৎ বিরহের রূপায়ণের প্রবেশক থেকেই হংসীর চিত্রকল্প নানাভাবে আসছে :

সহচরীদুঃখাল্লীঢ়ং সরোবরে স্নিগ্ধম্।
বাষ্পাববলম্বিতনয়নং তামাহি হংসীযুগলকম্।।

—সহচরীর দুঃখে কাতর অবস্থায় সরোবরে স্নিগ্ধ বাষ্পসজলনেত্রে হংসীযুগল ক্লিষ্ট হচ্ছে।

এর কিছু পরেই :

চিন্তাদুনমানসিকা সহচরীদর্শনলালসিকা।
বিকসতি কমলমনোহরে বিহরতি হংসী সরোবরে।

—চিন্তাক্লিষ্ট মানসে সহচরীকে দেখবার জন্যে উৎসুক হংসী পদ্মসরোবরে বিহার করছে।

নাটকের অন্তিম শ্লোকেও শুনি :

প্রান্তসহচরীসঙ্গমঃ পুলকপ্রসাধিতাঙ্গেঃ।
স্বেচ্ছাপ্রান্তবিমানো বিহরতি হংসযুবা॥

—সহচরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পুলকিতদেহ হংস-যুবা স্বেচ্ছায় আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

কাজেই দেখছি, ইন্দো-ইয়োরোপীয় কাহিনীর এই অংশটিকে কবি নাটকের কাহিনীর মধ্যে স্থান না দিলেও চিত্রকল্পে সেটিকে উপস্থাপিত করেছেন। এটি যে প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় কাহিনী, তার প্রমাণ—অন্য ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও এর সাক্ষাৎ মেলে। আয়ার-ল্যানডের প্রাচীন লোককথায় বারেবারেই হংসীরূপ নারীতে আরোপিত হয়েছে, এবং এর অনুষঙ্গ হল ইহ-পরলোকের মধ্যে আনাগোনা করার ক্ষমতা, যেমন হংস জলস্থলে আর আকাশের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে ("দ্য ফরম অব এ সোয়ান—পারহ্যাপস বীকজ ইট ইজ দ্যাট অব এ ক্রীচার অব ল্যানড, ওয়াটার অ্যানড ল্যানড, এ ক্রীচার হুজ মীলিয়া হ্যাজ নো বাউনডারিজ—ইজ অ্যাপপ্রোপ্রিয়েট ফর কমিউনিকেশন বীটুইন টু ওয়ারল্ডস।"—অলউইন রীস ও ব্রিনলে রীস : কেলটিক হেরিটেজ, টেমস অ্যানড হাডসন, লনডন, ১৯৬১, পৃ ২৩৬)। ওয়েলশ কাহিনীতে দেখি, লীন ই ফান নামে জলচারিণী দেবী প্রেমিকের উপহার প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, শেষে একদল রাজহংসী তাদের হংসবেশ ত্যাগ করে হ্রদের জলে নামলে প্রেমিকটি তাদের মধ্যে সুন্দরী-তমার বেশ হরণ করে, আর তাকে মেয়েটির পিতার কাছে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। আয়ারল্যানডে এওখেইড আর এতেইনের কাহিনী, এবং সুপ্রসিদ্ধ কুখুলেইন আর তার রাজহংসীরূপিণী প্রেমিকার কাহিনীতেও এই একই কল্পচিত্র। ইয়োরোপের অন্যান্য লোককথাতেও এ কাহিনীর নানা প্রতিরূপ পাওয়া যায় ; কাজেই মনে হয়, এটির একটি প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় আদিকল্প ছিল। কালিদাস এটি পেয়েছেন ঋগ্বেদ আর শতপথব্রাহ্মণের কাহিনী থেকে।

এই কাহিনীর একটি দিক হচ্ছে মানব আর অপ্সরার প্রেম। শতপথব্রাহ্মণে এ প্রেমের একটি সম্ভাব্য সংকটের সমাধান দেওয়া হয়েছে : পুরূরবা মর্ত, উর্বশী নভশ্চারিণী অপ্সরা ; একদিন পুরূরবার মৃত্যু ঘটবে, উর্বশী কিন্তু চিরজীবিনী। শতপথব্রাহ্মণে পুরূরবা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গন্ধর্ব হয়ে উর্বশীর সঙ্গে দীর্ঘকাল মিলিত হতে পারল। কালিদাসের নাটকের শেষ অঙ্কে দেবতার অনুগ্রহে উর্বশীকে তাঁর প্রিয়তমের বিচ্ছেদ সহ্য করতে হল না, তাঁরা দুজনেই আমরণ মর্তে মিলিত জীবন যাপন করবার অধিকার পেলেন। এই সমস্যা খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে প্রাচীন গ্রীক দেবকাহিনীতে। দেবী এয়স (উষস্, বা লাতিন অরোরা) প্রেমে পড়লেন মর্ত তরুণ টিথনসের সঙ্গে। টিথনসের মিনতিতে দেবী এয়স তাঁকে বর দিলেন অমরতার। কিন্তু দুজনেই ভুলে গেলেন যে অমরতা বার্ধক্য নিবারণ করবে না। টিথনস স্থবির, পঙ্গু, জরাগ্রস্ত হয়ে গুহায় শুয়ে থাকেন অমরতার অভিশাপ নিয়ে, আর প্রতি প্রত্যূষে চিরতরুণী এয়স তাঁকে দেখে যান। এই সমস্যার সমা-ধানে শতপথব্রাহ্মণে একটি যজ্ঞ আছে, যার দ্বারা পুরূরবা গন্ধর্বত্ব আর অমরত্ব লাভ করেন ; পুরাণে শুনি, একষট্টি হাজার বছর মিলিত জীবন যাপন করেন! কালিদাস এ সমস্যার অন্য সমাধান দিয়েছেন ; পঞ্চম অঙ্কে নারদ স্বর্গ থেকে দেবতাদের নির্দেশ জানান : ইয়ঞ্চ উর্বশী যাবদায়ুঃ তব সহধর্মচারিণী ভবীতি।—এই উর্বশী পূর্ণ আয়ুষ্কাল ধরে তোমার সহধর্মচারিণী হোক।

দ্বিতীয় যে আদিকল্পের কথা মনে আসে সেটির উৎস ইন্দো-ইয়োরোপীয় যুগের থেকেও প্রাচীনতর কাল থেকে সভ্য মানুষের চিত্তের গহনে প্রোথিত। কালিদাসে এর প্রকাশ রতিবিলাপে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরূপ একটি বিলাপ পাই মৈত্রায়ণী-সংহিতায় যমীর বিলাপে [১।৫।

১২]। যম-যমী ভাইবোন, আবার প্রণয়ী-প্রণয়িনী। যমের মৃত্যুতে যমীর শোক কোনো প্রবোধ মানে না ; সান্ত্বনা দিতে গেলে যমী কেবলই বলেন, "এইমাত্র তো যম মারা গেল।" যম তখনও মর্ত (দ্র যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাম্ [অথর্ববেদ ১৮।৩।১৩], কাজেই তাঁর মৃত্যু আছে, কিন্তু যমী তা মানতে পারছেন না। তাই দেবতারা পরামর্শ করে রাত্রির সৃষ্টি করলেন ; পরদিন যমী কিছুটা শান্ত হয়ে বললেন, "যম কাল মারা গেছে।" এ কাহিনীর লাতিন প্রতিরূপ পাই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কবি আপুলেইয়ুসের গ্রন্থ 'দ্য গোলডেন অ্যাস'-এর সপ্তম থেকে নবম অধ্যায়ে। অনবদ্য কবিত্বের সঙ্গে সেখানে একটি কাহিনীর উপস্থাপনা ঘটেছে যা প্রত্যক্ষভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে অন্বিত নয়। সুন্দরীতমা দেবী ভেনাসের পুত্র কিউপিড (=মদন) প্রেমে পড়েছেন সাইকির সঙ্গে, যে সাইকি রূপে ভেনাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। মর্তে ভেনাসের পূজা অবহেলিত, কিউপিড মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছেন, এবং সাইকি কিউপিডের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন। তাই ভেনাসের শাপে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ দেখা দিল। সাইকি কেঁদে-কেঁদে বিরহযাপন করে। অনেক দুঃখের পথ পেরিয়ে তাঁদের পুনর্মিলন ঘটল।

বাইবেলের 'সঙস অব সলোমন'-এও ভাইবোন প্রণয়-প্রণয়িনী। সেখানেও প্রণয়িনীর বিরহ রূপ পেয়েছে অমর শোকগাথাতে—

By night in my bed I sought him whom my soul loveth. I sought him but I found him nought. I will rise now and go about the city in the streets and in the broadways I will seek him whom my soul loveth. I sought him but I found him now. (Songs of Solomon Ch. 3, Verses 1-3)

সম্ভবত এ কাহিনীর প্রাচীনতর সংস্করণ সুমেরীয় দেবকল্পনায়। ইনান্না-দেবীর (যাঁর আসিরীয় নাম ইশতার) প্রেমিক ছিলেন দুমুজি (আসিরীয় তম্মুজ)। দুমুজির মৃত্যুর পরে ইনান্না কেঁদে-কেঁদে তাঁর সন্ধান করে বেড়ালেন, দুমুজির সন্ধানে পরলোকে দেবমণ্ডলীতে উপস্থিত হয়ে তাঁর জীবন ভিক্ষা করলেন—দুমুজি পুনরুজ্জীবিত হলেন। (সম্ভবত এরই একটি প্রতিরূপ পাই মনসামঙ্গলের বেহুলা-উপাখ্যানে।) কিন্তু এরও পশ্চাতের অতীতে হয়তো এ কাহিনীর সূত্রপাত মিশরীয় দেবকথার অসিরিস-আইসিস-উপাখ্যানে। এঁরাও ভাইবোন এবং প্রেমিক-প্রেমিকা। লোভী ভাই সেথ-এর চক্রান্তে অসিরিসের মৃত্যু ঘটল। আইসিস কেঁদে ফেরেন দেশে-দেশান্তরে। পনেরো শ খৃষ্টপূর্বাব্দের আমেনেমোসের গাথায় আছে—দুপুরের চিলনির মতো কেঁদে সে বেড়িয়েছে সারা মিশর, মৃত অসিরিসের পুনরুজ্জীবনের আশায়। লক্ষণীয়, মিশরে এ কাহিনীর সঙ্গে অনুষ্ঠান ছিল, প্যালেসটাইনেও ছিল, এবং উভয়ত্রই সে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য—শস্যক্ষেত্রে এবং প্রাণিজগতে উর্বরতা এবং বীর্যবত্তার বৃদ্ধিসাধন। কালিদাসও রতিবিলাপকে ব্যবহার করেছেন, এবং রতিকে বিরহিণী রেখেছেন হরপার্বতীর মিলন পর্যন্ত। তারপরে দেবতাদের অনুনয়ে মহাদেব মদনকে সঞ্জীবিত করেন : "তস্যানুমেনে ভগবান্ বিমনুর্ব্যাপারমাত্মনাপি সায়কানাম্"—বিগতক্রোধ ভগবান আপনার প্রতি তার শরসন্ধান ব্যাপার অনুমোদন করলেন (কুমারসম্ভব, ৭।৯৩)।

অতিপ্রাচীন আর-একটি আদিকল্প পাই রঘুবংশে, যার পূর্বরূপ আছে রামায়ণে : রামচন্দ্র যুদ্ধশেষে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করবার পরে দশরথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে, যেমন ঘটেছিল রামায়ণে। গ্রীক ইলিয়াদ আর লাতিন ঈনীডেও মৃত পিতার সঙ্গে উত্তরপুরুষের সাক্ষাৎকারের কাহিনী আছে।

অন্য-এক ধরনের আদিকল্প কালিদাস পান লোকসাহিত্য থেকে, এবং নানা বিচিত্র রূপে এগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন। লোকসাহিত্যের দুটি বৈশিষ্ট্য—অতিশয়োক্তি এবং অতিলৌকিকতার আশ্রয়গ্রহণ। কালিদাস সত্যকার শিল্পী, তাই অতিশয়োক্তি তিনি পরিহার করেছেন, কিন্তু অতিলৌকিক উপাদান গ্রহণ করে কাব্যানুগরূপে ব্যবহার করতে তিনি বিমুখ নন। অতিলৌকিক উপাদান কালিদাস-সাহিত্যে বহুরূপে অনুপ্রবিষ্ট। প্রথমত, ধরা যাক অতিলৌকিক বস্তু : যেমন বিক্রমোর্বশীয়ে সংগমনীয় মণি, যা স্পর্শমণিরই অন্য-এক সংস্করণ—যার সাহায্যে পুরূরবার আলিঙ্গনে লতারূপিণী উর্বশী নারীদেহ ফিরে পেলেন। কিংবা অভিজ্ঞানশকুন্তলে রক্ষাকরণ্ডক—যা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির

স্পর্শে সাপ হয়ে যায়, তারই মাধ্যমে দুষ্যন্ত পুত্র সর্বদমনকে পেলেন। অথবা রঘুবংশের সেই মালাটি—যার স্পর্শে ইন্দুমতীর প্রাণনাশ ঘটল। রঘুবংশে শুনি, প্রার্থী কৌৎসের জন্যে রাজা অজ যেই কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত, অমনই "হিরণ্ময়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে বৃষ্টিঃ শশংসুঃ পতিতাং নভস্তঃ" (৫।২৯)—রাজকোষের মধ্যে আকাশ থেকে স্বর্ণময় বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়া গেল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে চতুর্থ অঙ্কে পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে শকুন্তলার বসনালংকারপ্রাপ্তিও অমনই একটি অতিপ্রাকৃত উপাদান। অতিলৌকিকের দ্বিতীয় একটি পরিচয় আছে রূপান্তরে—যেমন, রঘুবংশে মতঙ্গের শাপে প্রিয়ংবদের গজরূপপ্রাপ্তি (৫।৫৩) ; স্বরূপ ফিরে পাবার পর ইনি অজকে একটি সম্মোহন-অস্ত্র দেন যার সাহায্যে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের পরে অজ সমবেত যুদ্ধোদ্যত রাজমণ্ডলীকে পরাস্ত করেন। বিক্রমোর্বশীয়ে উর্বশীর কুমারবনে লতায় পরিণত হওয়াও অমনই একটি লোকসাহিত্যের উপাদান। রঘুবংশে রাজা দিলীপ দেবধেনু নন্দিনীর সেবা এবং প্রাণের বিনিময়েও নন্দিনীকে রক্ষা করায় চেষ্টার দ্বারা যখন তাকে তুষ্ট করেন, তখন পুত্রহীনতার শাপ থেকে তাঁর মুক্তি ঘটে—সেও একটি অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে। নন্দিনী বলেন, "দুগ্ধং পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং পুত্রোপভুঙ্ক্ষ্বেতি তমাদিদেশ" (২।৬৫)—পুত্র, আমার দুগ্ধ পত্রপুটে দোহন করে পান করো! বলে তাঁকে আদেশ করল। আমরা জানি, বহু রূপকথায় অমনই মন্ত্রপূত ফল বা শেকড় যথাবিধি সেবন করে অপুত্রক পুত্র লাভ করে। দশরথের মহিষীদের চরুভক্ষণের কাহিনী তো রামায়ণে ছিলই।

রঘুবংশের সূচনাতেই লোকসাহিত্যের একটি পরিচিত কথা পাই—রাজা দিলীপের সবই আছে : "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।"—পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, তরুণ বয়স, সুন্দর দেহ—নেই কেবল পুত্রসন্তান ; রাজসিংহাসনে বা রাজবংশে উত্তরাধিকারী নেই। ঠিক যেমন শুনি রূপকথায় : রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সুন্দরী রানী—কিন্তু রাজার ছেলে হয় না। এবং রঘুবংশে এর সমাধানও এল রূপকথারই রূপ ধরে : সেবায় প্রীত নন্দিনীর দুগ্ধপান। অভিজ্ঞানশকুন্তলেও রাজার সবই আছে, নেই কেবল পুত্রসন্তান। বিক্রমোর্বশীয়েও কাহিনীর অন্ত্যপর্বে অপুত্রক রাজা পুত্রবান হন। এখানেও ঠিক এমনই আর-একটি রূপকথার সূত্র পাই : জটিল সমস্যার চূড়ান্ত মুহূর্তে সমাধান আসে অলৌকিকের পথ ধরে। যেমন, অজ যখন কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত তখন স্বর্ণবৃষ্টি হয়ে সমাধান হল, অথবা শাপের অবসানে যখন উর্বশীর স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের দুর্লঙ্ঘন উপস্থিত তখন নারদের মুখে ইন্দ্রের নির্দেশে আসন্ন বিপদ নিবারিত হল। রূপকথাতেও ঠিক এমনই ঘটে : ডাক্তারা যখন বন্দীকে দেবীর সামনে বলি দিতে খাঁড়া তোলে তখনই দৈবনিয়ন্ত্রণে ঘটনার গতি আমূল পরিবর্তিত হয়।

দৈববাণী লোকসাহিত্যের আর-একটি উপাদান। অত্যন্ত সংকটময় কয়েকটি মুহূর্তে কালিদাস দৈববাণীর আশ্রয় নেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কণ্ব অগ্নিগৃহে দৈববাণী শোনেন যে শকুন্তলা দুষ্যন্তের পরিণীতা বধূ, এবং তাঁরই সন্তানের জননী হতে চলেছেন। মানুষের মুখে একথা শুনলে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ হত না, এবং ঋষি শকুন্তলাকে ওইভাবে অভিনন্দিত করতেন না। নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই দৈববাণী। কুমারসম্ভবের পার্বতী যে হরবধূ হবেন সে সম্বন্ধে নারদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনি (১।৫০) ; কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দৈববাণী শুনি চতুর্থ সর্গে যখন রতি সহমৃতা হবার জন্য চিতারোহণে উদ্যত। দৈববাণীই তখন জানিয়ে দেয় যে মদন পুনরুজ্জীবিত হবেন হরপার্বতীর মিলনের পরে (৪।৪৮)।

পৃথিবীর সব লোকসাহিত্যেই এক কল্পলোকের চিত্র আছে যেখানে নিত্যসুখ—জরামৃত্যুবেদনা, মর্ত্যজীবনের অপূর্ণতা যেখানে অনুপস্থিত। ভারতীয় সাহিত্যের আদিপর্বে ঋগ্বেদে শুনি,

> যত্র কাম্যা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
> স্বধা যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধি॥
> যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদ প্রমুদ আসতে।
> কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি॥
>
> ৯।১১৪।১০-১১

—যেখানে কামনার তৃপ্তি...যেখানে স্বধা ও তৃপ্তি সেখানে আমাকে অমর করো। যেখানে আনন্দ, আমোদ, হর্ষ ও প্রকৃষ্ট হর্ষ আছে, কামনার যেখানে চরিতার্থতা, সেখানে আমাকে অমর করো।

মহাভারতে উত্তরকুরুর বর্ণনা, সত্যযুগের বর্ণনা—

অকুণ্টপচ্যা পৃথিবী পুটকে পুটকে মধু : হলকর্ষণে পৃথিবীতে শস্য উৎপাদন করতে হয় না, প্রতি পদ্মপুটে যেখানে মধু পাওয়া যায়। এরও পশ্চাতে আমরা অন্যান্য প্রাচীনতর সাহিত্যে এমনই স্বপ্নস্বর্গের চিত্র পাই। এ স্বর্গ দূরে—হয় স্থানে, নয় কালে, কিংবা উভয়তই। বোধহয় পৃথিবীর প্রাচীনতম স্বপ্নস্বর্গের বর্ণনা পাই মধ্যপ্রাচ্যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগের নিপ্পুরের এক শিলালেখে দিলমুনের বর্ণনায়—

(Where) the croak of the raven was not heard, the bird of death did not utter the cry of death, the wolf did not rend the lamb, the dove did not mourn, there was no widow, no sickness, no old age, no lamenation.

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য গিলগামেশ-কাহিনীতেও অনুরূপ একটি কল্পচিত্র পাই। গিলমামেশ যাচ্ছে উতনপিশতিমের কাছে.

There was the garden of the gods, all round him stood bushes bearing gems...there was fruit of carnelian with vine hanging from it beautiful to look at : lapis lazuli leaves hung thick with fruit, sweet to see. For thorus there were haematite and rare stones, agates and pearls out of the sea. (The Epic of Gilgamesh, Penguin, Ch. IV)

বাইবেলে এ স্বর্গ আছে সৃষ্টির আদিতে আর প্রলয়ের অন্তে। সৃষ্টির আদিতে গার্ডন অব ঈডুন্-এ অভাব, জরা, মৃত্যু, অতৃপ্তি নেই। আবার বুক অব রেভেলেশন-এ পড়ি :

And I saw a new heaven and a new earth ...and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. (Ch. XXI : 1, 4)

কালিদাসের সাহিত্যে এই কল্পচিত্রটি নানা রূপে ফিরে-ফিরে দেখা দিয়েছে। কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গের হিমালয়বর্ণনায় একটি দুঃখবিনির্মুক্ত দেবস্থান আনন্দভূমিরূপে বর্ণিত। অভিজ্ঞানশকুন্তলে মারীচের আশ্রমও প্রায় তাই : সংকল্পবৃক্ষ বন, কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশ জল, রত্নশিলাগৃহ ইত্যাদির বর্ণনা শেষ করছেন কবি—"যৎ কাঙ্ক্ষতি তপোভিঃ" (৭।১২)—মানুষ তপস্যার ফলরূপে যা চায়। কুমারসম্ভবের ওষধিপ্রস্থের সুদীর্ঘ বর্ণনাও এই পর্যায়ের। সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্যবস্তুর সমাহারে মানুষের ভোগবাসনা এখানে কল্পনায় চরিতার্থ হয় : "যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নন্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ" (৬।৪৪)—বয়স যেখানে যৌবন ছাড়ায় না, যেন মদন (প্রেমে) ছাড়া অন্য মৃত্যু নেই। এত সুখ যে "স্বর্গাভিসন্ধিসুকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে" (৬।৪৭)—স্বর্গসুখের পুণ্যকে তাঁরা বঞ্চনার মতো মনে করেন।

কিন্তু কালিদাস-কাব্যে সার্থকতম স্বপ্নস্বর্গ বোধহয় মেঘদূতের উত্তরমেঘের অলকাবর্ণনায়। এখানেও পৃথিবীর বঞ্চিত ব্যর্থকাম মানুষের, ব্যাধিবেদনা-জরা-মৃত্যুজর্জরিত মানুষের স্বপ্নের অভিপ্রসারণ একটি পরমভোগ্য নিত্যসুখের কল্পলোকে। ঐশ্বর্য সৌন্দর্য সম্ভোগ বৈচিত্র্য এবং অনায়াসলব্ধ অবিচ্ছিন্ন সুখের একটি স্বপ্নধাম কবি উত্তরমেঘের প্রথম এগারোটি শ্লোকে নির্মাণ করেছেন। এর মধ্যে একটিতে প্রেমের চিত্রায়ণে সিদ্ধহস্ত কবি মানুষের প্রেমিক সত্তার জন্যে চিরন্তন কাম্যস্বর্গ সৃষ্টি করেছেন :

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈর্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তির্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥

—যেখানে অশ্রু শুধু আনন্দেরই, অন্য কোনো কারণের নয়, প্রেমের তাপ ছাড়া অন্য তাপ যেখানে নেই এবং সে তাপও প্রিয়মিলনে নির্বাপিত হয় ; প্রণয়কলহ ছাড়া যেখানে বিরহ নেই এবং যক্ষদের যেখানে যৌবন ছাড়া অন্য বয়সই নেই।

এর মধ্যে কুমারসম্ভবের ওষধিপ্রস্থের বর্ণনার 'যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নন্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ'-এর প্রতিধ্বনি আছে। লক্ষণীয়, উত্তরমেঘের এই শ্লোকের সমস্ত ঝোঁকটা পড়ে 'বিপ্রয়োগোপপত্তি' শব্দটির ওপরে। বিরহভীরু প্রেমিকের স্বর্গের কল্পনা তো এমনই এক নিত্যমিলনের ধামের মধ্যেই চরিতার্থ। তাই রঘুবংশে রামচন্দ্র পরিত্যাগ করলে পর সীতা পরজন্মের জন্যে একটিমাত্র কামনা উচ্চারণ করেন, "ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ" (১৪।৬৬)—পরজন্মে আবার যেন তোমাকেই স্বামী পাই, আর যেন বিচ্ছেদ না হয়। তাই যক্ষ মেঘকে আশীর্বাদ জানায়, "মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ—(তোমার বধূ) বিদ্যুতের সঙ্গে যেন তোমার একমুহূর্তের বিচ্ছেদও না হয়।

কালিদাস-সাহিত্যে প্রেমের যে চিত্র তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন যে কবি দেহনিষ্ঠ প্রেমকে তপস্যার দ্বারা শোধন করে স্বয়ায়ী মিলনে উত্তীর্ণ করেছেন। কিন্তু মনে হয়, কবির চিত্তের গহনে যে চিত্রকল্পটি সক্রিয় ছিল তা তপস্যা নয়, যজ্ঞ। উদাহরণে বলা যায়, কুমারসম্ভবে মদনের মৃত্যুর হেতুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে,

অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশশ্রুঃ ফলমেতদন্বভূৎ॥
[৪।৪১]

—প্রজাপতিকে নিজের দুহিতার প্রতি অভিলাষী করে (মদন)...সেই কারণে অভিশাপে তাকে এর ফল ভোগ করতে হয়।

মেঘদূতে স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষ তার বিচ্যুতির পূর্ণ মূল্য শোধ করেছে তীব্র বিরহের মর্মযন্ত্রণায়। মালবিকাগ্নিমিত্রে বিরহ নেই বললেই হয় ; মালবিকা আর অগ্নিমিত্রের পরস্পরের অদর্শনে যে ব্যাকুলতা তা অনেকটা লঘু স্তরেই চিত্রিত হয়েছে। অগ্নিমিত্র মধ্য যৌবনে উত্তীর্ণ, তাঁর পিতা আর পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত, তিনি অন্তঃপুরে একটি সুন্দরী তরুণীকে দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এ মনোভাবকে প্রেম বললেও এ প্রেম অগভীর, এবং নাটকের শেষ পর্যন্ত তা কোনো গভীরতায় পৌঁছয় নি। এ প্রেমের বাধাও যেমন অকিঞ্চিৎকর, তার নিরাকরণও তেমনি লঘু স্তরের। বিক্রমোর্বশীয়ে কিন্তু চিত্রটি অন্যরকম—এখানে নায়ক-নায়িকার বিরহ দুবার ; প্রথম বার দ্বিতীয় অঙ্কে ইষ্টজনকে লাভ করবার ব্যাকুলতা, প্রথম প্রেমের উন্মাদনায় চঞ্চল। দ্বিতীয় বার চতুর্থ অঙ্কে, যেখানে পুরূরবার বিরহ মর্মস্পর্শী। পুরূরবা প্রমোদবনে এসেছেন রাজকার্য সচিবদের হাতে অর্পণ করে, উর্বশী এসেছেন একমাত্র পুত্রকে পিতামাতার কাছ থেকে নির্বাসন দিয়ে, দুজনেই এসেছেন নিরঙ্কুশ সম্ভোগের আশায়। এই উদ্বেল কামনার ধনুসেবীজ তার নিজের মধ্যেই নিহিত ছিল, তাই অহেতুক ঈর্ষায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে উর্বশী অসতর্কে কুমারবনে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হলেন, এবং পুরূরবা কেঁদে-কেঁদে উন্মত্তপ্রায় হয়ে তাঁকে খুঁজে ফিরলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলেও বিরহ দুটি পর্যায়ে—প্রথম বার দ্বিতীয় আর তৃতীয় অঙ্কে অদর্শনের ক্ষোভে আর হতাশায়, এবং দ্বিতীয় বার ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্যন্তের নিরন্ত মর্মযন্ত্রণায়। নেপথ্যে শকুন্তলারও, যার পরিচয় সপ্তমে পাই, "বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।"—ধূলিধূসর দুখানি বস্ত্র পরনে, ব্রতশীর্ণ মুখ, (বিরহদিনের) একটি বেণী ধারণ করে আছেন।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অভিশাপ প্রকট বা প্রচ্ছন্ন, এবং তা এসেছে কর্তব্যে বিচ্যুতির অপরাধেই। নায়ক বা নায়িকার মর্মন্তুদ যন্ত্রণার মধ্যে প্রতিকার বা পুনর্মিলন ঘটেছে।

এই যন্ত্রণাভোগ প্রায়শ্চিত্তযাগ আর কাম্যেষ্টির মিলিত প্রতীক। মনে রাখতে হবে, কালিদাসের কাল ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ, যজ্ঞ তখন মহাসমারোহে বারংবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুপ্তরাজারা নতুন করে যজ্ঞ করছেন, এমন কথা শিলালেখেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, যাঁর রাজত্বকালেই সম্ভবত কালিদাসের আবির্ভাব, তিনি মথুরা শিলালেখে বলছেন, "চিরোৎসন্নাশ্বমেধাহর্তুর্মহারাজশ্রীগুপ্তপৌত্রস্য...।"

—দীর্ঘকাল যা অনুষ্ঠিত হয় নি সেই অশ্বমেধের সম্পাদক মহারাজ শ্রীগুপ্তের পৌত্র...ইত্যাদি।

গুপ্তযুগ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাবকাল ; সমগ্র কালিদাস-সাহিত্যে যজ্ঞ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। রঘুবংশের শুরুতেই রঘুবংশীয় আদর্শ বর্ণনা হচ্ছে যথাবিধিহুতাগ্নীনাম্ (১।৬)—যাঁরা যথানিয়মে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে থাকেন। রাজা রঘুর বিষয়ে "দুদোহ গাং স যজ্ঞায়, শস্যায়, মঘবা দিবম্" [১।২৬]—যিনি পৃথিবীকে দোহন করেন যজ্ঞের জন্য, ইন্দ্র আকাশকে দোহন করেন শস্যের জন্য। দিলীপের পত্নী সুদক্ষিণার বর্ণনা : "অধ্বরস্যেব দীক্ষিতা" [১।৩৯]—তিনি যেন যজ্ঞের দক্ষিণা। বশিষ্ঠকে দিলীপ বলছেন,

হবিরাবর্জিতং হোতস্ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু।
বৃষ্টিভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণাম্। [১।৬২]

—হে হোতা, তুমি যথানিয়মে হব্য এনেছ অগ্নির উদ্দেশ্যে, (তাই) অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক শস্য বৃষ্টি পায়। রঘুবংশীয়দের পরিচয়, এঁরা 'ইজ্যাবিশুদ্ধাত্মা' [২।৭৫], যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন এঁরা। দিলীপের পুত্র রঘু বিশ্বজিৎযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দশরথের বর্ণনায় শুনি, "ঋষিদেবগণাস্ববধাভূজাং শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ" [৮।৩০]—স্বধাভোজী ঋষি ও দেবগণের জন্যে বহু বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এই রাজা। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে অনুপরাজের বর্ণনা, "অষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপাঃ"—আঠারোটি দ্বীপে তাঁর (যজ্ঞে পশুবলির) যূপ প্রোথিত। রাজা কুশের পুত্র অতিথির বর্ণনা : তিনি অনুষ্ঠান করেন, প্রচুরদক্ষিণাযজ্ঞ বহু যজ্ঞের [যজ্ঞাঃ পর্যাপ্তদক্ষিণাঃ, ৭।১৭]। মালবিকাগ্নিমিত্রের বিষ্কম্ভকে নাটকের বর্ণনা : নাটক হল, "দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শান্তং ক্রতুং চাক্ষুষম্" [১।৪]—মুনিরা বলেন, নাটক দেবতাদের শান্ত চক্ষুগ্রাহ্য যজ্ঞ। এই নাটকের অন্তে এক অশ্বমেধযজ্ঞের উল্লেখ আছে (চতুর্থ অঙ্কে)। অভিজ্ঞানশকুন্তলের সূচনাতেই, "যা স্রষ্টুঃ সৃষ্টিরাদ্যা বহতি বিধিহুতাং যা হবির্যা চ হোত্রী" [১।১]—যিনি স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি, যিনি যথানিয়মে (অগ্নিতে) প্রদত্ত হব্য বহন করেন, যিনি হবিঃ, যিনি হোতা। দুষ্যন্তের বর্ণনা করছে সারথি, "মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্"—যেন মৃগরূপধারী যজ্ঞের অনুসরণকারী শিবকেই সাক্ষাৎ দেখছি। দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষিদের ইষ্টিবিঘ্নের কথা আছে। যজ্ঞ সমাধা হলে পর দুষ্যন্ত চলে গেছেন—"অদ্য স রাজর্ষিরিষ্টিং পরিসমাপ্য ঋত্বিগ্ভির্বিসর্জিতঃ"—আজ যজ্ঞ শেষ হবার পরে ঋত্বিগ্‌ রা সেই রাজাকে বিদায় দিয়েছেন। চতুর্থ অঙ্কে কণ্ব শকুন্তলাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, "দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবক এবাহুতিঃ পতিতা"—সৌভাগ্যক্রমে ধূমে আকুলিতদৃষ্টি যজমানের আহুতি ঠিক অগ্নিতেই পড়েছে। ষষ্ঠ অঙ্কে সানুমতী বলছেন, "শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যা মহেন্দ্রজনন্যা মুখাদ্‌ যজ্ঞভাগোৎসুকা দেবাস্তথা করিষ্যন্তি যথাচিরেণ ধর্মপত্নীং ভর্তা অভিনন্দিষ্যতি।"—ইন্দ্রের জননী যখন শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখে শুনেছি যে যজ্ঞভাগের জন্যে উৎসুক দেবতারা এমন (ব্যবস্থা) করবেন যাতে অচিরেই ধর্মপত্নীকে তাঁর স্বামী অভিনন্দিত করবেন। নাটকের শেষে তাই মারীচ দুষ্যন্তকে আশীর্বাদ করছেন, "ত্বমপি বিততযজ্ঞং বজ্রিণং প্রীণয়ালম্"—তুমিও যজ্ঞবিস্তার করে বজ্রধারী ইন্দ্রকে প্রীত করো। স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া উপমানেও যজ্ঞ ফিরে-ফিরে এসেছে। শকুন্তলা, সর্বদমন আর দুষ্যন্ত যেন "শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি"—শ্রদ্ধা, ধন ও (যজ্ঞের) বিধান। এরকম অনেক উদাহরণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কালিদাসের চিত্তে তৎকালীন সমাজে যজ্ঞের পুনরনুষ্ঠান, বহুদিনের অচলিত যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ একটি তাৎপর্য বহন করত।

যজ্ঞদ্বারা মানুষ তার অভীষ্ট লাভ করে এবং কৃত দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে। তপস্যার মতো যজ্ঞেও যজমান কৃচ্ছ্রসাধন করেন, শুদ্ধাচারী থেকে উপবাস আর নিয়ম পালন করেন এবং ভোগ্যবস্তুর ভোগ থেকে বিরত থাকেন। এখানে যজ্ঞের সঙ্গে তপস্যার মিল ; কিন্তু যজ্ঞে অগ্নিক্রিয়া প্রত্যক্ষ, অভিধাগত—তপস্যায় ব্যঞ্জনাগত। বিরহের যন্ত্রণা এই দাহের, অগ্নিক্রিয়ার রূপকল্প। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যে আছে : "উদ্দিশ্য দেবতাং দ্রব্যত্যাগো যাগঃ"—দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। তপস্যায় ত্যক্ত দ্রব্যের পুনর্ভোগ নেই, যজ্ঞে আছে। যজ্ঞের আগে আর পরে যজমানের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, তপস্যায় সাধারণত তা নয়। ব্রত কামোদ্ভিত্তের মতোই, কিন্তু এতে অগ্নিক্রিয়া নেই এবং এর দ্বারা ভোগ্যবস্তুর শুদ্ধিসম্পাদন হয় না। এইখানেই কালিদাস-সাহিত্যে যজ্ঞের রূপকল্পের সার্থকতা। যজমান হব্যের একাংশ দেবতাকে দেন, যজ্ঞের আগুনে সে-অংশ ভস্মসাৎ হয়, এবং কেবলমাত্র তখনই হব্যের বাকি অংশ হুতশেষ বা প্রাশিত্র হয়, যা যজমান গ্রহণ করেন।

কালিদাস-সাহিত্যে প্রথম প্রেমের উন্মাদনায় বিহ্বল নায়কনায়িকার কর্তব্যে ত্রুটি ঘটে। প্রেম এমনই একান্ত হয়ে ওঠে যে তা সম্ভোগসর্বস্ব রূপে প্রতীয়মান হয়। কিছুকালের জন্যে নায়ক বা নায়িকা বঞ্চিত হয় প্রিয়মিলন থেকে। এই বিরহের যন্ত্রণা তার প্রায়শ্চিত্ত—আত্মবিস্মৃতির, কর্তব্যে বিচ্যুতির। এই বঞ্চিত হওয়ার দ্বারা তাঁর বাকি জীবনে সেই প্রেম হুতশেষরূপে দেখা দেয়। বিক্রমোর্বশীয়ে চতুর্থ অঙ্কে বিরহ এবং মিলনের পরে উর্বশী পুরূরবাকে বলছেন,

মহান্‌ খলু কালস্তব প্রতিষ্ঠানান্নির্গতস্য।
কদাচিদস্‌ত্রিযামিত্ত মহ্যং প্রকৃতয়ং, তদেহি নির্বর্তাবহে॥

—বহুদিন হল তুমি প্রতিষ্ঠান-নগর থেকে বেরিয়ে এসেছ, হয়তো প্রজারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবে, তাই চলো ফিরি। এ নাটকের শেষ অঙ্কে তাঁদের পুনর্মিলিত জীবনের বর্ণনা,

প্রবিশ্য নগরীমদানীং সসংকারোপচারৈঃ
প্রকৃতিভিরনুরজ্যমানো রাজ্যং করোতি।

—নগরে প্রবেশ করে এখন প্রজাদের দ্বারা বহু উপচারের সম্মান আর অনুরাগ পেয়ে তিনি রাজত্ব করছেন।

এবারে সেই উদ্দাম প্রেম আপন সীমার মধ্যে সুষমা লাভ করেছে, আর তা কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটায় না, বরং কর্তব্যে প্রেরণা জোগায়। এবারে সে প্রেম হয়েছে হুতশেষ, তার আতিশয্য দগ্ধ হয়ে বাকিটুকু পরিণত হয়েছে প্রাশিত্রে, যার মধ্যে ভোগ আর ত্যাগ একটি সামঞ্জস্যের মধ্যেই বিধৃত।

এর ব্যতিক্রম উনমানবের ক্ষেত্রে, যেমন তাড়কার কামনাসর্বস্ব আবেগ। তার মধ্যে ত্যাগ নেই বলে কোনো শুভকে তা বহন করে না। মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম অগ্নিবর্ণে, যার কামনার আলেখ্য বিভীষিকাময় : রাজদর্শনে আগ্রহী প্রজাদের জন্যে যিনি দুটি পদতল প্রসারিত করে রাখেন, কারণ অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগ থেকে এক মুহূর্তও তিনি বিরত হতে প্রস্তুত নন। এর পরিণাম ক্ষয়, অকালমৃত্যু ; এ ভোগসর্বস্ব কামনা অভিশপ্ত। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে যখন প্রেম আসে না তখন তার রূপ উগ্র, কামনাসর্বস্ব। (রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নাটকে এ প্রেম অভিচার আর উচাটনকে আশ্রয় করে সার্থকতা খুঁজেছে।)

কালিদাস মুখ্যত পুরুষেরই বিরহ বর্ণনা করেছেন—রামচন্দ্র, দুষ্যন্ত, পুরূরবা, যক্ষ, অজ। এঁদেরই বিলাপ তাঁর কাব্যনাট্যকে নানাসুরে অনুরণিত। সীতা, শকুন্তলা, উর্বশী, যক্ষবধূ—এঁরা নেপথ্যে বিরহ যাপন করেছেন। দেবতার বেলাতেই শুধু ব্যতিক্রম ; উমার বিরহের মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন কবি, রতিবিলাপ কুমারসম্ভবের কেন্দ্রস্থলে। মদন-রতির উপাখ্যান কালিদাসেরই উদ্ভাবন। পরবর্তী পুরাণগুলি খুব সম্ভব মহাকবির কাব্য থেকেই এ কাহিনী পেয়েছে। কাহিনীটি অসামান্যতাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, প্রেম সম্বন্ধে কালিদাসের যে উপলব্ধি আর বোধ, তা এই প্রতীকী কাহিনীতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রেমের অধিদেবতা মদন তাঁর উচ্ছৃঙ্খল শরসন্ধানের বিলাসে প্রজাপতিকে গর্হিত কামনায় অনুপ্রেরিত করেছিলেন। পরে, দ্বিতীয় বারে, উদাসীন শিবকে লক্ষ্য করে যখন কার্মুকে জ্যা আরোপণ করলেন তখন, "স্ফুরন্নির্দার্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণোঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত" [৩।৭১]—সহসা তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে স্ফুলিঙ্গ-জ্বলা অগ্নি নির্গত হল। সে অগ্নিতে মদন ভস্মসাৎ হলেন, রতির আর্ত বিলাপে আকাশ বাতাস শিহরিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রতির আত্মহত্যা নিবারিত হল পুনর্মিলনের আশ্বাসে, দৈববাণীতে। এর অব্যবহিত পরের সর্গেই আর-এক দেবীর বিরহের বর্ণনা—পার্বতীর সুকঠোর তপস্যা।

মদন-রতির উপাখ্যানে কালিদাস প্রেম সম্পর্কে তাঁর শিল্পীর উপলব্ধিকে একটি প্রতীকী রূপ দিয়েছেন। মদনের ভস্ম হয়ে যাওয়া যজ্ঞে হব্যবস্তুর দগ্ধ হওয়ারই প্রতীক। কিন্তু দগ্ধ হলেও মদন দেহবিনির্মুক্ত অমূর্তভাবে বিদ্যমান ছিলেন, তাই হরপার্বতীর মিলন সম্ভব হল—কিন্তু তা হল সম্পূর্ণ অন্য এক স্তরে। বিবাহে এ মিলন যখন অন্য স্তরে উন্নীত হতে চলেছে, তখন মদন ভস্মদেহ থেকে পুনর্বার স্বমূর্তি পরিগ্রহ করলেন, এবং তখনই পার্বতী হুতশেষরূপে ফিরে পেলেন তাঁর প্রেমকে, তাঁর প্রিয়তম শিবকে। কালিদাসের ইষ্টদেবতা শিব। তাই হরপার্বতীর প্রেমের আর মিলনের প্রসঙ্গেই প্রেম সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধিটিকে মূর্ত করে, প্রত্যক্ষ করে তুললেন মদন-রতির উপাখ্যানে। কালিদাস-সাহিত্যে প্রেমের রূপায়ণে তাই এই উপাখ্যানটিই কেন্দ্রবিন্দুরূপে অবস্থিত। তাঁর উপলব্ধি এখানে প্রতীকী হলেও সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রতি যেখানে প্রেমের আর্তিতে বিহ্বল, প্রায় উন্মাদ, পার্বতী সেখানে কঠোর নিষ্ঠাভরে আহুতি দিচ্ছেন তাঁর রূপযৌবন আর সম্ভোগকামনাকে, একাগ্রচিত্তে চাইছেন তাঁর শিবকে, জীবনের সঙ্গী-রূপে। আহুতি সমাপ্ত হলে তাপসরূপী শিব এলেন তাঁর তপস্যার দ্বারদেশে, হুতশেষ হয়ে উঠল প্রেম। মদন যখন ভস্মীভূত তখনই

এ প্রেম পরস্পরের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেল। এর সূচনায় মদন ছিল উন্মাদনারূপে, মাঝে সেই প্রেমদেবতার পূর্ণতর সত্তার উদ্দেশে পার্বতী নিবেদন করলেন তাঁর মনোহারিণী শক্তিকে, মদনের স্বেচ্ছাচারকে। তারপর তাঁরা যখন মিলিত হলেন তখন দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব মদনকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। কালিদাস জানেন, যত মহৎই হোক প্রেম, তার মধ্যে কামনা থাকবেই, আসঙ্গলিপ্সাকে সে কখনোই পরিহার করবে না। যে-কোনো বনস্পতিই অদৃশ্য মূলের সাহায্যে মাটির নীচে রসসন্ধান করে, হরণশোষণ করে, এই মূলকে বাদ দিয়ে সে বাঁচে না। কিন্তু শিকড় থাকবে যথাস্থানে, মাটির নীচে, অগোচরে তার আহৃত রস সঞ্চারিত হবে সমস্ত তরুদেহে, তবেই ফুল ফুটবে ওপরের শাখায়, ফলভারে আনত হয়ে আসবে শাখা, সার্থক হবে তার তরুজন্ম। তাই সংযত মিলনের প্রহরেই পুনরুজ্জীবিত হয় মদন। তাই যক্ষ নির্মল শরৎকালে পরিণতচন্দ্রিকা রাত্রিতে মিলিত হবে যক্ষবধূর সঙ্গে, পুরূরবা নতুন করে পাবেন হৃতশেষরূপে তাঁর প্রেমকে, অপুত্রক রাজা নিজেকে ফলবান দেখবেন আয়ুর মধ্যে, বধূ আর সন্তান নিয়ে কর্তব্যে অবিচল থেকেই প্রেমের ঐশ্বর্য অনুভব করবেন। দুষ্যন্ত দীর্ঘ বিরহানলে হবোর মতো প্রেমের দাহ্য অংশটুকু আহুতি দিয়ে প্রাশিত্ররূপে ফিরে পাবেন যা তাঁর ভোগ্য সেই প্রেমকে ; অপুত্রক দুষ্যন্ত পাবেন সর্বদমনকে আর কল্যাণী বধূকে। এই আহুতি যে দিতে পারল না তার প্রেম দুরন্ত কাম হয়ে জ্বলে মরল অতৃপ্ত জ্বালায়। সে কাম অগ্নিবর্ণের ক্ষয়রোগ আনে, চিতানলে অকালে পুড়িয়ে দেয় তার সমস্ত জীবনকে। আহুতি নেই, তাই হৃতশেষও রইল না।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য বোধহয় পরিমিতিবোধ। এ যুগের বিষ্ণুমূর্তি সূর্যমূর্তি দেখলে শিল্পীর সুষমাসৃষ্টির ক্ষমতায় চিত্ত শ্রদ্ধাপ্লুত হয়। মূর্তিগুলি একটি অস্ফুট স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল ; এ হাসাটি রেখামাত্রসার : একটু কম হলে মূর্তি হত গম্ভীর, একটু বেশি হলে হত উচ্ছল। এই পরিমিতিবোধই কালিদাসেরও সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে এ আর দ্বিতীয় বার দেখা দেয় নি ; পরবর্তী সাহিত্য আতিশয্যদুষ্ট, একা কালিদাসই প্রায় সম্পূর্ণভাবে একে জয় করতে পেরেছেন। সৌষম্যবোধ তাঁর শিল্পকে নতুন একটি মাত্রা দিয়েছে। তাঁর কাব্যনাটকে এর একটি পরিচয় মেলে প্রেমের রূপায়ণে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেমের তরুটির মূল ভূমির গভীরে প্রোথিত, কাণ্ডশাখাপল্লবে তার বিস্তার দৃষ্টিগোচর ; বসন্তের অজস্র সমারোহে তার পুষ্পসম্ভার ঊর্ধ্বে প্রসারিত ; ফলের ঋতুতে ফলোদ্গমে তার পূর্ণ পরিণতি। প্রেমের আত্মত্যাগ যজ্ঞক্রিয়ার মতো নিষ্পাদিত হলে পর নতুন পর্বে প্রেমের যে বিকাশ তাতে ঐশ্বর্য আছে, আতিশয্য নেই ; ভোগ আছে কিন্তু তা একান্ত হয়ে ওঠে নি ; কর্তব্যের সঙ্গে তার আর সংঘাত নেই।

এই বিশেষ বোধটি নানা বিচিত্র রূপকল্পে চিহ্নিত হয়েছে, এবং এটি কবির নিজস্ব উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। মিশর-ব্যাবিলন-গ্রীসের বিরহিণীর বিলাপগাথা বাণিজ্যপথে ভারতে অনুপ্রবেশ করে থাকলেও কালিদাস-সাহিত্যে মদন আর রতির প্রেমকাহিনী যে তাৎপর্য বহন করে তার কোনো আদিকল্প অন্যত্র নেই। এ উপলব্ধির পশ্চাতে আছে গুপ্তযুগের শিল্প আর বিজ্ঞানের যুগপৎ প্রসার এবং উন্নতি, বহির্বাণিজ্য আর আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা থেকে যে নিরাপত্তার বোধ আর আত্মপ্রত্যয় আসে, তা-ও আছে, এবং সর্বোপরি আছে একটি দৃঢ় প্রত্যয় : প্রেম বিদেহ নয়, কিন্তু দেহসর্বস্বও নয়, এবং পূর্ণতম বিকাশের স্তরে কল্যাণের সঙ্গে তার আত্যন্তিক বিরোধ নেই। দেহের মধ্যে থেকেই একটি ঊর্ধ্বশিখ প্রদীপ হয়ে তা জ্বলতে পারে। এই প্রত্যয়টি কালিদাসের কাব্যে একটি কেন্দ্রীয় আদিকল্প, এবং এর স্রষ্টা তিনি স্বয়ং।

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১১

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

গলায় একটা কাটার দাগ। ঢোলগোবিন্দ-র পাসপোর্টে শনাক্তকরণের শূন্যস্থান ওই দিয়েই পূর্ণ করা হয়েছে।

ভাঙা দাঁতের কথা গোড়াতেই বলা হয়ে গেছে। সে তো বেশ ধাড়ি বয়েসে।

কাবুকাকাদের বাড়ির সামনে ছিল একটা বিলিতি আমড়ার গাছ। টকমিষ্টি সেই আমড়া, তার স্বাদগন্ধের—আঃ, তুলনা হয় না। দাদা আর কাবুকা পাকা-পাকা আমড়া পাড়ছিল। এড়ো মেরে। এড়ো জানেন না? গাছের ডালের হাতপ্রমাণ ছোটো-ছোটো লাঠি। শুধু ছুঁড়লেই হল না। হাতের টিপ চাই।

আমি ছিলাম কাবুকা-র ঠিক পেছনে। কাবুকা-র এড়োতেই বোধহয় ফ্যাকড়া-র জায়গাটা একটু উঠে ছিল। তাতে ছিল ছুরির ধার। কাবুকা পেছনে হাতটা ঘুরিয়ে সপাটে ছুঁড়তে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সবাই দেখল, গলায় হাত দিয়ে আমি মাটিতে বসে পড়েছি। আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে বেরোচ্ছিল রক্ত।

খবর পেয়ে মা ছুটে এসেছিলেন গাঁদাগাছের একমুঠো পাতা হাতে নিয়ে। তাতেই কাজ হয়েছিল। আইয়োডিন নয়, বেনজইন নয়—স্রেফ গাঁদাফুলগাছের পাতা। কাটলে, ছড়ে গেলে তার মোক্ষম দাওয়াই।

পা মচকে গেলে চুনহলুদ গরম করে লাগানো। পেট কামড়াচ্ছে? নাই-তে চুন লাগাও। পেট ফাঁপলে দু-চারটে চাল গালে ফেলে জল দিয়ে গিলে নাও। ঘাড়ে ফিক লেগেছে তো বালিশ রোদ্দুরে দাও। এইসব ছিল মা-র টোটকা।

ভাগ্যিস, বাবা নেই। নইলে ডাক্তার বদ্যি ডেকে এনে চব্বর বাধিয়ে দিতেন।

কাটার ঘা শুকিয়ে গেছে। বাঁধাছাঁদা শেষ।

দিদি এসেছিল। দুদিন থেকে গেছে। যাবার সময় কী কান্না। শাশুড়ি পই-পই করে বলে দিয়েছে। ঠিক দুদিন।

দাদার সঙ্গে ঢোলগোবিন্দ গিয়েছিল দিদিকে

আনতে। জাবেদের গাড়িতে। অনায়াসে হেঁটে যেতে পারত। দিদি এখন চৌধুরীবাড়ির বউ। রাস্তা দিয়ে কখনও হেঁটে আসতে পারে? গাঁয়ের লোকে ছি-ছি করবে। পালকি হলেও চলে। কিন্তু লোকনাথপুরে আবার পালকির পাট নেই। দিদিরও পালকি অপছন্দ। মনে হয় এই পড়ে যাব, এই পড়ে যাব। অগত্যা জাবেদের গাড়ি। ল্যাজ মলা দিয়ে তার হুর্‌র্‌র্‌ হুর্‌র্‌র্‌ আর টাকরায় জিভ উলটে কিম্ভূতকিমাকার সব শব্দ—সেও বরং ভালো। পালকির দুলুনি অসহ্য।

ঢোলগোবিন্দ শিখে গিয়েছে। আর জয়রামপুর বলে না। বলে বড়-গাঁ। লোকনাথপুরে বনজঙ্গলের পাট নেই। রাস্তার দুপাশে শুধু কচাগাছ রাংচিতা আর আশশেওড়া। একটাও ডোবাগর্ত নেই। অথচ বড়-গাঁ আর কতটা পথ? দেড়-দু ক্রোশ? অথচ সেখানে দেখো, ব্যস্‌ রে, হাই উঁচু সব গাছ, তাতে লতাপাতার কী ঠাস-বুনট। ডোবাপুকুরের ছড়াছড়ি।

লাফিয়ে নেমে থমকে যাই। সামনের ঘরে এক বুড়ো গোমস্তা বসে চুলছে। মনে-মনে ভেবে এসেছিলাম গাড়ির চাকার কাঁচকোঁচ শব্দ পেয়ে দিদি বাইরে বেরিয়ে লাফাতে-লাফাতে এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

আমাদের বসতে হল। বৈঠকখানায় বড়ো একটা তক্তপোশ। তার ওপর একটা মোটা শতরঞ্চি পাতা। তাতে প্রজারা এসে বসে।

ভেতরে খবর গেছে। আমরা বসে আছি।

না, বেশ আদর করেই আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। হাজার হোক, আমরা হলাম এ বাড়ির—কী যেন বলে, দাদা? হ্যাঁ, কুটুম। আত্মীয় আর কুটুমে তফাত আছে। ঢোলগোবিন্দ তা বিলক্ষণ জানে।

মাঝখানে বড়ো একটা উঠোন। তার মধ্যে টিমটিম করছে বাঁধানো একটা তুলসীর মঞ্চ। না একটা ফুলগাছ, না লাউয়ের কোনো মাচা। দিদিটা কী?

নওগাঁয় আমাদের ওইটুকু উঠোন। সেখানে দিদির লাগানো গাছে এখনও কত ফলফুল হয়। লোকনাথ-পুরে রোয়াকের নীচে তিন-তিনটে গাছে এখনও কত গোলাপ ফোটে। দিদিটা কী? এত বড়ো উঠোন পেয়েও কিছু করে নি?

দিদির মাথায় ঘোমটা। বাপের বাড়ি যাওয়ার আনন্দ তাতে ঢাকা পড়ে নি।

শাশুড়ি বড়ো রাশভারী। চুল ছোটো করে ছাঁটা। রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পাতা। তাতে বসতে না বসতে শুরু হয়ে গেল ওঁর গল্প। 'হ্যাঁ গো, কোন্‌ কেলাসে পড়ো? আমার তো বাবা, নেকাপড়া হয় নি। হবে কোত্থেকে? আমাদের কালে মেয়েদের কি আবার হাতেখড়ি হত? আর হবেই বা কী করে? গাল টিপলে যখন দুধ বেরোয়, তখন থেকেই তো ঘাড়ে পড়েছে সংসারের এই জোয়াল। কাজ হল তো বিয়োনো। আর নাম কী? না, গন্ধধারিণী। আহা, আমার প্রথম বেটাটা যদি থাকত। তাহলে কি আর আমার হাড়ে এমন দুব্বো গজাত? রানীমা হয়ে আজ আমি সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা দিয়ে থাকতে পারতাম। তোমাদের তালুইমশাই-য়ের তৌজিমৌজা কম ছিল? হাতের নোয়াও ভাঙল, আমার কপালও পুড়ল। সব তো তখন গেঁড়ি-গুগলি। একটার পর একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া। ছেলেদের মানুষ করা। সব তো ওই জমি বেচে। তোমাদের জামাইবাবুও হয়েছে সেই পদের। লেখাপড়া করতে-করতে ছেড়ে দিল। বলল জমিদারি দেখবে। দেখছে তো কত। এসরাজে ছড় টানছে আর আশুর ডাক্তারখানায় বসে রাজাউজির মারছে। আজ সারা সকাল তো দেখলাম বসে-বসে কেবল বন্দুক পরিষ্কার করল। বললাম পুকুরে একটু জাল ফেলার ব্যবস্থা কর। তা রামগঙ্গা কিচ্ছু না বলে বেরিয়ে গেল। আর বউমাই বা কী! আমরা তো জানি : 'শশা খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান ; চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান।' ওসব ছিল পুরনো দিনে। এখন তো শহর থেকে বউ হয়ে আসে কাঠ-কাঠ ধিঙ্গি মেয়ে। দেখো না, দুটি ভাই এতটা রাস্তা এসেছে, তাদের যে একটু করে ক্ষীরের সঙ্গে কাঁঠাল ভেঙে দেবে—সে হুঁশটুকুও নেই। ঘরে গিয়ে দেখো, যাবে বলে এখন থেকেই সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে। কথায় বলে, মা-র পেটের ভাই কোথায় গেলে পাই।...'

দেখে মনে হয়েছিল রাশভারী। বাপ্‌ রে, এ যে দেখি মেলগাড়ি। জংশন না এলে থামাথামি নয়। কথা বলছেন, না মধুর কলসি ভাঙছেন—বোঝার জো নেই।

দেখার আগে অব্দি ঢোলগোবিন্দ দূর থেকে মনে-মনে ওঁর যে ছবি এঁকেছিল, কাছে এসে এখন দেখছে সেটা ঠিক নয়।

ঢোলগোবিন্দ এখন বুঝতে পারে, কোনো মানুষকেই একরঙাভাবে দেখাটা ঠিক নয়। সেকেলে লোক। জগৎটাও তো ওঁর খুব বড়ো নয়। পুরনো জটগুলো মন থেকে ছাড়ানো কি অতই সহজ? ওঁর ব্যথার জায়গা-গুলোর খবরই বা কে অত রাখে?

উনি তো লিখতে জানেন না। কিন্তু বাবার নামে দিদির বিয়ের দেনাপাওনার ব্যাপারে কিটিয়ে-কিটিয়ে লেখা ওঁর চিঠিগুলো? সে তো আর উনি নিজে লেখেন নি। তবে কি, যে লিখেছে তারও মনের মাধুরী তাতে মেশানো ছিল? যেই দাঁত ফোটাক, তাতে বিষ ছিল। এবং বিলক্ষণ বিষ।

এক ফাঁকে আমরা বাড়ি দেখার ভান করে উঠে গিয়েছিলাম। বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি। পেছনে আম-কাঁঠালের বাগান। এক কোণে একটা গন্ধরাজ লেবুর গাছ।

ওপর নিচে। এ-ঘর ও-ঘর। দিদি কোথায়?

শেষকালে পাওয়া গেল ঢেঁসকেলে। একজন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল। আর গর্তে হাত চালিয়ে-চালিয়ে কোটা চিঁড়েগুলো দিদি বার করে আনছিল। আমরা দুজনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। দিদি করছে কী? চালে একটু ভুল হলেই যে পাঁচটা আঙুলই চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে!

এর নাম ঘরে বসে সাজগোজ? বাপের বাড়ি যাবে বলে নেচে ওঠা? মাউইমা নিশ্চয় চোখে কম দেখেন।

এমন সময় হৈ হৈ করে বাড়িতে এসে ঢুকলেন—কে? জামাইবাবু। এক হাতে বন্দুক। আরেক হাতে দড়িতে ঝোলানো তিনটে বালিহাঁস আর একটা ঘুঘু।

আমাদের গাঁয়ের দুই ডুমুরের ফুল।

এক তো পশ্চিমের ঘরের জ্যাঠামশাই। দয়াময়ের বাবা। বছরে দশ মাসই বাড়ির বাইরে। শিষ্যবাড়িতে যজমানি করে বেড়ান। ফেরেন রীতিমত ছাঁদা বেঁধে। দক্ষিণা যা পান এমন কিছু নয়। আসল হল দানসামগ্রী। ওইসব বেচেবুচে জ্যাঠাইমা কায়ক্লেশে দিন চালান।

ঢোলগোবিন্দ-র এখন মনে হয়, জ্যাঠামশাই তো ছিলেন কুলীন বামুন। এখানে সেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের ভার লাঘব করতে হয় নি তো তাঁকে?

আরেক ডুমুরের ফুল তারিণী দাদামশাই। আমাদের গাঁয়ে জমিদার বলতে ওই একজনই। এ পাড়ায় ওই একটা বাড়িতেই যা দুর্গোৎসব হয়।

একে বেঁটেখাটো। গায়ের রঙ বেশ কালো। হাঁটুর ওপর কাপড়। অষ্টপ্রহর মুখে থলো হাঁকো। সঙ্গে ফতুয়া থাকলেও, দাদ চুলকানোর ঠেলায় সে ফতুয়া গায়ে উঠতে বড়ো একটা দেখা যেত না।

নারদের যেমন ঢেঁকি, তারিণী দাদামশাইয়ের তেমনি ছিল নিজস্ব গোরুর গাড়ি। গাড়ি করে ছাড়া আমরা কখনও তাঁকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বিরাট বাড়ি হলে হবে কি, সংস্কার অভাবে একটা দিক তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম।

জমিদারি পড়ন্ত বলেই কি তারিণী দাদামশাইকে খাজনার তাগাদায় অমন হোট্‌টো হোট্‌টো করে ঘুরে বেড়াতে হত?

তারিণী দাদামশাইয়ের প্রথম পক্ষের বউকে আমরা দেখি নি। দেখবার কথাও নয়। কারণ, দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে নীলু আর দেবু—ওরা দুজনেই তো ছিল আমার খেলার সাথী।

নীলু-দেবুর মা-কে আমরা ঠাকুমা বলতাম। হাত পুড়িয়ে রান্না করা থেকে সেলাই-ফোঁড়াই পর্যন্ত বাড়ির সব কাজই ঠাকুমাকে করতে হত। তারিণী দাদামশাইয়ের সঙ্গে বয়সেরও ছিল অনেক তফাত।

কাঠের ধোঁয়া বোস-ঠাকুমার গায়ের রঙ পোড়ালেও ষোলো আনা চেপে দিতে পারে নি। এই বয়সেও বোস-ঠাকুমাকে সবাই বলত রূপসী।

বোস-ঠাকুমার মা-বাবা যে কী দেখে তারিণী দাদা-মশাইয়ের মতন পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন, শুধু ঢোলগোবিন্দ কেন, গাঁসুদ্ধু লোক তা ভেবে পেত না। একে তো পাত্রের ওই ছিরি, তার ওপর আবার দ্বিতীয় পক্ষ। তাও যদি তেমন নামডাকওয়ালা জমিদার হত। কিংবা জামাইটি সেরকম গুণের হত। অমন সুন্দরী বউ, হেঁসেল ঠেলে আর ছেলেমেয়ে বিইয়ে তার যে হাড় কালি হয়ে যাচ্ছিল—চোখের মাথা খেয়ে তারিণী দাদামশাই কি তা দেখতে পেতেন না? আর ওঁর অন্য ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর ব্যাপারটা? সে খবরও গাঁয়ের লোক বিলক্ষণ রাখত। নইলে ওই বয়সে ঢোলগোবিন্দ-দের কানেই বা সে খবর গেল কেমন করে? মেয়ে তো নয়,

একেকজন রূপের ধুচুনি। বোস-ঠাকুমার পাশে তারা কেউ পেত্নি, কেউ শাঁকচুন্নি। তবু ও-বাড়িতে কী তাদের দাপট!

বলিহারি দিতে হয় বোস-ঠাকুমার মা-বাবাকে। এমন নয় যে তাঁরা দীনহীন। তাই সব জেনেশুনেও হাতপা বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে হয়েছিল। ও'রাও ছিলেন হুগলীর এক ভারী জমিদার। কলকাতায় নিজেদের বাড়ি। বোস-ঠাকুমার ভাইরা সব নামীদামী ব্যারিস্টার। কী এমন লবাব তারা যে, দিদিকে তারা একবারও দেখতে আসতে পারে না? কলকাতা থেকে দর্শনা কী আর এমন বেশি দূর! পঁচাত্তর মাইলও তো নয়।

খুব অসহ্য হলে বোস-ঠাকুমাই বরং ছেলেমেয়েদের ঠ্যাঁকে গুঁজে মাঝে-মধ্যে দু-চার দিনের জন্যে কলকাতায় বাপের বাড়িতে চলে গিয়ে একটু জিরিয়ে আসেন। নীলু-দেবুদের মুখে ঢোলগোবিন্দ শুনেছে, ওর মামারা নাকি খুব ভালো লোক। মামীরাও ওদের খুব যত্নআত্তি করে। মোটরগাড়িতে চড়ায়।

তবু একটা খটকা ঢোলগোবিন্দর মন থেকে যায় না। বোস-ঠাকুমা অতই যদি আদরের বোন হবে, ও'র গায়ে একটুও সোনাদানা নেই কেন? বোস-ঠাকুমা কি তবে ছিলেন ও'র বাপের দুয়োরানীর মেয়ে?

তারিণী দাদামশাইয়ের যত দোষই থাক, বউয়ের গয়নাগুলো বেচে দিয়েছিলেন—এ অপবাদ কেউ দিতে পারে না। গাঁয়ের কোনো লোক সে অপবাদ দেয়ও নি।

এইখানেই মুশকিল তারিণী দাদামশাইকে নিয়ে।

তারিণী দাদামশাইয়ের নানা রকম খুঁত কাড়লেও একথা কেউই বলত না যে, তারিণী বোস বদমায়েশ ছিলেন। মুখে চোটপাট করলেও খাজনা ছাড় দিয়েছেন, বিপদে সাহায্য করেছেন—হাতে মারলেও কখনও কাউকে ভাতে মারেন নি। সংসারে তাঁর আঠা ছিল না সত্যি, নারদের ঢেঁকিতে চড়ে সম্বৎসর নিজের মহালে চক্কর দিয়ে বেড়াতেন—কেন কিজন্যে কেউ জানত না। ঢোলগোবিন্দর খালি মনে হত, তারিণী দাদামশাই খুব ছোট্টবেলায় সাপের মাথার মণির মতো কিছু একটা হারিয়েছিলেন, বাকি জীবনভর সেটাকেই তিনি অন্ধকার হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তারিণী দাদামশাইয়ের ওপর ঢোলগোবিন্দর খুব মায়া হত।

ঢোলগোবিন্দরা চলে যাবে শুনে তারিণী দাদামশাই এসে হাজির। ওর হাতে আর ওর দাদার হাতে একটা করে রূপোর টাকা দিয়ে দুজনকে কোলের মধ্যে নিয়ে তারিণী দাদামশাই যখন চুমো খাচ্ছিলেন, দুই ভাইয়েরই তখন মনে হচ্ছিল—মা বলেছিলেন না, দাদ জিনিসটা বড্ড ছোঁয়াচে?

নৌকো নিয়ে পদ্মায় পাথর ফেলার কাজে গেছে ক্ষ্যাপাদা।

যাওয়ার আগে নিজের হাতে আমাকে তৈরি করে দিয়ে গেছে একজোড়া ভারি সুন্দর রণ্‌পা। বলেছিল, যখনই ইচ্ছে হবে এই রণ্‌পা করে ছুটে চলে আসবি।

বোসবাড়ির ঠিক সামনে ছোট্ট একটা মাঝিপাড়া। সেখানেই রাস্তার ঠিক ধারেই ক্ষ্যাপাদাদের বাড়ি। খড়ের চাল। মাটির উঁচু দেওয়াল। এইটুকুই মনে আছে। বাড়িতে আর কে ছিল না ছিল কিচ্ছু মনে নেই।

ছিপছিপে চেহারা ক্ষ্যাপাদার। নাকমুখচোখের গড়ন এমন যে, দেখলেই বোঝা যায় ঘটে বুদ্ধি ধরে। অথচ জীবনে কোনোদিন পাঠশালায় যায় নি। নিজের নামটা অব্দি সই করতে জানে না।

ক্ষ্যাপাদা কথা যে বেশি বলে তা নয়। কিন্তু যা বলে তা অন্যদের শোনাবার মতন ক্ষমতা রাখে।

এ গাঁয়ের যত ছেলে-ছোকরা আমরা সবাই ক্ষ্যাপাদার চেলা। ক্ষ্যাপাদা যেখানে যায় আমরা ল্যাজ হয়ে তার সঙ্গে ঘুরি।

আমাকে ক্ষ্যাপাদা একবার শুধু গুলতিই দিয়েছিল তা নয়। সেইসঙ্গে মাটির ছোটো-ছোটো গুলি বানিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। পোড়ামাটির সেইসব গুলি খেয়ে তাগড়াই কুকুররা পর্যন্ত কেঁউ-কেঁউ করে পালাতে পথ পেত না।

গুলি গুলতি রণ্‌পা—এসব তৈরি তো কিছুই নয়। ক্ষ্যাপাদার ছিল অসাধারণ হাতের কাজ। ছোটো-ছোটো পুতুল তৈরি করত এমন যে তার কাছে কোথায় লাগে ঘুর্নির পুতুল। নিজের রঙ নিজেই বানিয়ে নিত। নীলু-দেবুদের একবার গড়ে দিয়েছিল সরস্বতীর ছোট্ট প্রতিমা। ওরা সেটাকে পুজো করেছিল।

ধারালো ছুরি দিয়ে কাঠ খুদে-খুদে মজাদার সব মূর্তি বানাত ক্ষ্যাপাদা।

তারপর বর্ষার ঠিক আগে নৌকো নিয়ে চলে যেত পদ্মায়। পাথর ফেলার কাজে। ফিরে আসত আমাদের জন্যে ঝুলিভরতি গল্প নিয়ে। তাতে কী থাকত না? ব্রহ্মদত্যি মামদোভূত পেত্নী শাঁকচুন্নি হুরী পরী—থাকত সব কিছুই। আমরা হাঁ করে গিলতাম।

ক্ষ্যাপাদার আসল টান ছিল অন্য জায়গায়। ওর ছিল ভাসানের দল। ক্ষ্যাপাদা ছিল তার অধিকারী।

ঢোলগোবিন্দ-র আজ এই ভেবে আপশোস হয় যে, কেন সেই সময় টেপ রেকর্ডার বা ভিডিও-র চলন হয় নি। আজকের লোকে তাহলে দেখতে পেত কেমন ছিল ক্ষ্যাপাদার সেই ভাসানের দল।

চাঁদের আলোয় বানভাসি হওয়া শুক্লপক্ষের রাত। আমরা বসেছি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে ঘাসে-ছাওয়া উঠোনে। গোটা কয়েক বাঁশ পুঁতে তাতে ঝোলানো হয়েছে লণ্ঠন।

মাঠে যারা গোরু চরায় তাদের নিয়েই গড়া হয়েছে ভাসানের এই দল। পুরোটাই পালাগান। কী মিষ্টি ছিল সবার গানের গলা। ফাঁকা মাঠে গেয়ে-গেয়েই বোধ-হয় গলা অমন খোলতাই হয়।

যে ছেলেটার গলা একটু ভাঙা-ভাঙা, ক্ষ্যাপাদাকে একদিন দেখেছি মহড়া দেবার সময় তাকে একদিন চড় মারতে। 'একশো দিন না বলেছি তোকে গুড়ুক খাওয়া কমাতে?' তাকে হাজার বলেও কোনো কাজ হয় নি।

গোয়ালাবাড়ির এক গা-ভারী ছেলে সাজত বেহুলা। সেজেগুজে কালোর মধ্যে ভারি সুন্দর দেখত তাকে।

পেছন দিকে বসে ক্ষ্যাপাদাই সবাইকে মেকাপ করত। সে জায়গাটায় হত আমরা যারা ছেলেছোকরা তাদের ভিড়। বাড়ির বড়োরা তো সব বাবুর দল। তারা বসত রোয়াকে। ছোটোলোক চাষা-ভুষোদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

ঢোলগোবিন্দ-র অভিজ্ঞতা বলে, ছোটোরা ভারি বিচ্ছু। যতদিন বয়স কম থাকে, বাড়ির বাবুদের চেয়ে যারা সব সময় মনিবদের দাঁতে-দাঁতে থাকে, লাথিঝাঁটা খায় সেই সবার নীচে সবার পিছে থাকা কাজের লোকদের ওপরই বেশি টান থাকে। একটু বড়ো হোক, অমনি তোমার আমার আপন পর ইতর ভদ্র ভাবগুলো ছাপিয়ে উঠতে থাকবে। সমাজ না বদলালে এসব যাবে না।

ক্ষ্যাপাদার ব্যাপারে ঢোলগোবিন্দর কাছে শেষ খবর ছিল এই : দর্শনায় যখন চিনির কল হল, তখন আমাদের গ্রাম থেকে নাকি সর্বপ্রথম ক্ষ্যাপাদাই গিয়ে সেখানে কলের মজুর হয়।

ক্ষ্যাপাদা চিনিকলের মজুর হয়েছে শোনার পর মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমিও বড়ো হয়েছি। শুধু আখ নয়, আখের মতো মজুরদেরও কলের মালিকেরা যে নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে দেয়—এটা সবে বুঝতে আরম্ভ করেছি।

যতদূর মনে হয়, ক্ষ্যাপাদাকে মজুর হতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। যুদ্ধের সময় জাপানিদের এসে পড়ার ভয়ে মাঝিদের নৌকোগুলো যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাতে ক্ষ্যাপাদার আর কীই বা করবার ছিল?

ক্ষ্যাপাদার রস নিংড়ে নেওয়ার ছবি দূরে বসেও মনশ্চক্ষে আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম।

কুলুপিতে মাকড়সারা নিশ্চয় জাল বুনেছিল। তাতে আড়াল পড়ে গিয়েছিল আস্তে-আস্তে রঙ-চটে-যাওয়া পোড়ামাটির সব পুতুল আর খোদাই-করা কাঠের ছোটো-ছোটো মূর্তি।

দর্শনার ওপর দিয়ে যুদ্ধের বছরগুলোতে ঢোলগোবিন্দ কত বার গোয়ালন্দ গিয়েছে। বেছে-বেছে সে গিয়েছে মেলগাড়িতে। পাছে প্যাসেনজারে গেলে দর্শনায় নেমে পড়বার ইচ্ছে হয়।

গেলে থাকবারও তেমন অসুবিধে হত না। মেজো-মামা তখন একটার পর একটা ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলে শেষ পর্যন্ত দর্শনায় একটা দেশী মদের দোকান খুলে বসে আছেন।

কেউ-কেউ দেখে এসে বলেছে, এ দোকানও ও'র লাটে উঠবে। ও'র কোনো খেয়াল আছে? সকাল থেকেই তো রঙ চড়িয়ে থাকেন। যে দুটো লোক রেখেছেন, তারা দিব্যি আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে না কেন? একবার করে বন্দুক নিয়ে বেরোন। দুটো একটা পাখি মেরে আনেন। নিজে রেঁধে অন্যদের খাওয়ান। সন্ধে হলে ইংরিজি-মিংরিজিতে কিসব গড়-গড় করে বলেন। দোকানের খদ্দেরের চেয়ে রুগীর ভিড়ই ও'র ঢের বেশি হয়। বিনাপয়সার ডাকতার। অবস্থাবিশেষে ওষুধের পয়সাটাও ও'র পকেট থেকেই যায়। গ্রামের লোকে ধন্য-ধন্য করে। বলে, মানুষ তো নয়, দেবতা।

রামনগরের ভদ্দরলোকেরা আমার লক্ষ্মীছাড়া মেজোমামাটিকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। একে শুঁড়ি

তায় মাতাল। আর মদ যখন খায় তখন চরিত্রহীন না হয়ে যায় না।

মেজোমামা লোকচরিত্র বিলক্ষণ বুঝতেন।

মা যখনই লোকনাথপুরে যেতেন কিংবা নওগাঁয় ফিরতেন মেজোমামা ইস্টিশানে এসে দেখা করতেন। থার্ড ব্র্যাকেটের মতো ইয়া ঝোলা গোঁফ। ভাঙা গাল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আধময়লা ধুতি আর শার্ট সত্ত্বেও লম্বা চেহারায় একটা ডোন্ট কেয়ার ভাবের হাসি মেজোমামাকে ভিড়ের মধ্যেও ঠিক চিনিয়ে দিত।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে মেজোমামা ইচ্ছে করেই যেতেন না। ভাইয়ের কথা তুলে পাড়ার লোকে পাছে মাকে কিছু বলে। বাবা-কাকাদের কথার আড়ে ওইরকমের একটা নাকতোলা ভাব আমাদের নজর এড়ায় নি।

স্টেশনে এলেই মা যেন দুটো কান খাড়া করে থাকতেন 'ভুলি' ডাকটা শোনার জন্যে। শ্বশুরবাড়িতে কেই বা আর মা-কে ও-নামে ডাকবে। কী একটা কাগজে মাকে একবার নামসই করতে হয়েছিল। মা গোটা-গোটা অক্ষরে লিখেছিলেন : যামিনীবালা দেবী। নইলে ওই 'যামিনী' নামটাও চট করে আমরা জেনে উঠতে পারতাম না।

মেজোমামাকে মনে-মনে আমরা দু ভাইই খুব ভালোবাসতাম।

যুদ্ধের সময় কতবার গোয়ালন্দে গিয়েছি। মন করলে অনায়াসে দর্শনায় নেমে টুক করে মেজোমামার খবর নিয়ে আসতে পারতাম। কে কী বলবে ভেবে পারি নি। আমি না হয়ে দাদা হলে ঠিক পারত।

বাড়ির লোকদের চটাবার সাহস আমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র দাদারই ছিল।

আমাদের গ্রামে একটা নাটক সবে যখন জমে উঠছে, তখনই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে মনটা খারাপ লাগছে।

ব্যাপারটা পেকে উঠেছে ফকিরঠাকুরকে নিয়ে। মানে, আমাদেরই পাড়ার ফকিরকাকা।

ফকিরকাকা বরাবরই একটু ডানপিটে গোঁয়ার-গোবিন্দ। অমন নামি বাড়ির ছেলে, লেখাপড়াতেও ইস্তফা দিয়ে বসল যখন ওর শহরে গিয়ে কলেজে পড়বার কথা হল।

বামুনপাড়ার লোকে বলে, ছেলেটা বখে গেছে। দিনরাত্তির যতসব ছোটোলোকদের সঙ্গে মেশে। কামারপাড়া ঘোষপাড়া জেলেপাড়ার লোকগুলো চুপচাপ শোনে আর ঠোঁট টিপে-টিপে হাসে। ওদের ভাবখানা, বামুনপাড়ার ওপর খুব একহাত নেওয়া গেছে।

ফকিরকাকা দুবেলা দুটো খেতে আসত। ব্যাস, বাড়ির সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না।

কামারপাড়ায় ঘরামিদের সঙ্গে নিজে হাত লাগিয়ে কম পয়সার একটা চালাঘরও বানিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে ওখানেই বোধহয় ফকিরকাকা পাকাপাকিভাবে গিয়ে থাকবে।

আমাদের চোখের ওপর ফকিরকাকার চেহারাটা দিন-দিন বদলে যাচ্ছে। রাত ফরসা হতেই কচাগাছের একটা ডাল ভেঙে দাঁতন করতে-করতে মাঠের কাজে চলে যায়। খালি গা, হেঁটোয় ওঠা ধুতি, কোমরে গামছা বাঁধা। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের রঙ যা হয়েছে, কে বলবে বামুনপাড়ার ছেলে। পৈতেটা ছাড়তে পারে নি। তবে এখন আর সেটা কাঁধ থেকে তেরছা হয়ে ঝোলে না। দো-ফেরতা করে কণ্ঠীর মতো সেটা গলায় পরে। আর সব সময় সঙ্গের সাথী তার নিজের হাঁকো। এইভাবে বামুনদের জাত বাঁচানোতে গাঁয়ের চাষাভুষোদেরও একটা সায় ছিল।

ফকিরঠাকুরের বামুনের ভেখগুলো না থাকলে ওর জাত মারাটা চাক্ষুষ হবে কেমন করে?

বামুনপাড়ার লোকেরা ফকিরকাকার জাত খোয়ানোর ব্যাপারটা নিয়ে ভেতরে-ভেতরে তখন বেশ চটিতং। তাদের দৃঢ় ধারণা, মেয়েমানুষ কিংবা নেশাভাং দিয়ে ছোটোলোকেরা বামুনের ছেলেটাকে ফুসলে নিয়েছে। গোপনে তদন্ত করে তাদের সন্দেহের কোনো প্রমাণ যোগাড় করতে না পেরে তাদের অস্বস্তি আরও বাড়ছিল।

ঢোলগোবিন্দ-র কাছে ফকিরকাকা আজও এক রহস্য।

কলকাতায় এক সময়ে এক ব্যারিস্টারের ছেলেকে সে দেখেছে সিনেমায় শখ করে গেট-কীপারের কাজ করতে। ট্রামেবাসে যখনই সে উঠত, কফনো সীটে গিয়ে বসত না ; দরজায় দাঁড়িয়ে ঘন্টি বাজাত।

পরে রাজনৈতিক জীবনে ঢুকেও সে দেখেছে,

কিভাবে মধ্যবিত্ত ঘরের গ্রাজুয়েট ছেলে আন্দোলন করতে গিয়ে অশিক্ষিত আদিবাসী জীবনে নিজেকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছে। 'নীচে নেমে যাওয়া', না 'হাত ধরে টেনে তোলা'—এই কঠিন প্রশ্নটার আজও সে কোনো সহজ সরল জবাব খুঁজে পায় নি।

এদের কারো সঙ্গে কারো সমস্যার মিল হবে না।

ফকিরঠাকুরের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। ফকিরকাকার কাছে মাথার কাজের চেয়ে মাঠের কাজের টানটাই ঢের বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার জাতবদল শখ করে বা আদর্শের টানে নয়। শিকড়ে ফেরার জন্যে।

ঢোলগোবিন্দ মাঝে-মাঝে নিজেকে বলে : ভুলে যেও না, ইতর থেকেই একদিন ভদ্র হয়েছিলে। জুতো সেলাইতে শুরু করে তবে তোমার পূর্বপুরুষেরা চণ্ডীপাঠে পৌঁচেছিল। পা থেকে মুণ্ডু, মুণ্ডু থেকে পা—এমনি করে ধমনীতে চলে রক্তের চক্কর।

সকালেও এসেছিল ডুগডুগির হাট থেকে আন্না পাগলী। সেই একভাবে। চাল চিবোতে-চিবোতে।

কথার অর্ধেকটা গিলে ফেলে বলে ওর সব কথা বোঝা যায় না। বেশিটাই আন্দাজে ধরে নিতে হয়।

মার কাছে আন্নার যত আবদার। মা ওকে কখনও পুরনো কাপড় দেয়। কখনও বসিয়ে খাওয়ায়।

আন্না জানে না, হাটে যে বোষ্টমীটা থাকত—এক ছোকরা বোষ্টমকে ভাগিয়ে এনে এ-গাঁয়ের মাঝিপাড়ায় একটা আখড়া বানিয়ে যে থাকছিল—আজ এক সপ্তাহ হল সে ওলাউঠা হয়ে মারা গেছে।

বোষ্টমীর দাঁতগুলো ছিল মিশকালো। শুধু মিশিতে দাঁত অত কালো হয়? মুখশ্রীটা ছিল ভালো। গানের গলাটা ছিল একটু ভাঙা-ভাঙা। ডুগডুগির হাটে যখন থাকত, হপ্তায় একদিন এসে গান শুনিয়ে যেত।

কিন্তু এ গাঁয়ে আসার পর থেকে ওর বাড়ি-বাড়ি ঘোরা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেদিন যার দেবার কথা ভক্তরা নিজেরাই সিধেগুলো আখড়ায় পৌঁছে দিত।

মা-র কাছে যখন খবর এসে পৌঁছুল তখন বেশ বেলা। এ গাঁয়ে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো একজনই। আমার মা।

মা-র কাছে ছোটোলোক বড়োলোক নেই। তা ছাড়া গরিব-গুরবোদেরই মাকে বেশি দরকার। ওদের তো আর ডাকতার বদ্যি ডাকার মুরোদ নেই।

মালোপাড়ায় প্রসব করাতে যাওয়া নিয়ে ঠাকুরদার সঙ্গে মা-র একটু লেগেছিল। 'নোংরা ছোটোজাত, একেবারে অতটা ওদের গায়ে গা না ঠেকালেই কি নয়?'

মা কোনোরকম তর্কে না গিয়ে 'বাবা, আমি আসছি' বলে লণ্ঠন হাতে নিয়ে চলে গিয়েছিল। একবার নয়। দুবার। সেই দুবারই আমি ঠাকুরদাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে ঠাকুরদারই শেখানো দোহা আওড়েছিলাম :

যবলগ নাতা যাতকা
তবলগ ভক্তি না হোয়।
নাতা তোড় ভক্তি করে
ভক্ত কহাওয়ে সোয়॥

নিকিরিরা এর পর থেকেই মাঝে-মাঝে জোর করে আমাদের বাড়িতে মাছ দিয়ে যেত। পয়সা দিতে গেলে দু কানে হাত দিয়ে জিভ কেটে পালাত। সেই মাছে ঠাকুরদারও মন ভিজেছিল। বলত, জাতে ওরা ছোটো হলেও মনগুলো ওদের বড়ো।

হয়তো সেইজন্যেই পরের বিপদে মা-র বুক পেতে দেওয়ার ব্যাপারটাতে ঠাকুরদার আপত্তির ভাব বেশ কমে এসেছিল।

কিন্তু ওলাউঠা রোগটা অত সহজভাবে তো আর নেওয়া যায় না। ছেলেপুলের বাড়ি। কোত্থেকে কী হয়ে যায় কে বলতে পারে?

মা ঠাণ্ডা মাথায় জানালেন ময়লাগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা হবে। সঙ্গে হাত ধোবার কারবলিক সাবান আছে। বাড়িতে লায়জলের জলে সব ভিজানো হবে। এতে ভয়ের কিছু নেই। 'তাছাড়া নওগাঁয় সেবার পশুপতিমামাদের বাড়িতেই তো কলেরা হয়েছিল। সেখানেও তো আমিই সেবাশুশ্রূষা করেছিলাম। আপনার মনে নেই?'

ঠাকুরদাকে দেখে মনে হল না মা-র কোনো যুক্তি ওঁর মনে ধরেছে।

মা-র সে রাত্তিরে বাড়ি ফেরা হয় নি। কলেরা রুগীর সেবা করতে যাওয়াটা আমাদের কাছেও একটু বাড়াবাড়ি ঠেকেছিল। সেই সঙ্গে ভয়ও হয়েছিল—মা-র যদি কিছু হয়।

আপনপর ভাবটা খুব ছোটোতেই এসে যায়। কোল বাছাবাছি দিয়ে তার শুরু। আরেকটু বড়ো হলে হয়

ইতর-ভদ্রবোধ। স্বজাতি স্বদেশী—এসবও বড়ো হওয়ার আগেই মনের মধ্যে ঢুকে যায়।

ভোর হতে না হতেই ঢোলগোবিন্দ মাঝিপাড়ায় ছুটে গিয়েছিল। বেড়ার ধারে এসে দেখে উঠোনে কিছু ছেলে-ছোকরা ভিড় করে আছে। ক্ষ্যাপাদা দুটো বাঁশের সঙ্গে একমনে কাতার দড়ি বেঁধে চলেছে। মা দাওয়ায় বসে। চোখদুটো লাল। মুখ দেখে মনে হল কিছুক্ষণ আগে কেঁদেছে।

ঠাকুরদার কথাগুলো ঢোলগোবিন্দর কানে তখনও বাজছে। কোথাকার কে বোষ্টুমী। জাতের ঠিক নেই। তার জন্যে...

সত্যিই তো। যে আমাদের কেউ না। বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়ায়। তার জন্যে অত কিসের?

ঢোলগোবিন্দ খবরটা দেবার জন্যে ছুটতে-ছুটতে চলে এসেছিল বাড়িতে। পুজোর দালানের সামনে এসে হঠাৎ তার বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। দিদির লাগানো গোলাপগাছগুলোর সামনে কে দাঁড়িয়ে? কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সেই বোষ্টুমী। খঞ্জনী বাজছে। 'হরি, তোমার পায়ে স'পেছি মন'। আগেকার শোনা গান নয়। গলাটাও কেমন যেন অন্যরকম।

ঢোলগোবিন্দ লাফিয়ে পেঁঠেগুলো ডিঙিয়ে বারান্দার ওপরে এল। মুখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল এ অন্য লোক। দাঁতগুলো সাদা। বয়সও কম।

হঠাৎ কেন যে ওর কান্না পেল ও নিজেই জানে না। মোটেই সেই বোষ্টুমীর জন্যে ও কাঁদছে না। ও কাঁদছে মা-র জন্যে।

ভাগ্যিস, বাড়ির কেউ তখনও ওঠে নি।

গোরুর গাড়ির ছইতে থেকে-থেকেই মাথা ঠুকে যাচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে ঢোলগোবিন্দর মন ভালো নেই। নইলে নলগাড়ির রাস্তা দিয়ে বৈঁচিফল খেতে-খেতে দাদার সঙ্গে হেঁটে যেত। বাঁদিকে পড়ত জয়নালের বান। ডানদিকে আদিগন্ত আখখেত। তারপর ঠেলে উঠত রামনগরের রাস্তায়।

পেছনে কত কী ফেলে যাচ্ছে ঢোলগোবিন্দ।

বর্ষা এলে যখন বড়ো-বড়ো ঢেউ ভেঙে নৌকোয় ভারি-ভারি পাথর নিয়ে পদ্মা পাড়ি দেবে, হে মা রক্ষে-কালী, ক্ষ্যাপাদাকে তুমি দেখো।

নীলু-দেবুদের পুরনো বাড়িতে বড়ো বেশি সাপের উৎপাত, হে মা মনসা, তুমি ওদের নিরাপদে রেখো।

যে কেন্নোগুলোকে টোকা মারলেই টাকার মতন গুটিয়ে যায়, তারা যেন দয়াময়ের মা-র সামনে না আসে। জ্যাঠাইমা কেন্নো দেখলেই কেমন যেন কেঁচোর মতন হয়ে যান।

জিওলগাছের সেই রক্তাক্ত ব্যথার জায়গাটাতে ফুঁ দেওয়ার মতো করে হালকা হাওয়া যেন বয়ে যায়।

কাঁচপোকা, তোমরা থেকো। দিদি বাপের বাড়ি এলে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দুপাশের রগে ভিজে গামছা চেপে ধরে চুলে পাতা কেটে কপালে পরবে আমারই ধরে দেওয়া কাঁচপোকার টিপ।

দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রজাপতি-গুলোর যে কী হয়েছে, এখন আর কারো গায়ে এসে বসে না। দেওয়ালে বসে রঙতামাসা করে।

ইঁদারার পাশে ঝোপগুলোতে সন্ধে হলেই আকাশের তারার মতন ঝিকমিক করবে জোনাকির দল। করবে কি? যদি তাদের দেখার কেউ না থাকে, তাহলেও?

গাড়ির দুলুনিতে ঘুম আসে।

বনকালীতলায় গাঁসুদ্ধ লোক এক পঙ্‌ক্তিতে বসেছি। বছরে একদিন বনভোজন। এই একটা দিন জাতপাত নেই। ইতর ভদ্র নেই। কেন এই একটা দিন সম্বৎসর হয় না?

কামারবাড়ি চুপচাপ। কুমোরপাড়ায় চাক ঘুরছে না। ছুতোরবাড়ি ভোঁ ভাঁ। ঝেঁটিয়ে মেটেরির মেলায় গেছে।

সুদর্শন পোকা দেখো, মা গো! সুদর্শন। যে দেখে তার কপাল ভালো।

ছইতে ঠুকে গেল কপাল।

চোখ তাকিয়ে দেখি দর্শনা স্টেশন। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কে? চেঁচিয়ে ডাকছে—ভুলি! ও ভুলি!

কে আবার? আমার লক্ষ্মীছাড়া মেজোমামা। দেখে মনে হচ্ছে, সকাল থেকেই চড়িয়েছে।

[ক্রমশ

গ্রহান্তর

নির্মলকুমার দাস

তারপর একসময় লক্ষ করলাম, আজ আবার আমার স্বামীর ফিরতে দেরি হচ্ছে। অফিস থেকে ফেরার ও'র মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় আছে, আগে সেটা বরাবর ছিল। এবং যানবাহনের হাজারো সমস্যা সত্ত্বেও সেই সময়ের মধ্যেই উনি ঘরে ফিরতেন। ক্বচিৎ কখনো যে দেরি হত না, এমন নয়। তবে সেরকম দিন আর কটা—হাতে গুনে বলা যায়। এই যেমন অফিসে খুব কাজের চাপ হল, কি অফিসফেরতা কিছু কেনাকাটা করতে গিয়ে দেরি হল, এইরকম। অনেকদিন আগে, তা দেখতে-দেখতে আট-ন মাস তো হবেই, ফিরতে ও'র বেশ রাত হল। তা প্রায় নটা হবে। এরকম দেরি বলতে গেলে একেবারেই হয় না। ফিরতেই, আমি কিছু বলার আগেই উনি খানিকটা বিরক্তভাবেই বললেন, 'আর ওভারটাইম করা যাবে না, বুঝলে।'

বুঝলাম দেরি হবার কারণ—অফিস। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কেন?'

'বলে কিনা আটটা পর্যন্ত ওভারটাইম তো আটটা পর্যন্তই থাকতে হবে। কাজ হয়ে গেলেও।'

বলার ধরনে খানিকটা ছেলেমানুষি ভাব প্রকাশ পেয়েছিল, যেটা দেখে আমি হেসেও ফেলেছিলাম। বলে-ছিলাম, 'বারে, যতক্ষণ ওভারটাইম ততক্ষণ থাকবে না?'

উনি বলেছিলেন, 'আমার যা কাজ তা তো হয়ে গেছে, তবুও থাকতে হবে?'

আসলে কাজটা অন্য একটা সেকশনের। যেটা ওদের করার কথা নয়, সেটাই ওদের সেকশনকে দিয়ে করানোর অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু ছুটির আগেই নিজে-দের কাজ না থাকায়, বলতে গেলে ওরা প্রত্যেকেই ওই কাজটা শুরু করে খানিকটা সময় সংক্ষেপ করেছিল। কাজটা শেষ হয়েছিল, কিন্তু, যেহেতু নির্ধারিত সময়ের আগেই সবাই চলে গিয়েছিল, সেইহেতু অফিসময় একটা হইচই হয়, এবং কর্তৃপক্ষের এগেনস্টে ইউনিয়ন মুভ করে। কিন্তু এরপর কী হয়েছে, সেটা আর আমি জানি না। এবং আমি নিশ্চিত, আমার স্বামীও সঠিক-ভাবে কিছু জানেন না। সেইজন্যে তাঁর বিন্দুমাত্র আফসোসও নেই, আগ্রহও নেই। আসলে উনি হলেন সেই প্রকৃতির মানুষ, যাঁরা সচেতনভাবেই নানান ঝুট-ঝামেলা, সভাসমাবেশ এড়িয়ে চলেন নিরাপদে, অন্যের চক্ষুশূল না হয়ে, বেঁচে থাকবেন বলে।

একদিন, কয়েক বছর আগেকার ঘটনা, আমরা যাদবপুর থেকে ফিরছিলাম বাসে করে। রাত তখন সাড়ে নটা-দশটা হবে। শীতকাল। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই তখন ব্যাপক খুনোখুনি চলছে। বেলেঘাটার ওদিকটায় এসে হঠাৎই কয়েক জনের ত্রাসসঞ্চারকারী চেঁচামেচিতে বাসটা থমকে থেমে গেল। পরে টের পেলাম, জোর করে থামানো হয়েছে বাসটাকে। যারা থামায় তারা কয়েকজন অল্পবয়সী যুবক। এতক্ষণ তারা বাসেই ছিল। কিন্তু তাদের উপস্থিতি এমন ভয়ংকরভাবে আমি কেন, কেউই টের পায় নি। অতি সাধারণ চেহারা যে কী ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রত্যেকের চোখ থেকেই নীলচে আগুন হিশহিশ করে ঠিকরে বের হচ্ছিল। সবাই মিলে ওরা একটা ছেলেকে জোর করে নামাতে চাইছিল বাস থেকে। আর বেচারা ছেলেটি! ব্যাধের ফাঁদে পড়া পাখির মতো বাঁচবার তার সে কী প্রয়াস। সে কী কাকুতি-মিনতি, হাতেপায়ে ধরা, অবশেষে পরিত্রাহি চিৎকার। বাসের অন্যান্য যাত্রীদেরও সে কতই না অনুনয়-বিনয় করল, ওকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে, নাহলে ওর জীবন নাকি বিপন্ন, ওরা নাকি ওকে খুন করবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

'খুন' শব্দটা আমাকে ভীষণ ধাক্কা দিয়েছিল। আমি মনেপ্রাণে চাইছিলাম, সবাই মিলে ছেলেটিকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করুক, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনুক ওকে। চাইছিলাম, আমার স্বামীও এগিয়ে যান। বাসের অতগুলো মানুষ, পারবে না কয়েকজনের হাত থেকে একটা নিরুপায় ছেলেকে বাঁচাতে?

ভীষণ উন্মুখ আর প্রত্যাশী হয়ে আমি একে-একে চেয়েছিলাম সকলের দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কেউ একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না। শুধু তাই নয়, চোখের সামনে এমন একটা ঘটনা ঘটে চলেছে, যে ঘটনার সঙ্গে একটা তরতাজা ছেলের জীবন-মৃত্যু জড়িত, সেটা যেন ওরা কেউ জানেই না। ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে কেউ, বড়ো আশ্চর্যভাবে, চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার ভান করছিল, কেউ জানলা দিয়ে বাইরের থমথমে দৃশ্য দেখছিল, কেউবা কোনো বিষয় নিয়ে পাশের জনের সঙ্গে আলোচনায় এমন মশগুল ছিল, যেন সেটা সেই মুহূর্তে একান্তই জরুরি। বাসভরতি অতগুলো মানুষের সামনে দিয়েই ওরা ছেলেটিকে নামিয়ে নিয়ে চলে গেল। আর তারপর, ওদের হাত থেকে, মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে ছেলেটির সেই হৃদয়বিদারক পরিত্রাহি চিৎকারকে অন্ধকারে চারচাকায় পিশে, থেঁতো করে রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে-দিতে আমাদের বাসটা, যেন বধ্যভূমি থেকে কোনোক্রমে ছাড়া পেয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পাগলের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

ছেলেটি কি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পেরেছিল? জানি না। তবে ওই ঘটনার পর মাঝে-মাঝেই সেই আকুল, আপ্রাণ চিৎকারটা কোত্থেকে, ভেসে এসে আমার কর্ণমূলে এফোঁড় ওফোঁড় করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিত। ঘুম ভেঙে যেতেই টের পেতাম, আমার বুক ধড়ফড় করছে, জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছে, চোখদুটোও কেমন অস্বাভাবিক বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

অন্ধকারে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতাম, কেন সবাই মিলে রুখে দাঁড়াল না। তবে কি সবাই ছেলেটির মৃত্যুকামনাই করেছিল?

কয়েকদিন বাদে আমার স্বামীকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। প্রশ্নটি শুনে উনি আমাকে ও'র সামনে বসতে ইঙ্গিত করেছিলেন। তারপর খুব ধীরে-ধীরে বলেছিলেন, 'ধরো, আমি রুখে দাঁড়ালাম। এটা যে একটা ভীষণ অন্যায় করা হচ্ছে, সেটা বেশ জোরের সঙ্গে ওদের বললাম। তারপর গায়ের জোর খাটিয়ে ওদের হাত থেকে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারপর,—বলে উত্তরের জন্যে উনি আমার দিকে চেয়েছিলেন। কী উত্তর দেব আমি তা ভাবছিলাম, কিন্তু উনি আর অপেক্ষা না করেই বললেন, 'তোমার কি ধারণা আমার কথা শুনেই ওরা ওকে ছেড়ে দিয়ে বাস থেকে নেমে যেত, নাকি আমাকেই ওরা অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিত? চিনু, তুমি লক্ষ করেছ কিনা জানি না, ওদের প্রত্যেকের কাছেই ছুরি ছিল, চাই কি রিভলভার থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। ওরা আমাকেও কিন্তু ছেলেটির সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে যেত।'

এই হলেন গিয়ে আমার স্বামী। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন না শুধু নয়, অনেক দূরে থেকে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেন, পাছে নিজের বা নিজের ফ্যামিলির কোনো ক্ষতি হয়। এই মানুষটিকে নিয়ে আমার কোনোদিনই

কোনোরকম দুশ্চিন্তা ছিল না। জানতাম, যাই ঘটুক না কেন, উনি ঠিক সুস্থভাবেই বাড়ি ফিরবেন, হয়তো দেরিতে। অথচ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনার পর থেকেই সমস্ত হিসেবনিকেশ কেমন যেন উলটে গেল। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম আমরা। মানে আমি, আমার স্বামী আর আমাদের মেয়ে তরু। ঘটনাটির কেন্দ্রবিন্দু আমার স্বামী। কিন্তু, যেহেতু তাঁরই ছত্রছায়ায় আমরা, সেইহেতু তাঁর ভালোমন্দের সঙ্গে আমাদেরও ভালোমন্দ ভীষণভাবে জড়িত। যদি তাঁর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে, আমরাও নিশ্চিতভাবে তলিয়ে যাব সেই অন্ধকারে, গিয়েওছিলাম। ওঃ, সে এক দিন গেছে আমাদের। ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, অমন বিপদ যেন অতি বড়ো শত্রুরও না হয়।

তবু তো সেই অন্ধকার থেকে আমরা আবার আলোয় ফিরতে পারলাম, মানে আমার স্বামী পারলেন। কিন্তু লক্ষ করতে লাগলাম, চোখের সামনেই মানুষটি কেমন অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝেই উদাস, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। ভাবনার কোন অতলে তলিয়ে যান। হয়তো আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন, আমি একটু হাসলাম। কিন্তু সেই হাসির কোনো জবাব এল না। সঙ্গে-সঙ্গেই আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন তোলপাড় করে উঠত—উনি আমার হাসিটা দেখতে পেয়েছেন তো? আমি চেয়েই থাকতাম ও'র দিকে। অনেকক্ষণ পর দৃষ্টি সরিয়ে হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বুঝলাম, কিছু একটা ভাবছিলেন, এবং সেটা যে ও'র ভাগ্যবিপর্যয়কে কেন্দ্র করেই—কে যেন কড়া নাড়ল? উনি কি ফিরলেন?

—না। দরোজাটা কোঁপে অমন কড়ানাড়ার মতো শব্দ হল। আমাদের বাড়িটা রেললাইনের ধারে, ফলে ট্রেন-চলাচলের সঙ্গে ঘরবাড়িও কোঁপে ওঠে, বুক কোঁপে ওঠে।

এখন রাত আটটা। দেখতে-দেখতে রাত বেড়ে গেল, কখন ফিরবেন উনি? এত দেরিই বা হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই আজ আবার কোথাও গেছেন। কোথায়? কয়েক সপ্তাহ আগে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলেন, তা প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ। ফিরতেই ও'র কাছে প্রায় ছুটে গিয়েছিলাম। আসলে আশংকা হচ্ছিল, আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটল কিনা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তেমন কিছু নজরে পড়ল না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এত রাত হল?'

উনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলাম।'

শুনে আমি আর তরু মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিলাম, 'গঙ্গার ঘাটে?'

'হ্যাঁ।'

'বিকেল থেকে অতটা সময় ওখানে ছিলে?'

উনি তক্তপোশের ওপর বসে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। অফিস ছুটির পর হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেলাম। একটা ভাঙা বেনচিতে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। ভাঙা বলেই খালি ছিল। তারপর একসময় দেখি ঘড়িতে অনেক বেজে গেছে।'

কথাগুলো শুনে আমার খুব অবাক লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'অতক্ষণ ওখানে বসে কী করছিলে?'

'জল দেখছিলাম।'

'জল দেখছিলে?'

উনি ম্লান হেসে বলেছিলেন, 'কেন, তোমার কি এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি দেখতে পাই।'

কথাটা উনি মাঝে-মাঝেই বলতেন, এখনও বলেন। বলার সংগত কারণ আছে। প্রথম দিকে সত্যিই আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে, উনি দেখতে পান। অন্যের চোখ দিয়ে দেখা—এও কি সম্ভব? অন্যের চোখ চোখে বসিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়, এটা শুনেছিলাম। কিন্তু তেমন কাউকে তো দেখি নি। অবশেষে দেখলাম, ভীষণভাবে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা, বা আমাদের জীবনে নেমে আসা এক অভিশাপের মধ্যে দিয়ে দেখলাম। মনে আছে, জলপাইগুড়িতে আমাকে বাপের বাড়িতে রেখে বাসে করে ফেরার সময় ডাকাতদের বোমার আক্রমণ আর আঘাতে দুটি চোখ হারিয়ে যেদিন উনি আই ব্যাংক থেকে অন্যের চোখ বসিয়ে বাড়ি ফিরলেন, আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। বিশ্বাসই করতে পারি নি। ওই ঘটনার পর খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম আমি। মানসিক দিক থেকে যতটা আঘাত উনি পেয়েছিলেন, আমার আঘাত পাওয়াটাও তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। চোখ থেকেও এই পৃথিবীর যা কিছু রঙিন, সেসব কিছুই আমার চোখে কালো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। কয়েক দিন পর উনি ফিরলেন হাসপাতাল থেকে নতুন চোখ বসিয়ে। সত্যিই কি নতুন চোখ, নাকি পাথর? তখন ভেবেছিলাম। চরম অবিশ্বাস আর কৌতূহলে দু-একদিন

বাদে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই দেখতে পাচ্ছ?'

'কে বলল পাচ্ছি না। ওই তো তোমার বাঁ গালে একটা তিল, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'ধ্যাত, এটা তো তুমি জান।'

'তবে জানি না এমন কিছু দিয়ে পরীক্ষা নাও। দেখো দেখতে পাচ্ছি কিনা।'

দিন যত যেতে লাগল, আমার অবিশ্বাসের ভাবটা কেটে গিয়ে আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু লক্ষ করতাম, আমার স্বামী আগের তুলনায় ভীষণ বদলে যাচ্ছেন। দীর্ঘ সময় ধরে একই দিকে চেয়ে আছেন হয়তো, কিংবা চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে কিছু ভাবছেন—যা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। জানি, একেকটি ঘটনা মানুষের জীবনকে ভেঙেচুরে, দুমড়ে মুচড়ে একেবারে নতুন এক ছাঁচে ফেলে দেয়, আগের সঙ্গে কোনো-কিছুতেই আর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু, আমার স্বামীকে দেখলে আমার কেমন যেন মনে হত, আমি একেবারে নতুন এক মানুষের সঙ্গে আবার নতুন জীবন শুরু করেছি। যেন নিজেকে আবার নতুন করে গড়তে হবে। ঠিক যেমন বিয়ের পরে-পরে মনে হয়েছিল, ঠিক তেমনই আবার একজন মানুষের চালচলন, ব্যবহার, মানসিকতা ইত্যাদির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হতে লাগলাম, ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। অবশ্য এইরকম একটা পরিস্থিতির জন্যে যে শুধু আমার স্বামীর পরিবর্তিত মানসিকতা বা ধরনধারনই একমাত্র দায়ী, অর্থাৎ এটাই যে একমাত্র কারণ—তা নয়। চেনা মানুষকে এই যে নতুন করে চেনা, এর জন্যে আমার মানসিকতাও কাজ করেছে। অপারেশন করিয়ে নতুন চোখ বসিয়ে বাড়ি ফেরার পর আমি হয়তো কখনও-কখনও ও'র দিকে চেয়ে আছি, উনিও চেয়ে আছেন আমার দিকে, হঠাৎ-ই সচকিত হয়ে চোখ সরিয়ে নিতাম আমি। আমার কেমন যেন মনে হত, অন্য একজন মানুষের চোখের দিকে চেয়ে আছি আমি। ভারি লজ্জা করত। এটা যে শুধু ও'রই সামনে হত, তা নয়, আড়ালেও এমন বহুবার হয়েছে। নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পেতাম। যদিও মনকে বোঝাতাম, চোখ অন্য মানুষের হলেও উনি তো আমার স্বামী। তবু কোথায় যেন, চেতনে-অবচেতনে একটি সংকোচের কাঁটা বিঁধে থাকত প্রথম-প্রথম। অনেক সময় লাগল এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। আবার অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম, অবস্থার সঙ্গে আবার নিজেকে মিশিয়ে দিলাম। মাঝে-মাঝে, হঠাৎ-হঠাৎ, সংকোচের সেই কাঁটাটি তীব্রভাবে নিজের অস্তিত্বের জানান দিলেও অধিকাংশ সময়ই মনে থাকত না, বা মনে আসত না যে, আমার স্বামী অন্যের চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখছেন। আমি আবার আমার আগের মানসিকতায় ফিরে গেলেও, আমার স্বামী কিন্তু একেবারে স্থায়িভাবেই বদলে গেলেন। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করলেও, মাঝে-মাঝেই উনি গুম হয়ে কী-সব যেন ভাবেন, জানলার সামনে বসে দূরে, অনেক দূরে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন তো চেয়েই থাকেন।

জানি, নিজের ভাগ্যবিপর্যয় নিয়েই এত সব ভাবনা। কেননা প্রথম দিকে উনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন, 'আচ্ছা চিনু, আমি তো কোনো ঝুটঝামেলায় নেই, তবু আমার এমন হল কেন বলো তো?'

তবু মাঝে-মাঝে খুব কৌতূহল হত। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কী এত ভাব বলো তো?'

সঙ্গে তরু-ও ছিল। ও-ও বলেছিল, 'হ্যাঁ গো বাবা, তুমি এত সব কী ভাব?'

ক্লাশ এইটে পড়ে মেয়েটা। কতই বা বয়েস। তবু সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছে ও, জেনে গেছে ঘটনাটির গুরুত্ব কতখানি।

আমাদের দুজনের প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছিলেন, 'কই, কিছু না তো।'

কিছুই কি না? আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর প্রশ্ন করি নি। হয়তো কথায়-কথায় ওই ঘটনাটিই আবার এসে পড়বে, মনে-মনে কষ্ট পাবেন উনি, ভয়ানকভাবে ভেঙে পড়বেন। কিন্তু আমার কৌতূহল মাঝে-মাঝেই আমাকে তীব্রভাবে খুঁচিয়ে তুলতে লাগল। ইচ্ছে হল একদিন—কিন্তু না। উনি নিজেই বললেন।

তখন অনেক রাত। তরু পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা তখনও জেগে। এই জেগে-থাকাটা ইচ্ছাকৃত নয়। আসলে আমাদের ঘুম, শুধু ঘুমই নয়, আমাদের খিদে, আমাদের ইচ্ছে, কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া—সবকিছুই ওই ঘটনার পর থেকে একে-একে

কমে এসেছিল। কেউ কোনো কথা বলছিলাম না অনেকক্ষণ, তবু দুজনেই দুজনের জাগ্রত ভাবটা টের পাচ্ছিলাম। এক সময় উনি বললেন, 'মাঝে-মাঝে নিজেকে বড়ো ছোটো মনে হয়, চিনু।'

শুনে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। একথার প্রাসঙ্গিকতা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে, বিফল হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কেন?'

উনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো উত্তর দিলেন না, চুপ করে রইলেন। ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ। ও'র বুকের ভিতরে যে একটা ভয়ংকর রকমের তোলপাড় হয়ে চলেছে, তার শব্দ যেন আমি ওই নিস্তব্ধতার মধ্যে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, অনেকদিনের জমানো এমন কিছু, যা অত্যন্ত সঙ্গোপনে ও'র মানসিকতাকে নাড়া দিয়ে চলেছে, ও'কে প্রবলভাবে ভাবাচ্ছে, এমন কিছুই উনি আমার কাছে প্রকাশ করতে চলেছেন।

'তুমি জান, আমার চোখে কার চোখ বসানো হয়েছে?'

বুকটা কী জানি কেন, ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল। খুব অবাক হয়ে, আগ্রহের সঙ্গে বলেছিলাম, 'না।'

উনি বলেছিলেন, 'ভদ্রলোকের নাম বিভূতি দত্ত।'

'কে তিনি? নামকরা কেউ?'

'সেই অর্থে নামকরা কেউ নন। ভদ্রলোক ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী।'

'তাই নাকি?' কৌতূহলে উঠে, আমি টানটান হয়ে বসলাম।

উনি বলেছিলেন, 'ভদ্রলোক অল্পবয়েসে একজন সাহেব খুন করেছিলেন। তবে উনি কিন্তু খুনী নন। উনি একজন বীর। সারাটা জীবন স্বাধীনতার জন্যে, মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করে গেছেন। স্বাধীনতার পরও থেমে থাকেন নি। কেননা দেশভাগ করে এই স্বাধীনতাকে উনি মনেপ্রাণে কখনোই মেনে নিতে পারেন নি। এটা যে একটা ভীষণ অন্যায় করা হয়েছে, অবিচার করা হয়েছে, এতে যে সাধারণ মানুষদের ঠকানো হয়েছে—এটা উনি জোর গলায় বলতেন। ভীষণ খেপে উঠতেন উনি, যখন দেখতেন একসময়কার তাঁরই সহযোদ্ধারা পরে পেনশন নিচ্ছেন, কি সরকারি হোসে দিন কাটাচ্ছেন। এসব উনি কিছুই নেন নি। যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের উনি বলতেন—আপনারা এসব নিচ্ছেন মানে আপনারা এই স্বাধীনতাকে মেনে নিয়েছেন। সত্যি করে বলুন তো, এইটুকু পাওয়ার জন্যেই কি আপনারা জীবনপণ সংগ্রামে নেমেছিলেন? চিনু, বিভূতিবাবুর জীবনে একটা উদ্দেশ্য ছিল, একটা ব্রত ছিল, আদর্শ ছিল। অথচ—'

ভীষণ অবাক হয়েছিলাম আমি একজন আদর্শবান নির্লোভ যোদ্ধার উদাহরণ সামনে রেখে নিজেকে এমন-ভাবে বিশ্লেষণ করতে দেখে ও'কে। কৌতূহলও হল খুব। ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে আলো জ্বালাতে, কিন্তু জ্বাললাম না।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি এত সব জানলে কী করে?'

'আসলে আমার ভীষণ কৌতূহল হত চিনু, ভীষণ জানতে ইচ্ছে করত যে যার চোখ দিয়ে আমি আবার পৃথিবীটাকে দেখছি, দেখতে পারছি, সেই চোখ কার। জানলাম তিনি একজন ফ্রীডম-ফাইটার। এটা জানতে পেরেই কেমন যেন একটা প্রচণ্ড নাড়া খেলাম, চিনু। ভদ্রলোক সম্পর্কে ভীষণ জানতে ইচ্ছে হল। ঠিকানা যোগাড় করে চলে গেলাম উনি যেখানে থাকতেন, সেখানে। বিয়ে করেন নি। ভাইপোদের কাছে থাকতেন। তাদেরই একজনের কাছে জানলাম যে তাদের জ্যাঠামশাই দক্ষিণ চব্বিশপরগনার কালিকাপুর বলে একটা জায়গায় প্রায়ই যেতেন। ওখানে বিপ্লবীদের একটা হোস আছে, পুরনো বন্ধুবান্ধব থাকে সেখানে। এটা শোনার পর আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। ঠিক করলাম একদিন যাব ওখানে।'

'গেলে?'

'হ্যাঁ। একদিন নয়, বেশ কয়েক বার। প্রথম দিন যাবার কোনো ঠিকই ছিল না। রোজ যেমন অফিস যাই, তেমনই বাড়ি থেকে বের হলাম। কিন্তু শিয়ালদার কাছে যেতেই সবকিছু কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। নেমে পড়লাম বাস থেকে। সাউথ সেকশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলাম। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমি। যেন কেউ অদৃশ্যভাবে আমাকে ঠেলতে-ঠেলতে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। কে বলো তো?'

আমি কোনো সদুত্তর দিতে পারি নি। বরং প্রশ্নটি নিয়ে আমিই একটা উত্তর খুঁজে বেরিয়েছিলাম। যে

মানুষটি এত নির্বিকার, তার জীবনে হঠাৎ এজাতীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করল কেন?

উনি আবার বলতে শুরু করেছিলেন, 'প্রথম যেদিন আমি ওইসব বিপ্লবীদের কাছে গেলাম, গিয়ে আমার অপারেশন, ওখানে যাবার উদ্দেশ্যে ইত্যাদি সব বললাম, ওঁরা তো আমাকে ঘিরে বসে আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কেউ কেউ বললেন—বিভূতিবাবু তাহলে মারা যান নি। কী বিভূতিবাবু? ভালো তো। আমারও খুব অবাক লাগল চিনু, ওঁরা কার দিকে তাকিয়ে আছেন? আমার দিকে, নাকি বিভূতিবাবুর দিকে?' প্রশ্নটা নিয়ে আমিও তো খুব ভাবি। কার দিকে চেয়ে থাকি আমি। কার চোখে চোখ রেখে নিজেকে সমর্পণ করি। এই ভাবনাটিই আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, পিছিয়ে যাই, নিজেকে আর আগের মতো ছেড়ে দিতে পারি না যেন। আবার পরক্ষণেই ওঁর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ভীষণ কষ্ট পাই।

অনেকক্ষণ পর উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা চিনু, বিভূতিবাবু নিজের চোখদুটো আইব্যাঙ্কে দান করে গেছেন কেন বলো তো?'

'কেন আবার, অন্যের উপকারে লাগবে বলে।'

শুনে উনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'হয়তো। তবে আমার মনে হয়, এ ছাড়া অন্য একটা কারণও থাকতে পারে।'

কী সেটা, তা জানার জন্যে ভীষণ ব্যগ্র হয়ে আমি অন্ধকারেই ওঁর দিকে চেয়ে ছিলাম।

উনি বলেছিলেন, 'আসলে বিভূতিবাবুর দেখার চোখ ছিল। অতি সহজেই উনি অত্যাচার, অনাচার, বঞ্চনা, নোংরামি অর্থাৎ মানুষের কাছে যা-যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক, সেসব উনি দেখতে পারতেন, যেসব অধিকাংশ মানুষই দেখতে পায় না। কিন্তু উনি পারতেন। শুধু তাই নয়, কিভাবে সবকিছু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তার পথও তিনি খুঁজতেন। উনি চেয়েছিলেন ওঁরই মতো অন্যেরাও দেখতে শিখুক। তাই উনি নিজের চোখ দুটো দান করে গেছেন, যাতে ওঁর চোখ দিয়ে অন্তত কেউ একজন পৃথিবীটাকে দেখতে পায়।'

শেষের দিকে ওঁর কথা বলার গতি বেশ কমে আসছিল, একেকটি শব্দ ভীষণ ভারি হয়ে উঠছিল। এবং আমার মনে হয়েছিল, কঠিন-কঠিন ওইসব জলদগম্ভীর শব্দগুলো যেন ওঁর নাভিমুখ থেকে উঠে আসছিল সবকিছু ভেঙেচুরে ওলটপালট করে দিতে-দিতে। ওই কথাগুলোকে আমার মনগড়া মনে হলেও নিশ্চিতভাবে উড়িয়ে দিতে পারি নি। বিশেষত যখন দেখলাম কয়েক দিনের মধ্যেই উনি আমারই চোখের সামনে বদলে যাচ্ছেন, এক থেকে অন্য-এক মানুষে উনি রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন অতি দ্রুত।

মাঝখানে একটি দুর্ঘটনায় দুটি চোখ হারানো, আবার অপারেশন করে নতুন চোখ বসিয়ে ঘরে ফেরা—এরই আগে-পরে একজন মানুষের মানসিকতার যে কী আমূল পরিবর্তন হতে পারে, সে আমি ছাড়া বুঝবে কে!

এরই মধ্যে একদিন সকালবেলায় চা খেতে-খেতে কাগজ পড়ার সময় হঠাৎ-ই 'চিনু চিনু' বলে ডাকতে শুরু করলেন। গলার স্বর স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা উত্তেজিত, এবং উচ্চগ্রামে ছিল। আমি রান্নাঘর থেকে প্রায় ছুটে এঘরে এলাম, পিছন পিছনে তরু। মেয়েকে দেখেই উনি বললেন, 'তুই পড়া ছেড়ে উঠে এলি কেন? যা—।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একরাশ কৌতূহল নিয়ে মেয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। উনি আমাকে কাছে ডেকে, হাত ধরে বসিয়ে কাগজের একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এই জায়গাটা পড়ো।'

একটি কিশোরী মেয়েকে তিনজন মিলে রেপ করেছে, তারপর খুন। ঘটনা পড়তে-পড়তেই বুকের ভিতরটা আমার কেঁপে উঠেছিল। তরুর মুখটা অনিবার্যভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। নিঃশব্দে পড়া শেষ করে আমি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, 'মানুষ দিনকে-দিন পশুরও অধম হয়ে যাচ্ছে চিনু। কেন বলো তো?' ভীষণ যন্ত্রণাময় ছিল প্রশ্নটি।

প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ঘটনাটি ওঁর মনে। মাঝে-মাঝেই প্রসঙ্গটি তুলতেন, ভাবতেন, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আমাকে একদিন বলেই ফেললেন, 'যদি কোনোদিন ওরকম ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটে, তাহলে তুমি দেখে নিও, চিনু, আমি কী করি।'

দারুণ ভয় পেয়েছিলাম কথাটা শুনে। বলেছিলাম, 'তোমার ভয় করে না এসব ভাবতে।'

'যদি চোখের সামনে তরুকেই ওরকম কেউ করে, চিনু, আমি কি ভয় বুকে নিয়ে বসে থাকব?'

সেদিন থেকেই মানুষটাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। দেরি দেখলেই এমন সব আশঙ্কার কথা, বিপদের কথা মনে ভিড় করে জমতে শুরু করে, যা কোনোদিনই আমাদের জীবনের একটা সময়ে সম্ভব ছিল না।

তরু-ও নেই, যে একটু কথা বলব, কি রাস্তায় পাঠাব। সেই যে মেয়ে জলপাইগুড়িতে মামার বাড়ি গেছে—

বাইরে একটা ট্যাকসি থামল না?

দৌড়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, হ্যাঁ ট্যাকসিই। উনি নামছেন। ট্যাকসি কেন?

জানলা থেকে ঝটিতি সরে এসে দরোজা খুললাম। দরোজার সামনেই উনি দাঁড়িয়ে। সাদা জামায় রক্তের দাগ। প্রায় লালই হয়ে গেছে জামাটা। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি হকচকিত, সমস্ত গুলিয়ে গেছে। ভীষণ অবশ হয়ে আসছে আমার সারা শরীর, আমার শিরা উপশিরা, আমার চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা। যেন কোন চোরাপথে হু হু করে আমার শরীরের সব রক্ত নির্গত হয়ে যাচ্ছে। এ কী দেখছি আমি—দুঃস্বপ্ন?

যন্ত্রচালিতের মতো একসময় আমি পাশ ফিরে সরে দাঁড়ালাম, উনি ঘরে ঢুকলেন, পিছনে-পিছনে আমিও। তক্তপোশের ওপর উনি বসলেন। কিছুক্ষণ নির্বাক চেয়ে থাকার পর ওঁর জামার বোতাম খুলে দিতে-দিতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী করে হল এসব? অ্যাকসিডেন্ট?' বলে উত্তরের আশায় উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকলাম। উনি নিরুত্তর, যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর এক সময়, বহুদূরের স্তম্ভিত অন্ধকার ফুঁড়ে আলোকবিন্দু ফুটে ওঠার মতো, উনি ব্যথিত, ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, 'ওরা আমাকে মারল চিনু।' যেন বুকের ভিতরে আমার হাতুড়ির ঘা পড়ল, 'কারা?'

প্রথমে আস্তে, তারপর উত্তেজিত হতে-হতে উনি বলতে লাগলেন, 'অফিস থেকে বেরিয়ে গঙ্গার, ঘাটে গেলাম। তারপর, দূরে হাওড়া ব্রিজটা দেখে হাঁটতে-হাঁটতে একসময় ওদিকে চলে গেলাম। ইচ্ছে হল প্ল্যাটফরমে ঢুকে দূরপাল্লার ট্রেনগুলো একটু দেখি। তাই প্ল্যাটফরম টিকিট কাটতে গেলাম। ওখানে যেতেই কতগুলো মহিলা, যারা স্টেশনে থাকে, আমাকে ছেঁকে ধরে বলল ওদের কাছ থেকে কমদামে টিকিট কাটতে। ওদের প্রত্যেকেরই হাতে গোছা-গোছা প্ল্যাটফরম টিকিট। রেলপুলিশের সামনে, চেকারের সামনে, কাউনটারের সামনে ওপনলি বিক্রি করছে। কোথায় পাচ্ছে ওরা টিকিটগুলো? আসলে যে টিকিটগুলো জমা পড়ছে, সেগুলোই চলে আসছে এদের হাতে বিক্রির জন্যে। মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল আমার। খপ করে একজনের হাত চেপে ধরে বললাম—'এত টিকিট কোথায় পেলেন? কেন বে-আইনি কাজ করছেন?'

'তারপর?'

'চিনু, ওই মহিলাটি তখন কী করল জান? মনে হল, কাছাকাছি চেনাশোনা লোকেদের ইশারা করে ও চেঁচিয়ে বলল—এই লোকটা আমার গায়ে হাত দিয়েছে গো। বলতেই কারা যেন ছুটে এল হুড়মুড় করে, তারপর—'

লক্ষ করলাম, শারীরিক যন্ত্রণায় উনি ভিতরে-ভিতরে কষ্ট পাচ্ছেন খুব।

'স্টেশনের এক পুলিশকে বললাম ঘটনাটা। সে হেসে চলে গেল। সে কী বীভৎস হাসি, চিনু। দূর থেকে দেখলাম, কাউনটারের সামনে সেই একই ঘটনা ঘটে চলেছে। একটু আগেই যে ওখানে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, সেটা কেউই জানে না। জানলেও কারোরই ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন, যা ঘটছে, ঘটে চলেছে, এটাই নিয়ম, এটাই রীতি। একটা চেন সিস্টেমে আমরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছি, চিনু। আমরা জানিই না কখন কিভাবে এক মারাত্মক অন্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি। আচ্ছা চিনু, এই যে বুক ফুলিয়ে চুরি করা, রেপ করা, খুন করা—এসবের জন্যেই কি স্বাধীনতা? আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি চিনু?'

এই কঠিন প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি দিতে পারলাম না। শুধু চেয়ে থাকলাম ওঁর চোখের দিকে, যে চোখ ওঁর নিজস্ব চোখ নয়, অথচ, এখন ভীষণভাবেই নিজস্ব।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

মাস দেড়েক দেশি নৌকায় মাছ ধরে সুজা। এই নৌকাগুলো সমুদ্রের ভেতর যেতে পারে না। মৌসুম বলেই খ্যাপ ছাড়ে না তোরাব আলী। কামট, লংকা, কাইললংকা, কোরাল, দাঁতিনা প্রচুর ধরে দিয়েছে শুটকির জন্যে। প্রতিদিন মনকে-মন মাছ শুটকি দিচ্ছে সালেক। বদরমোকাম এখন শুটকির গন্ধে ভুরভুর। ঝোলানো মাছের সারি দূর থেকে মালার মতো মনে হয়। যেন কেউ বদরমোকামকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। তোরাব আলী পরিতৃপ্ত। এবার শুটকির ব্যাবসা জমজমাট। সালেক এ ব্যাপারে দক্ষ, একটা মাছও নষ্ট হয় নি।

এবার ট্রলারে গভীর সমুদ্রে যাবে ওরা। যাত্রার আয়োজন চলছে। দেশি নৌকার কাজ শেষ। যাবার আগের দিন আবার মিলিত হয় ওরা। এবার বদরমোকামে, যেখানে নারকেলের সারি সাগরের পানি ছুঁয়েছে। সুজা বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। রজব গলা-খাঁকারি দেয়—আপনে ঠিক ন আছেন, সুজাভাই?

ও মৃদু হাসে।

—কামর সমত ট্যার পাইবা। তোরা তো জোয়ান, শরীলত বল আছে। আঁর হাড্ডি তো ঘাস উডনর সময় হইয়ে।

সুজার দৃঢ়প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর ওদের আশ্বস্ত করে। ও এখন একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নের আশ্রয়স্থল।

—মানিক বেশি ফাল মারের। ক-র এইবার মৌসুম ভালা, লাখ টেঁয়ার মাছ পন যাইব।

—শালায় একডা আস্ত হারামজাদা।

তাহের দাঁত কিড়মিড় করে। সুজার দৃষ্টি ধূসর হয়ে যায়। দেখতে পায়, একটি মানুষ ওর চোখের সামনে আস্তে-আস্তে বিন্দু হয়ে টুপ করে পানিতে ঝরে পড়ে। সাগরের পানি কী অসীম নীল! সুজার হাসি পায়, বুকের মধ্যে স্বপ্ন ঘনিয়ে ওঠে। নীল পানি দেখে তো পেট ভরে না। পেট না ভরলে মগজ হাঙরের দাঁতের মতো তীক্ষ্ণ হয়, এবং যে-কোনো জিনিস অবলীলায় কেটে টুকরো করে ফেলার কৌশল আবিষ্কার করে। সে জিনিস মানুষের জীবনই হোক বা নাইলনের জালই হোক—অসুবিধা নেই। সুজা এখন শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে, ফেরার রাস্তা বন্ধ। ওর মগজে কেবলই কাটার পরিকল্পনা।

বাদল চুপচাপ বসে আছে। অভাবের সংসার। বাপ নেই, মা আর ছয় ভাই-বোনের দায়িত্ব ওর কাঁধে। সুজার দৃষ্টি ওর মুখের ওপর গিয়ে পড়ে। নিরীহ, গোবেচারা, সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারে না। কখনো জ্বলে ওঠে, বেশির-ভাগ সময়ই নিভে ছাই হয়ে থাকে। ও সবকিছুতে ভয় পায়। ঝুঁকি নেবার সাহস কম। সুজার ধারণা, ও হয়তো শেষ মুহূর্তে সবকিছু ফাঁস করে দিতে পারে। সুজার চোখে চোখ পড়লে বাদল বিব্রত বোধ করে।

—কী রে, কথা ন ক-র ক্যা?

—বাড়িত মা-র বহুত অসুক, মন ভালা নাই।

—কী হইয়ে?

—কইত ন পারি। বহুত কিছু। ন বাঁচিব মা।

—ওষুধ ন দ-স?

—ভাত ন জুটে, আবার ওষুধও!

বাদলের চিকন কণ্ঠস্বরের ঠান্ডা কথা সবার বুক স্পর্শ করে। সুজা আর-একটা বিড়ি ধরায়। দূরে সালেক শুটকি উলটেপালটে দিচ্ছে। কড়া রোদে চারদিক ঝক-ঝকে। এখানে মানিক নেই। ওকে বাদলের কথা শুনতে হয় নি। অবশ্য শুনলেই বা কী? মানিক কখনোই ওদের লোক না। একটা শাদা গাঙচিল মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দেয়। জোয়ার আসছে, ওদের আর এখানে বসে থাকা চলবে না। ওরা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

—কাল্লয়া আঁরা সাগরত যাইয়াম।

—ইতার ভিতর মা যদি মরি যায়?

বাদলের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। আঠারো বছর বয়সে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ও ভীরু এবং অসহায়। ওর মাথার ওপর কেউ নেই যে ওকে বটের মতো ছায়া দেবে। বাদল চোখ মুছলে সুজা ওর কাঁধে হাত রাখে।

—ন কান্দিস। আঁরা সাগরত্‌ন ফিরি আইলে চিকিসস্যার লাই তোর মারে কক্সবাজার লই যাইয়াম।

বাদল মাথা নাড়ে। রজব, তাহের লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। বাদল পেছন থেকে সুজার হাত টেনে ধরে—কামউয়া কি ভালা অইব?

সুজা ওর কাঁধ খামচে ধরে—পিছর ক্যা? ডর লাগে না?

হ। বাদল ঢোক গিলে বলে।

—মুখ খুলিবি তো গাপ্পত ভাসাই দি আইস্যম। ডাঙার চেহারা আর দেখিত ন পাবি।

বাদলের চোখ ছলছল করে। তাহের, রজব নৌকা থেকে চিৎকার করে—অ সুজা ভাই, কী হইয়ে? ন আইয়ান ক্যা?

সুজা বাদলের হাত ধরে টানে—নৌকাত উঠ্‌, পিছাইবি তো মরিবি।

বাদল নৌকায় ওঠে, কিন্তু বুক কাঁপে। কাউকে কিছু বলতে পারে না। ঝুঁকি নিতে সাহস হয় না—মার মুখ ভেসে ওঠে। শাহপরি দ্বীপটা কেমন এলো-মেলো হয়ে যায়। যেন এই দ্বীপে ওর জন্মের কোনো চিহ্ন নেই। ও বোঝে না কেন এমন হয়। ভাত নেই, কাপড় নেই, শরীরে পুষ্টি নেই, তাগদ কম—তবু তো ছিনিয়ে নেবার কথা ভাবতে পারে না। যা আছে তার মধ্যে মাথা গুঁজে মুখ থুবড়ে থাকতেই ইচ্ছে। এইভাবে দলেমচে পচে যাবে, তবু রুখবে না। বাদলের মতো আরো অনেকেই আছে যারা রোখার কথা ভাবতে পারে না। ভাবলে সবকিছু একটু অন্যরকম হত। জেলে-পাড়ার জালে রুপালি মাছের ঝাঁক আটকে থাকত, শুটকিতে ভরে উঠত ঘর। ধুলোমাখা ছেলেমেয়েগুলো ছটফটে হাসিখুশি হয়ে বেড়ে উঠত।

সুজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়লে ও অন্য দিকে মুখ ঘোরায়। কয়দিন ধরে সুজা কেবলই ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শাহপরি দ্বীপের মাটিও সুজা কোনোদিন এমন করে জরিপ করে নি। এখন বাদলের মুখের রেখা বদলাচ্ছে, রঙ কালো হচ্ছে, উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে। ও দ্রুত একটা অনুর্বর ভূমি হবে, এবং সেই কারণেই ও ভয়াবহ। ও যে-কোনো ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। তবু ওকে সঙ্গে নেওয়াই উচিত। সুজা তাই ভাবল। কাছে থাকলে ওর সাহস কম থাকবে, নইলে ও দপ করে জ্বলে উঠতে পারে। বাদল ঘাড় গুঁজে বসে থাকে, ওর বসার ভঙ্গিটাই এমন—নিষ্ক্রিয় এবং অথর্ব ঢঙ।

বদরমোকাম ছাড়িয়ে ওরা এখন নাফে ঢুকেছে। সকলেই নীরব। সুজা বাদলের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি এখন দূরে ফেলেছে—মুন্ডা শহরের ওপর। মাঝে-মাঝে ও এমন হয়, নিজের থেকে দূরে সরে যায়। ট্রলার এসে ভিড়েছে, গাঙচিলের বেশ ভিড়, সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের হইচই। সুজা দৃষ্টি ঘোরায়। বাদল এখন ডাঙার দিকে তাকিয়ে আছে—লোলুপ দৃষ্টি। সুজা জানে, ও

সাগরের চাইতে ডাঙা বেশি ভালোবাসে। নৌকা ভিড়লে ওরা লাফ দিয়ে নামে। রজব নৌকা নিয়ে আবার কোথায় যায়। সারা দিন ঘোরাঘুরি ওর অভ্যাস।

ঘরে ফিরে সুজা কাঞ্চনের পাশে এসে বসে। কাঞ্চন পাট দিয়ে শিকা তৈরি করছিল। ওর কাজ থেমে যায়। সুজার মুখের দিকে তাকায়—বুকটা কেমন করে। সারা দিন পরিশ্রম করেও লোকটা কিছু করতে পারে না।

—কালুয়া আঁরার য-ন ঠিক আছে।

সুজা হাত-পা ছড়িয়ে দেয়। কাঞ্চন শিকার বিনুনি শুরু করে আবার। এই কাজটা ও সুন্দর করে। হোগলার পাটি, তালের পাখা, পাটের শিকা অনেকেই কাঞ্চনের কাছে বানাতে দেয়। ওর যাত্রার খবরে কাঞ্চন কোনো অনুভূতি প্রকাশ না করায় সুজা আহত হয়। কাঞ্চন তো জানে না এ যাত্রা ওর গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা, জীবনবদলের যাত্রা।

—কিছু ন কইলা যে?

কাঞ্চন অবাক হয়। কীই বা বলার আছে। সুজা তো এমন হামেশাই যায়। বরং যাওয়া নয়, সুজার ফিরে আসার জন্যেই ও উন্মুখ থাকে।

—অহি আর কী কইয়াম? কাঞ্চন অকারণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, তারপর আবার কাজে মন দেয়।

সুজা ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। হাতে কাজ না থাকলে শুয়ে থাকাটা ওর প্রিয় অভ্যাস। বিদেশী ট্রলারগুলো চুরি করে ওদের সাগরসীমানায় ঢুকে পড়ে মাছ ধরে। ওরা ওদের কাছ থেকেও মাছ চায়। এত দিন সুজা কখনো সায় দেয় নি, এবার দেবে। দরকার হলে মানিকের সঙ্গে যুদ্ধ—হয় ও মরবে, নইলে মানিক। লড়াইয়ের এমন একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে সুজা অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ওর সব সময় এমন হয়। সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে চিত্ত শান্ত হয় এবং স্নায়ু নেতিয়ে পড়ে। ঘুম তখন বড়ো প্রিয় হয়ে ওঠে ওর কাছে।

এখন আর কোনো গাঙচিল নেই। দূরে সেনট মার্টিনের নারকেলগাছের মাথাও আর ধোঁয়াটে দেখায় না। ওরা টুকটাক কথা বলছে, অসংলগ্ন এবং এলোমেলো। ট্রলার ফটফট শব্দ করে গভীর সমুদ্রে ঢুকছে। এর মধ্যে দুই খ্যাপ মাছ উঠিয়েছে ওরা। সুজা নির্বিকার বিড়ি টানে। সমুদ্রে এলে ও অন্যরকম হয়ে যায়। কথা ফুরিয়ে যায়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আর হাত দুটো কর্মচঞ্চল থাকে। তখন আর অন্য দিকে মন দিতে ভালো লাগে না। শুধু জাল আর মাছ। যেন নিশ্বাসে মাছের গন্ধ, দৃষ্টিতে মাছের ছায়া। আর বুকের মধ্যে বিশাল এক জালের বিস্তার, স্বপ্নের মধ্যে সে জালের গুটি টুঙটাঙ বাজে। এক সময় মানিক হাতের বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে—উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ।

—তোঁরা কডে য-র?

রজব খেঁকিয়ে ওঠে—চুপ য, বেশি ফ্যাচফ্যাচ ন কইরগ্য।

—ক্যা? কতা ন কইয়াম ক্যা? মানিক নড়েচড়ে বসে।

—তোঁয়ারার মতলব কী?

—আঁরার বিদেশী টলারত মাছ বেইচাম।

—কী কইলা? মানিক ছিটকে ওঠে।

—ঠিকই কই। তাহের দাঁত কিড়মিড় করে।

—তোঁয়ারার এত সাহস?

—এত দিন তো সাহস ন করি, হুদা খাতির করি।

—শুয়োরের বাইচ্চা! ছোটো মুঁহত বড়ো কথা!

—গাইল ন দিও কইলাম। রজব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। মানিক স্থানকাল ভুলে যায়। চিৎকার করে গালাগাল করতে থাকে—এই ছোটোলোকগুলোর ঔদ্ধত্য অসহনীয়।

—তুঁই কিছু ন কইবা, সুজা মিয়া?

—হিতারা যা ক-র হেইয়ান আঁরও কত্য।

—এত সাহস? ওই বাদল, টলার ঘুরা।

বাদল ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—হুনিত ন পাস? টলার ঘুরা কইলাম।

—না। সুজা কড়া গলায় জবাব দেয়। রাগে শরীর জ্বলে যায় মানিকের।

—অ, এই কথা। ডাঙাত ফিরিলে কারো গ-র চামড়া যদি রাখি তইলে আঁর নামে কুত্তা পালিস। মানিক উত্তেজনায় পকেট হাতড়ে বিড়ি খুঁজতে গেলে সুজা আচমকা শক্ত হাতে ধাক্কা দিলে পানিতে ছিটকে পড়ে ও। মুহূর্তে স্রোতের টানে মিলিয়ে যায় মানিক।

—কুত্তার বাইচ্চা ডাঙাত ফিত্যে চায়! সুজা হা-হা করে হাসে।

—কী করিলা সুজা ভাই?

—পথ উগ্যাই। ঠিকই করিগ্যি। ইবাই মনত আছিল। সুজার হাসি থামে না। বাদলের বুক থরথর করে কাঁপে।

—ডাঙাত ফিরিলে ও আঁরারে বাঁচিবার ন দিত।

ওরা সবাই মাথা নাড়ে। ঠিকই হয়েছে—সাক্ষী রেখে লাভ কী? তাহের আর রজব দুজনেই স্বিধামত্ত এবং নিঃশব্দ। শুধু বাদলের মুখে কথা নেই। ও পাংশু মুখে অথই পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে সুজা ওর মুখ নিরিখ করছে। এখনই হয়তো ধাস করে কাঁধের ওপর থাবা বসিয়ে দেবে।

ট্রলার একই গতিতে চলছে। যেন মানিকের পড়ে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। ও একটা মাছের মতো অতলে তলিয়ে গেল মাত্র। এতই স্বাভাবিক যে ওতে কিছু এসে যায় না। জায়গামতো এসে বিদেশী ট্রলারে মাছ বিক্রি করে নির্বিঘ্নে ফিরে আসে ওরা। সবাই খুশি, চকচকে বিদেশী টাকা হাতের মুঠোয়। কোন্ চোরাপথে এগুলো ভাঙাতে হবে সেটাও ওরা শিখে নিয়েছে। জলপুলিশ ওদের দেখে নি, নিরাপদ আশ্রয়ে ওরা এখন সাঁই-সাঁই ছুটছে, পরিতৃপ্ত আত্মমগ্ন চিন্তায় আচ্ছন্ন। মাকড়সার মতো সুখের জাল বুনছে সবাই—কোন্ কোন্ খাতে এই বাড়তি পয়সা খরচ হবে তার হিসেব অনায়াসে মিলে যায়। ওদের চাওয়া অল্প বলে হিসেব সহজ, গরমিল হয় না।

এক সময় বেলা ফুরোয়, রাত নামে। গভীর সমুদ্র ছাড়িয়ে অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে। সুজা বিড়ি ধরায়। রাতের ভাত বসিয়েছে। মাছ ভাজা হবে। সমুদ্রে তখনো মরা কোটাল। জোয়ারে টান নেই। অষ্টমী তিথিতে সব সময় মরা কোটাল থাকে। এই সময়টা ভালো লাগে না সুজার। ও চায় ভরা কোটাল। এই সময় জোয়ারের টান থাকে প্রবল, মনে হয় সমুদ্রের যৌবন। সুজার শরীর টগবগে থাকে তখন। অন্য সময় ঝিম মেরে যায়, ম্যাজম্যাজ করে। এইসব পারিপার্শ্বিক আক্রান্ত করে বলেই সাগরের সঙ্গে সুজার সখ্য নিবিড়। ও পাটাতনে চিতপাত হয়। এখনও শীত তেমন নামে নি। গুঁড়িকুয়াশা অনেক দূর পর্যন্ত পরদা বিছিয়ে রাখে। বাদল নোঙর ফেলেছে। ট্রলারের শব্দ নেই বলে চারদিন সুনসান। ভাতের মাড় গেলেছে তাহের, এখন মাছভাজা চলছে। ছাকিছুঁক শব্দ সুজার খিদে বাড়িয়ে দেয় আর ও সঙ্গে-সঙ্গে একটা গল্প তৈরি করে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে ও গল্পটা সবাইকে বলে। ওরা ওর চারদিকে গোল হয়ে বসেছে, কান-মাথা মুড়ি দিয়ে রেখেছে চাদরে। ওরা গল্পটা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। গল্পটা ওদের বাঁচার সহায়ক হবে। ডাঙায় ফিরে ওরা ভীষণ কান্নাকাটি করবে, বলবে—মানিক আচমকা পানিতে পড়ে গেছে। তাই শোকে ওদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। সুজা বড়ো চমৎকার করে গুছিয়ে ওদের কাছে গল্পটা বলে। শৈশবে শোনা দাদীর মুখের গল্পের মতো রূপকথা যেন —রাজপুত্র তেপান্তরের মাঠ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে—পদ্মপুকুর থেকে কোটো উঠিয়ে ভোমরাটা মারার সঙ্গে-সঙ্গে দৈত্যটা মরে গেছে। রাজপুত্রের এখন আর চিন্তা নেই—সামনে তার রাজকন্যা আর রাজত্ব। সুজা যে এত সুন্দর করে গল্প বলতে পারে, ওরা তা কোনো দিন টের পায় নি। ওরা তো কখনো সাগরের বুকে বসে গল্প শোনে নি। ওদের মন ভরে যায়—গল্পটা কী সুন্দর, কী সুন্দর! কিন্তু বাদলের বুক ভরে না, একটা কাঁটা বিঁধতে থাকে। কী যেন ওলোটপালোট হয়ে যায়। এমন করে ও চায় নি—এমন করে না। অন্ধকারেও বুঝি সুজা ওর মুখ দেখতে পায়। ওর ভয় করে। খাওয়া-দাওয়ার পর কেরোসিন বাঁচানোর জন্যে ও হ্যারিকেন নিভিয়ে দিয়েছে। বাদল চাদর গায়ে জড়িয়ে গুটিশুটি শুয়ে পড়ে। ওর এখন আর কিছুই ভালো লাগছে না। শুধু একটা গল্প বুকের ভেতর। শুয়ে পড়ে তাহের এবং রজবও, বুকের মধ্যে গল্প নিয়ে।

ঘুমোয় না সুজা, ঘুম আসে না। অন্ধকারে সাগরের দিকে তাকিয়ে কান পেতে থাকে। কোনো শব্দ আসছে? না তো। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। বয়সটা কি বেড়ে গেল? না তো। সুজা মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়। প্রবল ঝড় কি উঠবে? ডাঙায় ফেরা হবে? কী আবোলতাবোল ভাবনা। সুজা নিজেকে ধমকায়। একটু আগে বলা গল্পটা প্রাণ-পণে আঁকড়ে ধরে। এটাই এখন বাঁচার মন্ত্র। সুতোগুলো অবলম্বন করেই পেরুতে হবে দীর্ঘ পথ। মানিকের ঝুপ করে পড়ে যাওয়ার শব্দটা ও কিছুতেই মনে রাখবে না। ও চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। জায়গা কম বলে বার-বার জালের মধ্যে চলে যায়। চমকে ওঠে ও। মনে হয়, কী যেন পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

ডাঙায় ফেরার পর তোরাব আলী খুব ঠান্ডা মাথায় ওদের কথা শোনে, কান্না দেখে, বিলাপও অবলোকন করে কিছুটা বিচলিত হয়। নিজে সান্ত্বনা পাওয়ার বদলে উলটে ওদের সান্ত্বনা দিতে হয়। নইলে যে ওদের কান্না থামে না।

—তোঁয়ারা বেগুনে বাড়িত যা। কী আর করগ্যাম, মরণর উঅর তো হাত নাই কারো। তোরাব আলী কাঁধের গামছা দিয়ে চোখ মোছে।

ওরা চলে গেলে মাথা সাফ করার চেষ্টা করে। মানিকের জন্যে ওদের এত কান্নার কারণ নেই ; ওর সঙ্গে ওদের সারাক্ষণই লেগে থাকত। তোরাব আলীকে বহু-বার হাতাহাতি থামাতে হয়েছে। ওদের এই বিরোধকে কাজে লাগিয়েছিল তোরাব আলী। মানিক কিছুটা গোঁয়ার আর বোকা। হয়তো ওদের কোনো প্যাঁচে পড়েছে। মুহূর্তে তোরাব আলীর মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। ব্যাপারটা সহজ নয়, ওদের কাউকে ধরতে হবে। কাকে?

ওরা কেউ বাড়ি ফেরে না, সোজা বাদলের বাড়িতে যায়। ওর মার অসুখ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে, এখন-তখন অবস্থা। মাকে দেখে বাদল হাউমাউ করে কাঁদে। বুকের দেয়াল ভেঙে গেছে, নোনাজল ঢুকছে সরসরিয়ে।

—ন কান্দিস।

—আঁই অন কী করগ্যাম?

—ল, ডাকতার ডাকি আনি।

—ওই হাতুড়রে ক-বার ডাইক্যাম? লাব নাই। মারে হাসপাতাল লইয়াম। সোৎসাহে কথাটা বলে থিতিয়ে যায় বাদল—টেঁয়া কডে?

ও সুজার মুখের দিকে তাকায়। সুজা কিছু বলতে পারে না। যে টাকা ওরা এনেছে সেটা ভাঙাতে টেকনাফ যেতে হবে। এটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করা একদম উচিত নয়। মানিকের ব্যাপারটা এখন শাহপরি দ্বীপের আলো-চনার বিষয়। ওর বাপ নেই বলে মা আর তিন ভাই-বোন তোরাব আলীর আশ্রয়ে থাকে। ওর মা বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। মেয়েরা ঘিরে রেখেছে তাকে, সবার চোখ অশ্রুজল। এখন বাদলের মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ওদের ওপর পড়বে। এত অস্থির হলে চলবে না, ওদের ধৈর্য ধরতে হবে।

—কতা ন কও ক্যা, সুজা ভাই?

—ভাবি চাই।

—কী আর ভাবিবা? আঁর মা যদি মরি যায় তইলে মানিকরে মাইরা লাব কী হইল?

বাদলের কথাগুলো তীরের মতো ওদের বুকে বেঁধে। তবে তাহের আর রজব একমত—তাড়াহুড়ো করলে অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু বাদলের প্রশ্নের জবাব কারো জানা নেই। সুজা ওর কাঁধে হাত রাখে, নিষ্ঠুর এবং ক্রুর চাপ দেয়।

—তোরে উগ্যা কিচ্ছা কইলাম তোর মনত নাই?

বাদল ভীত চোখে সুজার নির্মম মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কোঁচো হয়ে যায়। ওর কান্না পায়।

—আঁর মা মরি যাইব। বাদল ফোঁপাতে থাকে।

—তুই তোরাব আলীর কাছত টেঁয়া কর্জ চা।

—ন দিব।

—চাই দেইত পারস।

—কোনোদিন তো ন দেয়। বাদল দ্বিধা কাটাতে পারে না।

—ন দিলে আঁরা দেইখ্যাম। তাহের জোর দিয়ে বলে।

বাদল চোখ মুছতে-মুছতে চলে যায়। ওরা তিনজনে ফিরতে থাকে। ঠিক হয়, তিন-চার দিন পর তাহের আর রজব ডলারগুলো নিয়ে টেকনাফ যাবে। ওরা জানে কোথায় কী করতে হবে। ওরা নিজ-নিজ ঘরে ফেরার আগেই বাদল তোরাব আলীর ঘরে পৌঁছে যায়।

ওর কান্না দেখে, মার অসুখের খবর শুনে তোরাব আলী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। ওর চেহারা নিরিখ করে, ঠিক সুজা যেমন করে দেখত। বাদল ঘাবড়ে যায়। সবাই ওকে এমন করে দেখে কেন? ও কি সেনট্ মার্টিন? শাহপরি দ্বীপ? না, নাফ নদী? এত কী দেখার আছে? বাদলের চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। বুকের ভেতর গুড়গুড় শব্দ। ও তোরাব আলীর মুখের দিকে চাইতে পারে না। এক সময় তোরাব আলী মৃদু হেসে পিঠ চাপড়ে দেয় :

—মার অসুখ হইলে বেগুন উতলা হয়, কোনো হুঁশ ন থাকে।

একটুক্ষণ নীরবতা। তোরাব আলীর কাছারিঘরে আর কেউ নেই। আঁধার হয়ে আসছে। এখনো লন্ঠন জ্বালানো হয় নি। দুপুরের পর সাগর থেকে ফিরেছে, এখনো পেটে কিছু পড়ে নি বাদলের। মনে যেমন উৎকণ্ঠা

হতাশা, পেটে তেমন খিদে। বাদলের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে।

—মার অসুখ হইলে পোলাপানর জান দেওন দরকার।

—হ, আঁরও হেরিক্ষা মনত হয়। আপনে আঁরে টেঁয়া কর্জ দিলে আঁই অনার গোলাম হই থাইক্যাম।

—কত টেঁয়া লবি?

—পাঁচশ টেঁয়া দঅন।

—অ্যাতিক্যিন টেঁয়া ফেরত দিবি ক্যানে?

—হ পাইজ্যাম, আপনে দেখি লইবান পাইজ্যম। বাদল উৎসাহে বলে।

—ক্যানে?

ও হকচকিয়ে যায়, ঢোক গেলে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

—ক্যানে দিবি? তুই বড়ো ভালা পোয়া, বাদইল্যা। তোরাব আলীর স্নেহমাখা কণ্ঠে এবং প্রশ্রয়ে ও দিশেহারা হয়ে যায়।

—পাঁচশ টেঁয়া তোরে আঁই অ্যানেই দিয়াম। তোর মা আঁর মার নান। মনত করিবি আঁই আঁর মার চিকিসস্যা করির। ঠিক ন?

বাদল কিছু না বুঝে মাথা নাড়ে।

—ক চাই বাদল, মানিকর কী হৈল?

—মানিক ভাইয়র? কিছু ন হয় তো। ও ঘাড়ের ওপর সুজার থাবা অনুভব করে। বুকের কাছে রূপ-কথার মতো একটা গল্প।

—মানিক কত বছর ধরি সাগরত যায়, কোনোদিন তো কিছু ন হৈল। মানিকর লাই বুকের মদ্যে ক্যান জানি লাগে।

বাদল চুপ করেই থাকে। ও বুঝতে পারে সকলেই ওর মুখ নিরিখ করে কেন। এখন আর ওর পালাবার পথ নেই। ও কোথায় যাবে? পিছোলে তোরাব আলী মেরে ফেলবে, এগোলে সুজারা। ওর ভীষণ কান্না পায়। তোরাব আলী সস্নেহে পিঠে হাত রাখে।

—ন কান্দিস। আহা, আঁর মার অসুখ হইলে অ্যান করি কাইনতাম। এই দুনিয়াত মার উ-র কেউ নাই।

বাদলের ফোঁপানি থামে না। ঘরে অন্ধকার নেমেছে। জয়গুন হ্যারিকেন দিয়ে যায়।

—ও সাফিয়ার মা, বাদইল্যার লাই ভাত আন। ইতার খিদা লাইগ্যে।

তোরাব আলীর মতো ভালোমানুষ হয় না! ভাবতে-ভাবতে বাদলের কান্না নেমে আসে টাকা দিচ্ছে, ভাত দিচ্ছে। আহা রে! তোরাব আলীর কলজে আকাশের মতো বড়ো। বাদলের হৃদয় গলে যায়। ও চোখ মুছে সোজা হয়ে বসে। জয়গুন একথালা ভাত নিয়ে এসেছে, সঙ্গে মাংসের তরকারি। বাদল কত দিন যে মাংস খায় নি! কবে খেয়েছে মনে পড়ে না। কোরবানির ঈদে ছাড়া তো মাংস খাওয়াই হয় না। বাদল গপগপিয়ে ভাত খায়। তোরাব আলীর একদিনের ভালো ব্যবহারে, তার অতীতের সব বঞ্চনা এবং শোষণের ইতিহাস ম্লান হয়ে যায়। ও সব মাফ করে দেয়, কিছু মনে রাখে না। নিমেষে তার খাওয়া হয়ে যায়, ঠোঁটে পরিতৃপ্তির হাসি। ও বুঝতে পারে না যে তোরাব আলী ওর চেহারা জরিপ করছে। বাদলকে এখন বড়শিতে গেথে টেনে তুলবে। ও কথা না বলে মানিকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তোরাব আলী ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে নাড়াচাড়া করে।

—ক চাই বাদল, মানিকর কী হৈল?

—সুজা ভাই মানিক ভাইরে ধাক্কা মারি ফালাই দিয়ে।

—বিদেশী টলারত মাছ বেইচো না?

—হ।

বাদল লোলুপ দৃষ্টিতে টাকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—ল, টেঁয়া ল। কাইল ব্যানে তোর মারে লই কক্সবাজার যাবি গৈ। টেঁয়া লাইগলে আরো দিয়াম।

বাদল টাকা নিয়ে হাওয়ার মতো উড়তে-উড়তে বেরিয়ে আছে। ভেড়িবাঁধের কাছে এসে ওর উত্তেজনা থিতিয়ে যায়। এ কী করল ও? ভয়ে বুক থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। কলমিলতায় পা আটকে যায়। ও আবার বুকে দম ধরে তোরাব আলীর কাছারিঘরে ফিরে আসে। পা চেপে ধরে ভেউ-ভেউ করে কাঁদে।

—আপনে কই দিলে হিতারা আঁরে মারি ফালাইব।

—কক্সবাজারতুন ফিরি আইয়ারে তুঁই আঁর বাড়িত থাইবি। অন বাড়িত যা।

তোরাব আলীর মনোভাব বুঝতে পারে না বাদল। দ্বিধা নিয়ে বেরিয়ে আসে। ভয় কাটে না। সাহস সঞ্চয় করে মনে-মনে—যে টাকা দেবে ও তার দলে। মা মরে গেলে সুজাই কী, তোরাব আলীই কী? কিন্তু যুক্তি

জুতসই হয় না বলে ভয় কাটে না। ভেড়িবাঁধের ওপর মালেকের সঙ্গে দেখা হয়। বাদলের হঠাৎ মনে হয়, মালেকের কাছে ও একটা আশ্রয় পেতে পারে।

—কী রে বাদইল্যা, তো মা অন ক্যা আছে?

—ভালা না, মালেক ভাই। কাইল কক্সবাজারত লই যাইয়াম।

—টেঁয়া পাবি কডে?

—মহাজন দিয়ে।

—ও।

মালেক আর কথা বাড়ায় না। ভেড়িবাঁধের ঢালু বেয়ে নেমে যায়। ওই টাকা কত গুণ করে যে ফেরত দিতে হবে, কে জানে। বাদল পিছে-পিছে আসে। আম-বাগানের ভেতর এসে ও দ্রুত মালেকের পাশে এসে দাঁড়ায়।

—আপনার লগে এককানা কতা আছে, মালেক ভাই।

—কিয়র?

—এককানা ইম্দি আইয়েন।

বাদল ওকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বাদলের হঠাৎ মনে হয়, মালেকও কি ওর মুখ দেখছে —সুজা এবং তোরাব আলীর মতো।

—কী রে, কী কবি?

—আঁর ডর লাগের, মালেক ভাই।

—ক্যা? কিয়র ডর?

—কথাডা জানাজানি হই গেলে সুজা ভাই আঁরে মারি ফালাইব।

মালেক ওর কাঁধ খামচে ধরে। বাদল ব্যথা পেলেও মুখে কিছু বলে না। মনে হয় ব্যথাটা থাকুক।

—সুজা ভাই মানিকরে ধাক্কা মারি ফালাই দিয়ে।

—বিদেশী টলারে মাছ বেইচো না?

—হ।

মালেক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ওর মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। খুব ভোরবেলা ভেড়িবাঁধ যেমন ফাঁকা জন-শূন্য থাকে, তেমন একটা সরল রেখা মালেকের মগজ চিরে যায়। ও স্পষ্ট বুঝতে পারে, এই কথাটা বলেই বাদল তোরাব আলীর কাছ থেকে টাকা পেয়েছে।

—তোরাব আলী কত টেঁয়া দিয়ে?

—পাঁচশত। মালেক ভাই, আঁই কথাডা কইত ন চাই। ক্যানে জানি কই ফালাইলাম। মহাজনে ক্যান করি য্যান জিগাইল।

—বুজিছি। তোর টেঁয়ার দরকার আছিল, হিতে সুযোগডা লইয়ে।

—আপনে আঁরে বাঁচান, মালেক ভাই। বাদল হাউ-মাউ করে কেঁদে ওর পা জড়িয়ে ধরতে চায়।

—উঠ, উঠ। চুপ কর। কেউ হুনি ফালাইব।

—আপনে আঁরে বাঁচান। বাদল চোখ মুছতে-মুছতে বলে।

—চুপ করি থাক। আর কাউরে ন কইস। অন বাড়িত যা।

[ক্রমশ

চলচ্চিত্র-বিচার

কিরণময় রাহা

চলচ্চিত্র যে শুধু সাধারণ জনের মনোরঞ্জনের মাধ্যম নয়, শিল্পসৃষ্টিও যে এই যন্ত্রনির্ভর এবং বাণিজ্যনির্ভর মাধ্যমে সম্ভব, তার সাক্ষ্য আগে পাওয়া গেলেও সেটি স্বীকৃত হতে সময় লেগেছে। এখনও যে অবিসংবাদিত-ভাবে স্বীকৃত, তা নয়। বস্তুত, যাঁরা চলচ্চিত্রকে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক তাঁদের যুক্তি এবং বক্তব্য খণ্ডন করা সম্ভব হলেও এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সে যুক্তির একটা হল, সময়ের ধোপে যে শিল্পসৃষ্টি না টিকেছে তাকে ধ্রুপদী শিল্পের সম্মান দেওয়া যায় না। অন্যান্য শিল্পের ইতিহাসের তুলনায় চলচ্চিত্রের যে বয়স, তাতে তার কালোত্তীর্ণ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। যে শিল্পের জন্মই হল মাত্র সত্তর বছর আগে ('দ্য বারথ অব এ নেশন'-কে জন্মফলক ধরে), আর যার এই স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে ক্রমাগতই জন্মান্তর হতে থাকছে (শব্দ, রঙ, যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ), সময়ের মাপকাঠিতে তার পরীক্ষা এখন পর্যন্ত হওয়া সম্ভব নয়। স্বল্প সময়সীমার কারণে বিচারের সূত্রাবলীও ঠিকমতো গড়ে ওঠে নি; মতপার্থক্যের ক্ষেত্র শুধু বিস্তৃত নয়, অনির্দিষ্ট। দ্বিতীয়ত, এটা দেখা গেছে যে সমসাময়িক মূল্যায়ন বহু ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত বলে উত্তরকালে পরিত্যক্ত হয়েছে। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা থেকে এর ভূরি-ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়। চলচ্চিত্রের আবেদন তথা স্বধর্মই হল মূলত তাৎক্ষণিক। ইচ্ছে করলেই বইয়ের মতো এগিয়ে-পিছিয়ে বিরতি দিয়ে পড়া যায় না, দেখতে চাইলেই দেখা যায় না বা থেমে-থেমে দেখা যায় না। বিচারও তাই অনেকাংশে সমসাময়িক না হয়ে উপায় নেই। তৃতীয়ত, শতকরা নিরানব্বই ভাগ চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের মনোরঞ্জন, আর লক্ষ্য হল টিকিটঘর। এই অবস্থায় চলচ্চিত্রকে অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে একসারিতে বসানো চলে না।

এই মত আর যুক্তিকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তা সর্বাংশে মেনে নিতে হবে। যতই সাময়িক বা সমকালীন চাহিদার চাপ চলচ্চিত্রকারকে বহন করতে হোক, যন্ত্রনির্ভরতা এই শিল্পসৃষ্টিতে যতই অধিক হোক, প্রকরণ আর আঙ্গিকের পরিবর্তন যতই ঘন-ঘন হোক, মূল্যায়নের মাপকাঠি যতই বিতর্কিত এবং অস্থির হোক, সাক্ষ্যের জোরে

স্বীকার না করে উপায় নেই যে চলচ্চিত্রমাধ্যমে এমন শিল্পকৃতি সম্ভব যা সাহিত্য, সংগীত, নাটক বা চিত্রকলায় সার্থক সৃষ্টির সমতুল্য।

মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য আর বিকাশ, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ সংঘাত রাগ অনুরাগ, চেতন আর অবচেতন মনের প্রক্রিয়া, জীবনের জিজ্ঞাসা আর সত্যানুসন্ধান, সমাজ আর গোষ্ঠীর অবয়ব, স্রষ্টার জীবনদর্শন আর দৃষ্টিভঙ্গি—শিল্পসৃষ্টির যা উপজীব্য—তার সার্থক প্রকাশের অনেক নজির পাওয়া যায়। নির্বাক ছবির যুগে গ্রিফিথসের 'ইনটলারেনস', আইজেনস্তাইনের 'ব্যাটলশিপ পতেমকিন', চ্যাপলিনের 'দ্য গোলড রাশ', কীটনের 'দ্য জেনারল', আবেল গ্যানসের 'নেপোলীয়ন', ড্রেয়ারের 'দ্য প্যাশন অব জোন অব আরক' এবং সবাক যুগে রেনোয়ার 'গ্র্যানড ইলিউশন', ওয়েলসের 'সিটিজেন কেন', ডিসিকার 'বাইসাইকল থীফ', ফোর্ডের 'স্টেজকোচ', ত্রুফোর 'দ্য ৪০০ ব্লোজ', বারগম্যানের 'সেভন্থ সীল', কুরোসোয়ার 'সেভন সামুরাই', সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'—এই ধরনের কয়েকটিমাত্র যথেচ্ছ নামোল্লেখে এটা বোধহয় প্রমাণিত হয় যে চলচ্চিত্রমাধ্যমে কালজয়ী শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব নয়। বস্তুত এমন কথা বলাও অতিরঞ্জন না হতে পারে যে চলচ্চিত্রকারের হাতে যত হাতিয়ার আছে তার যথাযথ এবং দক্ষ ব্যবহারের পিছনে যদি প্রতিভাবান শিল্পী-মন কাজ করে তাহলে চলচ্চিত্রে ধ্রুপদী শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা অন্যান্য শিল্পের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

আগে সময়ের ধোপে টিকে থাকার কথা বলেছি। সময় অবশ্যই বিচারের কষ্টিপাথর। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। শিল্পে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তি-বিদ্যায়, সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আর বিবর্তনের গতি বর্তমান শতাব্দীতে এত দ্রুত, প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাস হয়ে উঠেছে যে আজকের যুগে সময়ের সংজ্ঞাটাই চেতনায় আর চিন্তায় বদলে গেছে। জীবনধারণের ছন্দে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটতে আগে কয়েক শ বছর লেগে যেত, তা এখন দু প্রজন্মেই ঘটে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শিল্পের ভাষা-শৈলী-পদ্ধতিও যেন সমান তালে বদলাচ্ছে। শিল্পের কোনো শাখাই এই দ্রুতবিবর্তনের গতি থেকে মুক্ত নয়। সাহিত্যে, চিত্রকলায়, নাট্যে, ভাস্কর্যে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন গত ছ-সাত দশকে দেখা গেছে, তার কথা ভাবলে মনে হতেই পারে—সময়ের মাপও আগের মতো দীর্ঘায়িত আর সুনির্দিষ্ট নেই। অবশ্য বেশির-ভাগ অভ্যর্থিত বা অভিনন্দিত ঢঙ আর রীতি নেহাতই সাময়িক স্বল্পায়ু ফ্যাশন। কিন্তু তাই বলে এটা যদি বলা হয় তলস্তয় বা স্ত্রাভিনস্কি বা পিকাশো বা ব্রেশট বা রবীন্দ্রনাথের শিল্পকীর্তি কয়েক শ বছরের পুরোনো হয় নি বলে ধর্তব্য নয়, তা হলে কথাটা শুধু যে ঔদ্ধত্য হবে তাই নয়, বিভ্রান্তিকর হবে।

চলচ্চিত্র নবীন শিল্প এবং যন্ত্রবিপ্লবোত্তর শিল্প। সেই কারণে আর যুগসুলভ গতির কারণে এর ভাষা আর শৈলীর দিগন্ত আবিষ্কার আর বিস্তার অন্য শিল্পের চেয়ে বেশি দ্রুতগতিতে হয়েছে। এখানে প্রকাশভঙ্গি এবং রচনার নানারকম পরীক্ষা—এবং পরীক্ষার নামে যা-ইচ্ছে-তাই-করা—বেশি দেখা যায়। তদুপরি চলচ্চিত্রের মূল উদ্দেশ্য বিপুলসংখ্যক দর্শককে খুশি করা, সাময়িক আনন্দ দেওয়া। তা সত্ত্বেও, কিংবা হয়তো সেই কারণেই, চলচ্চিত্রের গুণাগুণের নীতিনির্ধারণ, এর ভাষার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ, এর ব্যাকরণের নিয়মকানুন, এর নান্দনিক সূত্র এবং তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা-আলোচনার বেশি প্রয়োজন, আর তা হচ্ছেও।

বাদী-বিবাদী বক্তব্যের সারাংশ এখানে উত্থাপন করা হল ভূমিকা হিসাবে। এ থেকে এটা আশা করি কারও মেনে নিতে ঘোরতর আপত্তি হবে না যে চলচ্চিত্রের বিপুল আয়তন এবং উৎপাদনের সিংহভাগ তাৎক্ষণিক ইচ্ছাপূরণ, আনন্দ বা উত্তেজনার জন্য নির্মিত হলেও এই মাধ্যমে এমন সৃষ্টি করা সম্ভব যা শিল্পগুণে উজ্জ্বল আর যা উত্তরকালে বাতিল হবে না। সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হয় যে, শেষোক্ত ছবির সংখ্যা নির্মিত ছবির সংখ্যার তুলনায় খুবই কম। এবং বিজ্ঞাপনী প্রচারের প্রচণ্ড চাপ এবং কুজ্ঝটিকা ভেদ করে সেই মুষ্টিমেয়ের মূল্যায়ন কঠিন কাজ। সেই মুষ্টিমেয়ের স্তরে পৌঁছানোর সিদ্ধিতে যে ধরনের প্রতিভার প্রয়োজন তা বিরল। কারণ খুব কম শিল্পকলাই আছে যার মাধ্যমে সৃষ্টির কাজে চলচ্চিত্রের মতো বহুমুখী প্রতিভা ও বৃত্তির একযোগে বিনিয়োগের শর্ত এমন অমোঘ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সামগ্রিক

বিচার স্বল্পপরিসরে করা যেমন প্রায় অসম্ভব, তেমনি আবার এক হিসাবে তা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। কারণ, এদেশে বছরে যে আটশ-নশ কাহিনীচিত্র তৈরি হয় তার নিরানব্বই ভাগেরও বেশি শিল্পগুণের বিচারে, না দেখেও বাদ দেওয়া যায়। তাদের নির্মাতারাও এমন কথা বলবেন না যে শিল্পসৃষ্টির কোনো বাসনা বা অভিপ্রায় তাঁদের ছিল। এর মানে এ নয় যে, সেই বিপুলসংখ্যক ছবির মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ বা তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। একেবারেই তা নয়। বরং তার সমধিক প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা আছে সমাজতত্ত্ব, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, জনসংযোগ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারণে, শিল্পকৃতির কারণে নয়। বাকি শতকরা একাংশেরও অনেক ছবি যা দেশে-বিদেশে আজকাল হিসেব-রাখা-শক্ত বহু উৎসবে পুরস্কৃত বা প্রচারিত, তা বাতিল করা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এ যাবৎ ছাব্বিশ বছরে জাতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে পুরস্কৃত ছাব্বিশটি ছবির কটা স্মরণীয়? কালজয়ী সৃষ্টির কথা ছেড়েই দিলাম।

১৯১৩ সালকে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের শুরু বলে ধরা হয়, তা ইতিবৃত্তের খাতিরে। সবাক চিত্রের প্রচলন (ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধ) থেকেই এর সূচনাকাল ধরা উচিত। কারণ, তখন থেকেই ভদ্রোচিত সংখ্যায় ছবি তৈরি হতে থাকে আর যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রচনার পদ্ধতি ইত্যাদি এদেশের কয়েকটি শিল্পাঞ্চলে অনেকেরই আয়ত্তে আসে। প্রথম কুড়ি-বাইশ বছরে সেই যুগে যা ছবি করা হয় তার মধ্যে অনেক ছবির প্রতি আমাদের স্মৃতি-বিজড়িত মমতা আছে। অনেক ছবি সেই সময়ের অবস্থার কথা ভাবলে শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করে। হিমাংশু রায়, গুরু দত্ত, দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি দেখার সুযোগ হলে এখনও দেখি। কিন্তু নির্মোহ বিচারে সত্যিই কি বলা চলে, সেসব ছবি খুব উচ্চমানের শিল্প হয়েছিল? সেই কুড়ি বছরের ছবির ভিত্তিতে যদি চলচ্চিত্রকে শিল্পের মর্যাদা না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে রসজ্ঞদের দোষ দেওয়া যায় না। ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী'র পর যে যুগের শুরু, তখনই ভারতীয় চলচ্চিত্রের উঁচু মানের ছবির জগতে প্রথম প্রবেশ ঘটে। পরের দশ-পনেরো বছর ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙলা, চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সেই ক বছরে পরিমণ্ডলটাই বদলে যায়—উৎসাহ, এমনকি উদ্দীপনা, ছড়িয়ে পড়ে নানা মহলে।

সে পর্যায়ও বেশ কিছুদিন হল কেটে গেছে। আজকে হয়তো তার নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব। সেই বিচারে আর 'এ স্ট্যানডার্ড ইজ এ স্ট্যানডার্ড'-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই দশ-পনেরো বছরের ফসল যদি বাছা যায়, তাহলে কটা ছবির কথা বলা যায় যা ক্লাসিক হিসাবে গণ্য হতে পারে? ছ-সাতটার বেশি নাম করা সহজ হবে না—যদি অন্যান্য দেশে ওই গোষ্ঠীভুক্ত হবার যোগ্যতা রাখে এমন ছবির সংখ্যার কথা মনে রাখা যায়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্প্রসারণ চমকপ্রদ গতিতে হয় এর পরের পর্যায়ে, গত পনেরো বছরে। আগের পর্যায়ে সৃষ্টি এবং আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকটি অঞ্চল আর কয়েকজন চলচ্চিত্রকারের মধ্যে। সেই সীমা দ্রুত বিস্তারিত হয়ে প্রায় সারা দেশেই ছড়িয়ে যায়। ব্যবসায়িক ছক থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পশর্ত মেনে সততার সঙ্গে ছবি করলে যে দর্শকের প্রসাদলাভে বঞ্চিত হতে হয় না, আপোস না করে ভালো ছবি করা যে সম্ভব, প্রতিকূল প্রদর্শনী-ব্যবস্থা সত্ত্বেও, সেটা এই সময়ে দেখা গেল। অনেক তরুণ চলচ্চিত্রকার এমন ছবি করতে শুরু করলেন যা নতুন সজীব, আর যার বিষয়, শৈলী, নির্মাণপদ্ধতি আধুনিক শিল্পভাবনার অনুষঙ্গী। চলচ্চিত্রভাষা নিয়ে নানারকম পরীক্ষার প্রবণতা দেখা গেল, যার মধ্যে কিছু প্রচেষ্টার সার্থকতায় তথা ব্যবসায়িক সাফল্যে সন্দেহ থাকে না। ভাষা আর ভঙ্গির চেয়ে যেটা বেশি লক্ষণীয় তা হল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের একটা দিক ভারতীয় সমাজের ইতিপূর্বে অনুদ্ঘাটিত নানা শোষণ আর অত্যাচারের রূপ।

ব্যক্তি আর ছবির নাম এখানে যতদূর সম্ভব না করার চেষ্টা করেছি, কারণ তাহলে এত নাম করতে হয় বা ছবির দোষগুণের ব্যাখ্যা করতে হয় যে এই ছোটো লেখায় তার পরিসর হবে না। কিন্তু গত পনেরো বছরে যেভাবে চলচ্চিত্রের আয়তন আর আবেদন আমাদের দেশে বেড়ে গেছে, তা নিয়ে এত লেখা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে, এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবনাচিন্তা করছেন যে তাতে বক্তব্যের কারণে কিছু নামোল্লেখ না করে উপায় নেই। চলচ্চিত্রমাধ্যমে কালোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টির সম্ভাব্যতা নিয়ে, মনে হয়, সংশয় পুরোপুরি না কাটলেও অনেক কমে

এসেছে, শিল্প হিসাবে আর অপাংক্তেয় বলে গণ্য হয় না। এমন-কি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষায়তনে চলচ্চিত্রচর্চা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও ভাবা হচ্ছে। এই অনুকূল জনমত ও অবস্থায় আতিশয্যের একটা আশঙ্কা থাকে। ভারতীয় ছবি নিয়ে তাই একটু সতর্ক হলে ক্ষতি হবে না।

আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিযোগী এবং অপ্রতিযোগী উৎসব পালটাপালটি করে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ইনডিয়ান প্যানোরমা আখ্যায় একটি প্রদর্শনী যোগ করা হয়েছে যাতে বিশেষজ্ঞদের মতে এক বছরের শ্রেষ্ঠ একুশটি ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হয়। ধরা যাক, গত পাঁচ বছরে এইভাবে প্রদর্শিত ছবির কথা। এই শতাধিক ছবির মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য ছবির কথা ভেবে দেখলে দেখা যাবে, তার সংখ্যা খুবই কম। তার মধ্যেও কটা ছবি আন্তর্জাতিক মানের প্রথম সারিতে স্থান পাবে, আর দশ-কুড়ি বছর পরে পরিশীলিত দর্শকের আগ্রহ আর রসানুভূতি উদ্রেক করতে পারবে, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে।

তা ছাড়াও এক ধরনের সংশয় হয়। যাঁদের উপর ভরসা করে সমকালীন যুগের শুরুতে স্থায়ী কীর্তির আশা করা গিয়েছিল পরে তাঁদের সম্পর্কেই একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন মনে আসে। তাঁদের প্রেরণার উৎস আর শক্তির সঞ্চয় কি যথেষ্ট নয়? সৃষ্টিশীলতা কি স্বল্পায়ু?

গত পনেরো বছরের প্রথম দিকে যাঁদের দেখা পাওয়া যায় তাঁদের কাজ দেখে উৎসাহিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তার মধ্যে যে চারজনের কথা বেশি মনে হয় তাঁরা হলেন শ্যাম বেনেগল, মণি কাউল, এম এস সাথ্যু আর অদূর গোপালকৃষ্ণন। এঁদের প্রথম ছবি 'অঙ্কুর', 'উসকী রোটি', 'গরম হাওয়া' ও 'স্বয়ম্বরম' দেখে যেরকম আশান্বিত হয়েছিলাম পরে আবার দেখেও মনে হয় নি, প্রথম দেখার সময় উৎসাহ অযৌক্তিক হয়েছিল বা ভবিষ্যতের আশা বিফল হবার কারণ আছে। শ্যাম বেনেগলের কল্পনা, চিত্তভাষার উপর দখল, কাহিনীর বিন্যাস, বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশ আর পরিণতি রূপায়িত করার ক্ষমতা দেখে পরের ছবির জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় ছিলাম। পর-পর কয়েকটি ছবি—'নিশান্ত', 'মন্থন', 'ভূমিকা', 'কণ্ডুরা' দেখে আশাভঙ্গ হয় নি, উপরন্তু মনে হয়েছিল ও'র কাছ থেকে স্থায়ী শিল্পসম্ভার পাওয়া যাবে। 'জুনুন' থেকে কী হল জানি না, পরের প্রতিটি ছবিতেই —'কলযুগ', 'আরোহণ', 'মন্ডী'—মনে হয়েছে ও'র শিল্পপ্রেরণার উৎস যেন এর মধ্যেই শুকিয়ে যাচ্ছে। মণি কাউল 'উসকী রোটি'তে এমন একটা স্বতন্ত্র আর একান্ত ব্যক্তিগত ভাষা আর শৈলী অবলম্বন করেন যে ও'র আত্মবিশ্বাস দেখে চমৎকৃত হতে হয়েছিল। 'আষাঢ় কা একদিন' ও 'দুবিধা'তেও তা থেকে বিচ্যুত হন নি, যদিও একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল যে দর্শকের অনুমেয় পছন্দ বা অভ্যস্ত ধারণাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে এই মাধ্যমে কাজ করা সম্ভব কি না। চার বছর আগে বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক মুক্তিবোধ-এর উপর যে ছবি করেছেন, 'সতা মে উঠতা আদমী', সেটা দেখে মনে হয় মণি কাউল তাঁর নির্জন পথপরিক্রমায় ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। এম এম সাথ্যু হতাশ করেছেন আরও নির্দয়ভাবে। 'গরম হাওয়া'র পর বারো বছরে যে চারটি ছবি করেছেন তার মধ্যে দুটি যা দেখেছি তাতে মনে প্রশ্ন এসেছে ইনিই কি 'গরম হাওয়া' করেছিলেন? অদূর গোপালকৃষ্ণনকে এক হিসাবে ব্যতিক্রম লাগে। 'স্বয়ম্বরম'-এ যে অভিনিবেশ আর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল পরের সব ছবিতেই তা উপস্থিত এবং আরও পরিণত। এবং সেই সঙ্গে বিরল শিল্পসততা। কিন্তু বারো বছরে মাত্র চারটি ছবি করেছেন, এবং যদিও তার মধ্যে অসাধারণ ছবি 'এলিপাথায়ম' আছে, এত স্বল্পসংখ্যক ছবির ভিত্তিতে জোর করে বলা মুশকিল চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ও'র স্থায়ী দান কতটা হবে।

এই চারজনই অবশ্য সম্প্রতিকালের ভারতীয় চলচ্চিত্রে নবযুগের একমাত্র পুরোধা নন। এঁদের প্রথম ছবির আগে, সেই সময়ে বা কয়েক বছরের মধ্যেই কিছু নতুন নাম এবং কিছু ছবি শোনা আর দেখা যায় যা এই সময়কার আশা-উদ্দীপনার সহায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ পট্টভী রামা রেড্ডীর 'সংস্কারা', গিরীশ কারনাড-এর 'কাড়ু', বাসু চ্যাটার্জির 'সারা আকাশ', অবতার কাউল-এর ২৭ ডাউন, অরবিন্দন-এর 'উত্তরায়নম' ইত্যাদি ছবি ও তাদের নির্মাতাদের নাম করা যায়। কিন্তু এঁদের ক্ষেত্রেও প্রথম ছবি থেকে যে আশা করা গিয়েছিল তা পূরণ হয় নি। অবতার কাউল-এর অকালমৃত্যু-তে আশা পূরণের প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু পট্টভি রামা রেড্ডী ছবি করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন আর বাসু চ্যাটার্জি এবং গিরীশ কারনাড ব্যবসায়িক ছবির দিকেই ঝুঁকেছেন। এক অরবিন্দন সংখ্যায় কম হলেও ভালো ছবি করছেন।

সত্তর দশকের শেষের দিকে আরও নতুন কয়েকজনের কাজ আশা আর উৎসাহ জাগিয়েছে। গিরীশ কাসারবল্লী, প্রয়াত রবীন্দ্র ধর্মরাজ, গোবিন্দ নিহালানী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সৈয়দ মির্জা, গৌতম ঘোষ, কেতন মেহতা, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, নীরদ মহাপাত্র এবং আরও কয়েকজন যা ছবি করেছেন তাতে তাঁদের কল্পনাশক্তি এবং ছবি করার দক্ষতায় সন্দেহ থাকে না। আমাদের চলচ্চিত্র যে আগের চেয়ে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধতর, এটা নিয়ে স্থিমত হবার আশঙ্কা কম।

তা সত্ত্বেও এবং সমৃদ্ধির কথা মনে রেখেও সখেদে বলতে হয়—ভারতবর্ষে এমন ছবি কমই হয়েছে যা নান্দনিক গুণে বিশ্বের চলচ্চিত্র-ইতিহাসে স্থায়ী স্থান পেতে পারে। ছবির শিল্পোৎকর্ষ যাচাইয়ের একটা সহজ, (যদিও সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে নির্ভুল নয়) পন্থা হল বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে একই ছবি দেখা। তা করলে প্রায়ই দেখা যায় যে, যে ছবি নিয়ে প্রথম প্রদর্শনের সময় হৈ চৈ হয়েছে তা পরে নীরস আর অপটু লাগে। অপরপক্ষে এমন কিছু ছবি হয় যা পুনর্দর্শনে আরও ভালো লাগে, বারবারই নতুন অর্থ, ব্যঞ্জনা আর শিল্পকলার সন্ধান পাওয়া যায়। সেরকম ছবি পাঁচ দশক ধরে আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যায় উৎপাদিত ছবির মধ্যে বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। চলচ্চিত্রের বেলায় বিশেষ করে তাৎক্ষণিক বিচার কিছুকালের জন্য মুলতুবি রাখাই ভালো, যেহেতু এই জনপ্রিয় মাধ্যমে প্রচারের প্রভাব, পুরস্কারের ছড়াছড়ি এবং সাময়িক উত্তেজনার ক্ষেত্র অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বিস্তৃত। ভ্রান্তির সম্ভাবনাও সেই কারণে বেশি।

তা ছাড়া অন্য দেশের ছবির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয়ের সুযোগের অভাবে মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখা মুশকিল। এ কথার সপক্ষে একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৮৪ সালে নির্মিত শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায় 'দামুল' যার পরিচালক প্রকাশ ঝা। 'দামুল' গ্রামীণ সমাজের আলেখ্য, যার কেন্দ্র হল ভূমিহীন হরিজন চাষিদের মর্মন্তুদ শোষণ। শ্রেণী এবং জাতপাতে বিভক্ত গ্রামজীবন নিয়ে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ছবি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক তথা সামাজিক বিশ্লেষণের বিশ্বস্ততায়, পরিবেশরচনায়, অভিনয়ে এবং চরিত্র নির্বাচনে আমার মনে হয়েছিল এই বিষয় নিয়ে যা ছবি দেখেছি তার মধ্যে 'দামুল' স্মরণীয় সৃষ্টি। কয়েকমাস পরে কিউবান ছবি গুটিররেজ এলিয়া-র 'দ্য লাস্ট সাপার' দেখার সুযোগ হয়। এর বিষয় হল বিগত শতাব্দীতে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের উপর কিউবার শ্বেতাঙ্গ চিনির কলের মালিক আর জমিদারদের শোষণ আর অত্যাচার। দুটি ছবিতে বিষয়ের মিলের কথা সহজেই মনে আসে, সেই সঙ্গে তুলনা। 'দামুল' সম্পর্কে অভিমত পরিবর্তন না করেও বলতে পারি, শিল্পবিচারে এলিয়া-র ছবি বহু বহুগুণে উচ্চাঙ্গের। ভারতবর্ষের তুলনায় কিউবা দেশটাই বা কত বড়ো আর চলচ্চিত্রনির্মাণের ইতিহাসই বা কতদিনের।

বর্তমান জগতে চলচ্চিত্রের ভূমিকা আর সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে কিছু বলা বাহুল্য। ভূমিকা এবং প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। এই অবস্থা, এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টির মূল্যায়নের রীতি এবং সূত্র যাতে তরল না হয়ে যায়, সে বিষয়ে রুচিমান ও অভিজ্ঞ দর্শক, সমালোচক আর বিশেষজ্ঞরা সচেতন এবং সতর্ক থাকলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের উপকারই হবে।

প্রসঙ্গ : বাংলাদেশ

জিজ্ঞাসা—বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯১। সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়। দশ টাকা।

চোদ্দটি কবিতা, এগারোটি প্রবন্ধ, তিনটি সমালোচনা-প্রবন্ধ, একটি গল্প, আর একটি সম্পাদকীয়—এই নিয়ে 'জিজ্ঞাসা'-র বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা। সমালোচনা-প্রবন্ধের কয়েকজন পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বাদ দিলে আর সবাই বাংলাদেশের লেখক-লেখিকা। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক এবং সাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও তাঁদের নাম ব্যাপ্ত।

চিন্তনায়ক সুযোগ্য সম্পাদক শিবনারায়ণ রায় 'কবিতাগুচ্ছ' দিয়েই সংখ্যাটি শুরু করেছেন, আর সর্বশেষে সংযোজিত করেছেন তাঁর মূল্যবান সম্পাদকীয় নিবন্ধটি। 'সমকালীন বাংলার অন্যতম প্রধান কবি' শামসুর রাহমান থেকে আরম্ভ করে তরুণ কবিদের কবিতা বাংলাদেশের কাব্যজগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে সাহায্য করে। শব্দচয়নে আর চিত্রকল্পের মৌলিকতায় তাঁরা বাঙলা কবিতার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করে চলেছেন। এইসব কবিতা দুর্বোধ্য শব্দের সমাবেশে জটিল রূপ ধারণ করে নি, সহজেই তার রস আহরণ করা যায়।

প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাস, শিল্পকলা, ভাষাতত্ত্ব, নাটক ও সংস্কৃতির আলোচনায় বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেশজ উপকরণসমূহ উদ্ধারের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি নিরক্ষর, দারিদ্র্যপীড়িত। তাঁদের সঙ্গে উচ্চতলার এবং মধ্যস্তরের মানুষের পার্থক্য সুস্পষ্ট। সভ্যতাভ্রষ্ট শিক্ষা তথা সংস্কৃতির প্রশ্ন নিয়ে ভাবনাচিন্তা শিক্ষিত, সম্পন্ন অংশের মধ্যেই আবদ্ধ। তা সত্ত্বেও এই অংশের মধ্যেও ধর্মজিজ্ঞাসা এখনও কোনো আলোড়নের সৃষ্টি করে নি। তাঁদের মধ্যে কোনো রামমোহনের জন্ম হয় নি। শিক্ষিত সমাজের আকৃতির প্রসারণ হলেও 'এলিটিজম' দানা বাঁধে নি। কিন্তু বিরাট জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন 'এলিটিজম' কতটা প্রগতিশীলতার এবং আধুনিকতার ধারাটিকে প্রবহমান করতে পারে, এই প্রশ্ন নিয়ে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর সুচিন্তিত

গ্রন্থসমালোচনা

প্রবন্ধে ('বাঙালী ও বাংলাদেশী') কোনো বিস্তৃত আলোচনা করেন নি, যদিও তিনি এই দিক থেকে আমাদের ভাবতে সাহায্য করেছেন। তিনি মনে করেন, "বাংলাদেশের ঝোঁক গণতন্ত্রের দিকে, প্রগতির দিকে, আধুনিকতার দিকে"। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে প্রতিক্রিয়াশীলতার। আর এই দ্বন্দ্বে প্রগতিশীলতার অন্যতম দুর্গ হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সুজনশীলতার উন্মেষও হয়েছে শিক্ষায়তনগুলিতে। তাই "প্রতিক্রিয়া" ও "পশ্চাৎমুখীনতা" এখানেই বারে-বারে আঘাত হানছে। প্রগতিশীলতার ধারাটিকে সঞ্জীবিত রেখেছেন শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের রূপরেখাটিও এখানেই তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের জাগরণে অতীতের ভূমিকা নেই, "জাগরণের মুখ পুরোপুরি ভবিষ্যতের দিকে"। তার "শক্তির উৎস অতীতের শিল্পে ও সাহিত্যে নয়" তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান, তা থেকেই উর্বর সৃজনশীল বাঙালি মন অনুপ্রেরণা লাভ করছে। তার শক্তির উৎস এখানেই। নতুন জিজ্ঞাসার আলোতে এই উর্বরতা এবং সৃজনশীলতা এক পরিণতির পথে প্রবাহিত। তারই সূচনাপর্বের দিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কিন্তু মনে প্রশ্নের উদয় হয়। "বাংলাদেশের আত্মার অধিকার নিয়ে" ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মওলানা মওদুদী -প্রচারিত ইসলাম ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে, তাতে বৃহত্তর নিরক্ষর দারিদ্র্যপীড়িত জনসমষ্টির অবস্থান কোথায়, কাদের সঙ্গে তাদের সংযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি। তৃতীয় শক্তি হিসেবে মধ্যপন্থা এবং উদারনৈতিক দল এখনও সক্রিয় নয়। একদিকে শিক্ষিত সম্পন্ন শ্রেণী, অন্যদিকে বৃহত্তর নিরক্ষর দারিদ্র্যপীড়িত জনসমষ্টি। এই দুই বৃত্তের মধ্যে কী কারণে তৃতীয় শক্তির ভূমিকা সক্রিয় হচ্ছে না, তা যদি আলোচিত হত তাহলে বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির ছবিটি আরও স্বচ্ছ হত।

শুধু বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো নয়। অতীত ইতিহাসের এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ সাধন করে বাংলাদেশের জীবনধারাকে পরিণত পুষ্ট রূপ দেবার প্রয়াসও লক্ষণীয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। তাঁরা 'উত্তরাধিকার'-এর প্রশ্নটি খুবই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করছেন। উদ্দেশ্য হল একটি সুসংহত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন। যে "সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও কূপমন্ডুকতা" মানুষের মনকে আবদ্ধ করে রেখেছে তা থেকে তাদের উদ্ধারের কথা খুবই স্পষ্টভাবে হাসান আজিজুল হক তাঁর প্রবন্ধে ('বাঙালী সংস্কৃতি : গ্রহণ-বর্জনের সংকট') বলেছেন। তিনি প্রাচীন ও মধ্য যুগের সভ্যতার এবং সংস্কৃতির বিকাশকে বাঙালি জাতির ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করেন। সুতরাং, তাঁর মত অনুযায়ী, কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ-নামক রাষ্ট্রের আবির্ভাব হলেও তার রয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত অতীত ইতিহাস। এই শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়েই তিনি সাংস্কৃতিক জীবনের বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে "সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি" রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন পরিচালনা করছে। তিনি এই কথাও বলেন, 'ইসলাম' ও 'সাম্প্রদায়িকতা' -নির্ভর পাকিস্তানি আমলের "সরকারী সংস্কৃতি" ছিল শোষক আর শাসক শ্রেণীর প্রয়োজনে তৈরি সংস্কৃতি। এর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃত সাংস্কৃতিক জীবনের কোনো যোগ নেই। এই কথাটা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা সরকারের "ইসলামের ঝান্ডা ওড়ানো দেখে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হবেন না"। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনকে এই রূপান্তর কিভাবে ঘটবে? ঠিক এই মুহূর্তে এই প্রশ্নের আলোচনায় বাংলাদেশের বর্তমান সমাজবিন্যাসে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-উল্লিখিত শিক্ষক- ও ছাত্রসমাজের দিকেই তাকাতে হয়। তাঁদের গৌরবময় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে তাঁদের বন্ধন এমন রূপ পায় নি যার ফলে দারিদ্র্যপীড়িত নিরক্ষর জনসাধারণ অতীত কাল থেকে প্রবাহিত বিশাল সংস্কৃতিপ্রবাহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর প্রবন্ধে ('বাংলাদেশের শিল্পকলা') ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জয়নুল আবেদীনের উদ্যোগে ঢাকা আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে শিল্পচর্চার সূত্রপাতের ইতিহাস আলোচনায় যে ঐতিহ্যগত ধারাটি উল্লেখ করেছেন তার সূচনা ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে। হ্যাভেল আর অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা আর্ট স্কুলকে ভারতে আধুনিক শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষক জয়নুল আবেদীন দেশভাগের পর "কলকাতার শিল্পধারার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কলারীতির সমর্থন নিয়ে" ঢাকাতে চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির সূচনা করেন। এই কারণেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে শিল্পচর্চা সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

শিক্ষিত সম্পন্ন মানুষদের এক অংশের উপর আধুনিকতার প্রভাব পড়লেও, "দেশের অধিকাংশ মানুষের মনকে অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামী আচ্ছন্ন করে রেখেছে"। উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে মধ্যযুগীয় আবর্ত থেকে হিন্দু সমাজের আধুনিক উত্তরণ ঘটেছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলিম সমাজে এই ধরনের কোনো জাগরণ হয় নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের মতো কোনো নেতা মুসলিম সমাজের 'কুসংস্কারাদি' দূর করে সেই সমাজকে সমকালীন যুগের প্রয়োজনে পুনর্গঠন করার প্রয়াস করেন নি। ইসলামীয়করণের আন্দোলনের ফলে সমন্বয়ধর্মী দেশজ ও লোকসংস্কৃতির ধারাটি ব্যাহত হল। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকট হয়ে উঠল। মোল্লা এবং উরদুভাষী অবাঙালি মুসলমানদের দাপটে কিভাবে "সমন্বয়ধর্মী বাঙালি সংস্কৃতিতে ভাঙন" ধরল এবং মুসলমানদের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে "হিন্দু সমাজের উন্নাসিক মনোভাব" কতটা সহায়ক হয়, তার বিশ্লেষণ করে সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ তাঁর প্রবন্ধে ('আধুনিকতা-বিমুখ বাঙালী মুসলমান ও বাংলাদেশের বিকাশ সমস্যা') বলেন, এই-সব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কিছু-সংখ্যক মুসলিম বুদ্ধিজীবী মুসলিম সমাজকে নতুন পথের সন্ধান দেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট দেলওয়ার হোসেন আহমদ মির্জা (১৮৪০-১৯১০)। তিনি ১৮৭৬-১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি ইংরেজি প্রবন্ধে সংস্কার-সাধনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে উন্নত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের অবনতির মূল কারণ হল "ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সহনশীলতার অভাব"। "আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার" অভাবেই মুসলিম দেশগুলিতে "স্বৈরাচারী শাসনের প্রাধান্য" স্থাপিত হয়েছে। মুসলিম সভ্যতার অবনতির প্রধান কারণ হল "ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের একত্রীকরণ"। দেলওয়ার হোসেন মুসলিম সমাজের যেসব দোষ চিহ্নিত করেন তা হল : (ক) বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ভাষায় কোরান অনূদিত না হওয়ায় তার মর্মবাণী মুসলমানেরা উপলব্ধি করতে পারেন না ; (খ) "সুদ গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা" থাকায় "ব্যবসা বাণিজ্য ও পুঁজির বিকাশ সম্ভব হয়নি" ; (গ) ইচ্ছামত নিজের সম্পত্তি অন্যকে দান করতে না পারা ; (ঘ) পরদাপ্রথা এবং (ঙ) বহুবিবাহ। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থারও সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আদৌ সময়োপযোগী নয়। তা ছাড়া তিনি বাঙলা ভাষা শেখার এবং চর্চার প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করেন। ইউরোপের উন্নত দেশগুলির গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু সমকালীন মুসলিম সমাজে তাঁর চিন্তাধারা বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি। সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ মনে করেন, বাংলাদেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সংকট মোচনে দেলওয়ার হোসেন -নির্দেশিত পদ্ধতি "মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়"। দেলওয়ার

হোসেনের সমাজভাবনায় উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উপকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি মীর মশাররফ হোসেনের মতো রক্ষণশীলদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিনা, সেই সম্বন্ধে সালাহ্-উদ্দীন আহ্মদ কোনোই উল্লেখ করেন নি। মশাররফ হোসেন-পণ্ডিত মাশহাদী বিতর্ক শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। দেলওয়ার হোসেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আমির আলি -প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা' নামক সংস্থার সহ-সভাপতি হবার পর কতটা আধুনিকতাকে পরিপুষ্ট করেছেন, তা নিয়েও সালাহ্-উদ্দীন আহ্মদ আলোচনা করেন নি। এই তথ্য তো সকলেরই জানা যে, আমির আলির অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব 'আঞ্জুমান' বা সম্মেলন গড়ে ওঠে তাতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ শক্তি সঞ্চয় করে। এই সংস্থার একজন নেতা হিসেবে এই কাজের সঙ্গে দেলওয়ার হোসেনও যুক্ত ছিলেন। উনিশ শতকের শেষে তিনি নানা প্রবন্ধে মুসলিম সমাজকে আধুনিক জীবনের উপযোগী করবার জন্য সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর চিন্তায় আর কর্মে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় কিনা, তা আলোচনা না করলে দেলওয়ার হোসেনের সমাজ-ভাবনা স্পষ্ট হয় না। উল্লেখ্য এই, উনিশ শতকের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনায় আধুনিকতার আর রক্ষণশীলতার জটিল সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। তাঁদের অবদানের ফলে আত্ম-জিজ্ঞাসা জাগ্রত হলেও তা শিক্ষিত মুসলমানের মনকে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে বিশেষ প্রসারিত করতে পারে নি। মীর মশাররফ হোসেন, পণ্ডিত মাশহাদী ও দেলওয়ার হোসেন প্রণীত রচনাবলী, পত্র-পত্রিকার ভূমিকা এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আশ্রয় করে মুসলিম জাগরণ ঘটায় মুসলিম মননশীলতা এক ব্যাপক পরিধি নিয়ে পরিব্যাপ্ত হতে পারে নি। বিংশ শতাব্দীতেও তার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি।

তাই "বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ" যে সমাজে "খুবই সাধারণ ব্যাপার" হয়ে রয়েছে তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। সরকার "ইসলামী শরীয়তের দোহাই দিয়ে" সহজেই নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ-ঘোষিত সনদ অগ্রাহ্য করতে পারেন। মালেকা বেগম ও হাসান বেগম তাঁদের প্রবন্ধে ('বাংলাদেশের নারীসমাজ ও নারী-মুক্তি আন্দোলন') এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা "নারীমুক্তি-সংগ্রামকে সমাজপরিবর্তনের দিকে উন্মুখ" করার উদ্দেশ্যে সত্তর দশকে স্থাপিত 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' নামক সংস্থার কথা বলেছেন। সংগঠনের নাম না উল্লেখ করে আরও "বিভিন্ন নারী সংগঠনের" কর্মকাণ্ডের দিকে আমাদের দৃষ্টি তাঁরা আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের নারীসমাজের অবস্থা বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে কতটা গুরুত্ব লাভ করেছে অথবা নারীদের স্বার্থ-রক্ষার্থে যেসব আইনকানুন হয়েছে তা কার্যকর করার পথে কোনো অন্তরায় রয়েছে কিনা, তার আলোচনা থাকলে বিষয়টি আরও স্বচ্ছ হত। এই বিষয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সোসিওলজি বিভাগের বা অন্য কোনো বিভাগের গবেষণার কোনো ফসল কি পাওয়া যায় না? তাতে বোঝা যেত, বাংলাদেশের নারীসমাজ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সময় থেকে কতটা এগিয়েছেন।

ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙলা-ভাষা যে পরিস্রুত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই বিষয় নিয়েই হুমায়ুন আজাদ আমাদের এক তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ ('বাঙলাভাষা-চিন্তা ও ভাষাতত্ত্ব : ১৯৪৭-১৯৮৪') উপহার দিয়েছেন। এক মস্ত বড়ো প্রেক্ষাপটে, বহু গবেষকের অনলস প্রয়াসে বাঙলা ভাষায় কিভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হল তা লেখক তুলে ধরেছেন। আধুনিক জীবন এবং শিল্পচেতনা কতটা "গাঢ়ভাবে সংক্রামিত" হয়েছে তরুণ লেখকদের অভ্যন্তরে তা বাঙলা ভাষার আঙিনাতেই স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। আনিসুজ্জামানের গবেষণায় বিশ্লেষণের যদি খানিকটা ঘাটতি থাকেও তাতে তো নিরাশ হবার কারণ নেই। তাঁর আবিষ্কারের ফলে বাঙলা গদ্যের তথা বাঙলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে। বাঙলা ভাষার এই ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিতি বাঙালি মননকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে। গোলাম মুরশিদ -লিখিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ('বাংলা গদ্যের আদিপর্ব ও আনিসুজ্জামানের গবেষণা') আমরা আনিসুজ্জামানের আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

এমনি আর-একটি ক্ষেত্র হল নাটক। মুক্তিসংগ্রামের পরই তার অগ্রগতি। ঢাকায় ও মফঃস্বল শহরে গড়ে ওঠে নাট্যসংস্থা। 'ঢাকা থিয়েটার' গ্রুপের আবির্ভাবও তখনই। তার সঙ্গে যুক্ত লেখক আর শিল্পীরা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় উপকরণ এবং রীতি থেকে রস সংগ্রহ করে বাংলা নাটককে আধুনিক পোশাক মঞ্চস্থ করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের জীবনের বহুমুখী অভিব্যক্তির চিত্র জাতীয় রীতিতেই প্রকাশ করছেন। তার গণমুখী চরিত্রও লক্ষণীয়। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে নাটক নিয়ে যে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে তার এক উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সেলিম আলদীনের প্রবন্ধে ('কিত্তনখোলা ও ঢাকা থিয়েটার')। তাঁর 'কিত্তনখোলা' নাটকটি পূর্ণ রূপ পায় ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে ; নাটকটি তিনি লিখতে শুরু করেন ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে। ঢাকা থিয়েটার -পরিচালিত আগের নাটকগুলিতেই এই নাটকের আঙ্গিকের সূচনা প্রকাশ পায়। তাঁরা আঞ্চলিক ভাষাতেও নাটক করেন। নাট্যকর্মীরা কতটা "উৎসপ্রবণ" হয়ে ওঠেন তার পরিচয় মেলে "দৃশ্য, মঞ্চ-ভঙ্গী ও ভাষা বিষয়ক ভাবনা থেকে"। আদি ও মধ্যযুগের বাংলা নাটকের স্বরূপ আবিষ্কার করাই ঢাকা থিয়েটারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁরা শিল্পমাধ্যম হিসেবে নাটককে বিস্তৃততর তাৎপর্য দান করতে চান। পদ্মা ও বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে অবিরত ধ্বংস ও সৃষ্টির যে লীলা চলছে তা থেকে নাটকের যথার্থ আঙ্গিক সংগ্রহ করতে তাঁরা প্রয়াসী। যারা কাজ করে সেই রৌদ্রে-পোড়া ঘামে-ভেজা মানুষই তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তু। "সেমিটিক মূল্যবোধের বদলে" তাঁরা চান "আধুনিক ও সাবলীল জীবনের নবীন ভাষা"। তাঁদের কণ্ঠে দক্ষিণের সমুদ্রগর্জন প্রতিধ্বনিত।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা মূলত ঢাকা-শহর-কেন্দ্রিক হলেও বিভিন্ন নাট্য-গোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলার কাছেও পৌঁছবার চেষ্টা করছে। জিয়া হায়দার-এর প্রবন্ধে ('বাংলাদেশে নাট্যচর্চার একযুগ') তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর গণ-বিদ্রোহ, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং সামাজিক জীবন অবলম্বন করে নাটক মঞ্চস্থ হয়। শেকসপীয়ারের, রবীন্দ্রনাথের এবং আধুনিক লেখকদের রচনাও অভিনীত হয়। কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকারেরও আবির্ভাব ঘটেছে। গ্রামীণ থিয়েটারের বিকাশের সম্ভাবনাও উন্মোচিত হয়েছে। লেখক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের উল্লেখ করলেও ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'থিয়েটার' নাট্যসংখ্যা ৫০০তম অভিনয় সম্পন্ন করে বাংলাদেশে নাটককে যেভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছেন তার আলোচনা করেন নি। 'থিয়েটার'-প্রযোজিত নাটকের বৈচিত্র্য নাটকপ্রেমিকদের কৌতূহল জাগ্রত করে। জানতে ইচ্ছা হয়, অন্য কোনো গ্রুপ কি তাঁদের মতো শেকসপীয়ারের-রবীন্দ্রনাথের রচনা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন? মুক্তি-যুদ্ধে বিজয়ের পর ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে 'নিয়মিত সৎ নাটক করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'থিয়েটার' সংস্থার আবির্ভাব। উদ্যোক্তারা 'থিয়েটার' নামে একটি নাটকের পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তারপর প্রায় দু বছর লেগেছে 'থিয়েটার' গ্রুপের নিয়মিত নাটক শুরু করতে। এই বিষয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যায় বাংলাদেশে নাটকের প্রতিষ্ঠালাভ কম চমকপ্রদ নয়, বিশেষ করে তাতে যখন রয়েছে আধুনিকতার স্পষ্ট ছাপ।

বাংলাদেশের সমাজভাবনায় যে উন্নত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তার ফলে নতুন করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকাও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। অবশ্য খুবই শক্ত কাজ। রশীদ আল ফারুকী তাঁর প্রবন্ধে ('আবুল মনসুর আহমদ এবং তাঁর উপন্যাস') এই ধরনের প্রয়াস করেছেন। কোনো-কোনো স্থানে তাঁর মন্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করবে। শুধু আবুল মনসুর আহমদ-এর সাম্প্রতিক কালের রচনা অবলম্বন করে তিনি "মুক্তবুদ্ধি চর্চা করতে সক্ষম হয়েছিলেন" এবং "রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বদা ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক" ছিলেন, বলা যথার্থ নয়। ফারুকী সাহেব খেয়াল করেন নি, প্রবন্ধটিতে তিনি নিজেই নিজের মন্তব্যের বিরোধী তথ্য পরিবেশন করেছেন। আর তা থেকে কোনোক্রমেই আবুল মনসুর আহমদকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক রাজনীতিবিদ বলা যায় না। ফারুকী সাহেব খুব স্পষ্টভাবেই লিখেছেন, আবুল মনসুর আহমদ মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকেই 'পরিপুষ্ট' করেছেন। সমকালীন পত্র-পত্রিকা, সরকারি এবং বে-সরকারি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই বিশিষ্ট মুসলিম নেতা ও তত্ত্ববিদ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ রচনার অবলম্বন হিসেবে ফারুকী সাহেবের রচনাটি প্রয়োজনীয় মনে হবে।

হুমায়ুন আহমদ -রচিত ছোটোগল্পে ('১৯৭১') মুক্তিযুদ্ধের একটি চিত্র পাওয়া যায়। সেলিনা হোসেন-এর আত্মকথায় ('সোনালী ভুবন') তাঁর ভাবনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারি।

অসীম রায় ('বাংলাদেশের ইতিহাস-চর্চা'), তাপস চৌধুরী ('সংহত ভাষায় স্বতন্ত্রভঙ্গীতে হাসান আজিজুল হক'), অমল দত্ত ('আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের গল্প'), গুমেমর মান্না ('এক মুঠো : রশীদ করীমের তিনটি লেখা') এবং ঈশ্বর ত্রিপাঠী ('মানবতার কবি আহসান হাবীব') লিখিত প্রবন্ধগুলিতে বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চা, কথা-সাহিত্য এবং কবিতা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা করা যায়। চমৎকার প্রচ্ছদ, আর মনোজ্ঞ সম্পাদকীয়সহ শিবনারায়ণ রায় 'জিজ্ঞাসা'র এই বিশেষ সংখ্যাটি উপহার দেওয়ায় বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে "পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজের অনাগ্রহ" কেটে যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অমলেন্দু দে

এক বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীর ভাবনা-চিন্তা

বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—রশীদ আল ফারুকী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। চল্লিশ টাকা।

সমকালীন প্রসঙ্গ—রশীদ আল ফারুকী। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১। চব্বিশ টাকা।

মুসলিম-মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া—রশীদ আল ফারুকী। রত্না প্রকাশন, কলিকাতা-২৭। দশ টাকা।

উভয় বঙ্গের পরিচিত মুক্তমনা লেখক রশীদ আল ফারুকীর উল্লিখিত প্রবন্ধ-পুস্তক তিনটিতে যেসব বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে ঘুরেফিরে বারবার এসেছে বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালি মুসলমান প্রসঙ্গটি। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের শক্তিধর কবি আল-মাহমুদের মানসিকতার রূপান্তর পর্যন্ত বিস্তারিত তাঁর আলোচনার পটভূমি। পর্যাপ্ত তথ্যসহযোগে ড ফারুকী দেখিয়েছেন, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে স্পষ্ট তিনটি ধারা রয়েছে—অনুবাদ-সাহিত্য, মঙ্গলসাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য—এই তিনটি ধারাই উৎসারিত হয়েছে এদেশে মুসলিম শাসনের ফলে। এই যুগে বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের প্রশ্নে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতালাভের সৌভাগ্য প্রায় ক্ষেত্রেই হিন্দু কবিদের ক্ষেত্রে ঘটলেও মুসলিম কবিদের অবদানও মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। ড ফারুকীর ভাষায় : "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবের তুলনায় মুসলমানেরা বেশ আগেই সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। কারণ চতুর্দশ শতাব্দীতে যে ভাষা লেখ্য-রূপ লাভ করেছে সেই ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে অবদান রাখা সত্যি বিস্ময়কর। কিন্তু যেহেতু বঙ্গদেশের মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ ধর্মান্তরিত, সেহেতু তাঁদের এদেশের মাটি ও মানুষ এবং ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। মুসলমানেরা বঙ্গভাষায় সাহিত্যচর্চা করে সেই সম্পর্কের প্রতি নিজেদের আনুগত্যই প্রকাশ করেছেন। মুসলমানদের সেই সাহিত্যচর্চা সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে রয়েছে।" (পৃ. ৪০, বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ) এই মুসলিম কবিদের সাহিত্যকর্মকে ধর্মভিত্তিক কাব্য, রোমানটিক প্রণয়োপাখ্যান এবং মিশ্রভাষারীতির কাব্য—এই তিন ভাগে ভাগ করে তিনি অসংখ্য নজির তুলে দেখিয়েছেন, এইসব কবির সাধনার সম্ভার কী বিপুল-পরিমাণ।

মধ্যযুগে এমন অবিনশ্বর কীর্তির ধারক হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক যুগে মুসলিম অবদান সীমায়িত কেন, বিশেষ করে বাঙলা গদ্যসাহিত্যে মুসলমানদের এত দেরিতে পদচারণার কারণ কী, এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন : "একদিকে হিন্দুরা ইংরেজ-পরিবেশিত বিকৃত ইতিহাস আত্মসাৎ করে মুসলিম অতীতকে আরো কুয়াশাচ্ছন্ন রেখে মুসলিম জাগরণের মূলে আঘাত হেনেছেন, অন্যদিকে অবাঙালী মুসলিক নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে বাঙালী মুসলমানের স্বার্থ বলি দেওয়ার আহ্বান জানালেন।" (পৃ. ৩১, মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া)। এই সর্বভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাব তৎকালে অগ্রণী বাঙালি মুসলমানদের উপর এত গভীর হয়েছিল যে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী, এমন অদ্ভুত প্রশ্ন নিয়েও সে সময়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। মাতৃভাষা সম্পর্কেই যাঁরা সংশয়ান্বিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা কেমন করে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন? ড ফারুকীর মতে, যদিও এক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর দায়িত্বই বেশি কারণ তাদের "ভাগ কর এবং শাসন কর" নীতি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের পরস্পরের প্রতিযোগী করে তুলেছে, তবু সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমান কেউ কারো চেয়ে কম দায়ী নন।" (পৃ. ৪০, মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া)

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সময়টা হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্টির আনন্দে সাহিত্যক্ষেত্রে জোয়ার তুলেছিলেন তখনো মুসলিম মধ্যশ্রেণী গড়ে ওঠে নি। এই শ্রেণীর বিকাশ প্রধানত সূচিত হয় প্রথম-মহাযুদ্ধপূর্ব সময়ে, পরিণতি লাভ করে যুদ্ধের পর। মুসলিম-রচিত বাঙলা উপন্যাসের বিকাশপর্বের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থানের ইতিহাস। এই মধ্যবিত্ত মানস আত্মপ্রকাশ করতে থাকে বিভিন্ন সাময়িকপত্রের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা নিয়ে যে বিরোধ এবং বিতর্কের সূচনা হয়, তা মূলত এসব সদ্য-গজিয়ে-ওঠা পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করে। ড ফারুকীর ভাষায়, "সেদিনের এই বিরোধ ও বিতর্কে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা ছিল বৈপ্লবিক। কারণ তাঁদের প্রধানত বিত্তশালী মুসলমানদের মতামত উপেক্ষা করেই এই প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। মুসলিমরচিত আদিকালের উপন্যাসগুলিতে বহিরাগত মুসলমানদের প্রতি করুণা ও ঘৃণা প্রকাশ পাওয়ার এও একটা কারণ বলে মনে হয়। কারণ তাঁরাই বঙ্গদেশের ভাষা বর্জন করে অন্য প্রদেশের একটি নতুন ভাষা (উর্দু) মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।" (পৃ. ৫২, মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া)

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতির ফলেই মুসলিম-রচিত বাঙলা উপন্যাসে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। যদিও মুসলিম-রচিত বাঙলা সাহিত্যে এই ধরনের চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছিল মধ্যযুগেই। সেই সময় এই ধর্মনিরপেক্ষ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে উল্লেখ করা যায় আলাওল (১৬০৭-১৬৮০)-এর নাম। মালিক মহম্মদ জায়সির কাব্য অবলম্বনে রচিত পদ্মাবতী তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু এই ধারা অব্যাহত ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলায় যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় তার ধাক্কায় মুসলমানদের মুখ আবার ঘুরে যায় পিছন দিকে। তখনকার ফসল হল মিশ্রভাষারীতির কাব্য। এরপর ঊনবিংশ শতকের শেষে, বিংশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের সাথে-সাথে তাদের চিত্তের জাগরণ শুরু হয়। তাঁরা আবার নতুন করে কবি আলাওলের ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যানধারণার ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র রচনায় প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। এই সময় মুসলিম-রচিত উপন্যাসের দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি ড ফারুকী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর একটি হল মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার যথাযথ চিত্রায়ণ, অপরটি উপন্যাসের প্রাণসূত্রে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাচেতনার আরোপ।

১৯৪৭-এর পর বিভাগোত্তর পর্যায়ে বিশেষ করে পূর্ববাঙলায় মুসলমানদের আপন ঐতিহ্যের সন্ধানে কী ধরনের বিতণ্ডা এবং দ্বন্দ্বসংঘাতের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, তার বিভিন্ন দিক ড ফারুকীর লেখনীতে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রাম সংগঠিত হয় তাতে "বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের অখণ্ড ঐতিহ্যে" যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের জয় হয়েছে। "১৯৭১ সালে আমরা যে আন্দোলনে জয়লাভ করেছিলাম তা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের প্রেরণা থেকে উৎসারিত। এ কারণেই আমরা জাতীয় পরিচয়ে পরিচিত ছিলাম 'বাঙালী' হিসেবে, একখণ্ড ভূমির নামানুকরণে বাংলাদেশী হিসেবে নয়। বাঙালী একটি অনুভূতির বাস্তব প্রতিফলন—যা একটি জাতির শিরায় শিরায় অনুরণিত।" পৃ. ২৩, সমকালীন প্রসঙ্গ)। এই উক্তির মধ্যে একজন সচেতন বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্যচেতনার বলিষ্ঠতা অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

এই ঐতিহ্যসচেতন বাঙালি বুদ্ধিজীবী সাম্প্রতিক কালের নারীপ্রগতি সম্পর্কে সংশয়ান্বিত। তাঁর মতে, "সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চের কোন কোন পর্বে আজ নারীর যে ভূমিকা তাকে নারীর জন্যে মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করা কি তার অবমাননা নয়? আগে নারীদেহকে ব্যক্তিগত ভোগের জন্যে ব্যবহার করা হতো—এখন তা ব্যবহৃত হচ্ছে সমষ্টির ভোগে। উভয় বঙ্গের কয়েকখানা হিন্দী ছবি, বাংলা ছবি ও নাটক দেখে তাকে আমার 'গণভোগ' আখ্যায়িত করতে ইচ্ছে করছে। কারণ এসব কার্যক্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য নারীদেহের প্রদর্শনীর মাধ্যমে অর্থলাভ। কিন্তু আমি সত্যি নারীর মর্যদায় বিশ্বাসী বলেই তা করতে পারছি না। অথচ নারীসমাজ নির্বিকারে এসব মেনে নিচ্ছেন। সাহিত্য ও শিল্পচর্চার প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করা এবং অর্থের বিনিময়ে দেহপ্রদর্শনীর ভেতর পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারলে ভুল বোঝাবুঝি হতে বাধ্য।" (পৃ. ১৫৭, বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)

শিল্পীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গেও এই বুদ্ধিজীবীর চেতনা বেদনাবিদ্ধ। "শিল্পীকে কোথায় শিল্পসৃষ্টির সময় অখণ্ড নির্লিপ্ততা নিয়ে স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে হবে তা নয়, তাঁরা রাতদিন ভেবে মরেন কি লিখতে গিয়ে আবার সরকার, ধর্ম বা রাজনীতির কোপে পড়তে হয়। এ পরিবেশে আর যাই হোক, মহৎ শিল্পসৃষ্টি হতে পারে না। কারণ শিল্পসাহিত্যের ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির মন আর মেজাজের ব্যাপার—যেখানে সাধারণ মানুষের, চাই সে যত শক্তিশালী হোক না কেন, প্রবেশাধিকার নেই। নিজের মনের নিভৃতে বসে যাকে অহরহ সাধনা করতে হয় তার সাথে বাইরের যোগাযোগ কোথায়? অথচ আজ তাঁকে অহরহ নিজের মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আর একথা তো সত্য যে, মানুষ পৃথিবীর সবাইকে ফাঁকি দিতে পারে, শুধু পারে না তার মনকে ফাঁকি দিতে। অথচ আজ শিল্পীদের প্রাণান্তকর প্রয়াস সেই মনকে ফাঁকি দেবার জন্যে। এই ফাঁকা-ফাঁকিতেই আমাদের শিল্পীদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাঁদের পক্ষে মহৎ সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করা সম্ভব হচ্ছে না।" (পৃ. ১৪, বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)

শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নেই হোক আর সাধারণ মানুষের চিন্তার বন্ধন-মুক্তির ক্ষেত্রেই হোক, মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ধর্মকে। তাই তাঁর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে নাস্তিকোর প্রতিই। তাঁর মতে, "তাঁদের (নাস্তিকদের) রুচি পরিশীলিত, অভিজ্ঞতা ব্যাপক ও বিস্তৃত। নাস্তিকরা ভাল বা খারাপ সেটা আমার বিবেচ্য নয়। তবে নাস্তিক হতে হলে মন ও মানসের বিস্তৃতি তার প্রাথমিক শর্ত। নচেৎ যুগ-যুগান্তব্যাপী প্রবহমান একটা মতবাদকে তো অস্বীকার করা যাবে না।"

(পৃ. ১০, বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)

'সাহিত্যে তর্ক ও বিতর্ক' প্রবন্ধেও তিনি এমন সব ধারণার বিরোধিতা করে বসেছেন যে সম্পর্কে পাঠকের নতুন করে ভেবে দেখা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যেমন রবীন্দ্রনাথকে 'কবিগুরু' এবং নজরুলকে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা-প্রদান তাঁর মনঃপূত নয়। এই দুটো খেতাবই তিনি দিতে চেয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। এ সম্পর্কে যেসব সারগর্ভ যুক্তির অবতারণা তিনি করেছেন তা নিঃসন্দেহে সুচিন্তিত এবং সুবিবেচনাপ্রসূত।

বাকি যে-সমস্ত প্রবন্ধের প্রসঙ্গে এই স্বল্পপরিসর আলোচনায় উল্লেখ করা সম্ভব হল না তার প্রায় সব-কটিতেই এই বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীর চিন্তার অল্পবিস্তর মৌলিকত্বের ছাপ পাওয়া যায়।

আবদুর রউফ

কমলকুমার : টীকা আর ভাষ্য

শব্দপত্র—কমলকুমার সংখ্যা। আশ্বিন ১৩৯১। সম্পাদনা : শুভ মুখোপাধ্যায়। পনেরো টাকা।

"ঠাকুর একবার অজন্তা বাগচীর আঁকা কালীঠাকুরের ছবি দেখে বলেন, 'যে দেখেছে সে এ'কেছে।' এখানে এই দেখা কথাটা আমাদের কাছে ভারী দারুণ সূত্র।...যে দেখে সে আঁকে।/...এ সব আমাদের চোখে জল আনে...এসব ভুলবার নয়।"

অথবা, 'এ-দেশটার মত এমন গান-পাগলা দেশ আর কোথাও নেই।' 'চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার' এবং 'গ্রন্থ চিত্রণ বিষয়ে' এই দুটিমাত্র নিবন্ধ আছে যা সরাসরি কমলকুমার মজুমদারের। প্রথমটি সাক্ষাৎকার, টেপ-রেকর্ডারে বন্দী কমলকুমারের নিজস্ব স্বর, যার মধ্যে থেকে আমাদের কাছে শুধু দেশ আর শিক্ষা বিষয়ক আকুলতা নয় ; কিছু উষ্ণতা পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। একজন গ্রন্থকার যিনি চিন্তা, সুর, কথা এবং দৃশ্য থেকে মুদ্রণের ব্যাপারটি পর্যন্ত অখণ্ডতায় ধরতে প্রয়াসী ; আমাদের সামনে রয়েছে তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা, স্মৃতি এবং ভাষার চেষ্টা। গ্রন্থটিতে তিনি নিজে সরাসরি উপস্থিত কেবলমাত্র ওই দুটি ছোটো নিবন্ধে। ফলে, শুরুতেই একটা খেদ থেকে যাচ্ছে : এরকম সংকলনে যদি কমলবাবুর জার-নাল-জাতীয় কিছু রচনা, চিঠিপত্র, বা নিদেনপক্ষে আরো কয়েকটি টুকরো লেখা যুক্ত হত!

দুরূহ ধ্বণি, লেখকের লেখক ইত্যাকার বিশেষণ এবং নানাবিধ জারগন যে লেখক-মানুষ এবং মানুষ-লেখক-টিকে ঘিরে দীর্ঘকাল আবর্তিত হয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যে তার বিনাশ ঘটে নি, শব্দপত্রের কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা তার একটি নথি বলা যেতে পারে।

নথি এ কারণে যে সম্পাদনা, সহযোগিতা, প্রভৃত বিজ্ঞাপন, স্টার-লেখকদের নাম—সমস্তই ব্যবহৃত হয়েছে এই উদ্যোগটির পেছনে ; অথচ এক অর্থহীন প্রহেলিকা—প্রহেলিকা উন্মোচনের নামে আরো কিছু অর্থহীনতার চিহ্ন গ্রন্থটিতে থেকে গিয়েছে।

এ ধরনের সংকলনে সাধারণত যা থাকে সেই স্মৃতিচারণ আছে, মূল্যায়নের প্রথাসিদ্ধ চেষ্টাও আছে। এবং কমলকুমারের শিল্পপ্রতিভার বিভিন্ন দিকে আলোকসম্পাতের প্রয়াস প্রভৃতি ছাড়া দুটি নিবন্ধই বয়স্ক পাঠককে আকর্ষণ করবে। চিন্তা উশকে দেওয়ার মতো লেখার অভাব যখন মহামারীর মতোই, তখন ওই দুটি নিবন্ধই আমাদের আশ্রয় হোক।

এক. শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ লাহিড়ী লিখিত 'পিতাপুত্র : দায়ভাগ ও ভবিতব্যতা' নিবন্ধটি পাঠককে কিছুটা বিব্রত করবে। কিছুটা ভাবাতে সক্ষম হবে। এবং করণিক-সুলভ সংস্কৃতি-চর্চায় যে দু-একটি উজ্জ্বল প্রশ্ন আকস্মিক ছেদ ঘটাতে পারে, শ্রীযুক্ত লাহিড়ীর রচনাটি সেই-শ্রেণীভুক্ত।

'সমালোচক ডুবুরি নন এবং তাৎপর্যও কোন হারানো মানিক বা গুপ্তধন নয়...তাৎপর্যগুলো বহুলাংশেই তাঁর — পাঠকেরও — চোখের সামনে পাঠের শরীরে গা ভাসিয়ে জেগে রয়েছে।' সমালোচকের অন্তর্বর্তী ভূমিকা, অর্থাৎ পাঠ্য আর পাঠকের মাঝখানে তাঁর অবস্থানের ব্যাপারটি যথার্থই প্রবন্ধটিতে যথেষ্ট মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। স্বাধীনতা-নামক কেন্দ্রীয় বিষয়, আবার এই বিষয়টি পূর্ব-প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে কমলবাবুরই গল্পে। 'তাহাদের কথা'-র জের টেনে বিভূতিভূষণের অপু উঠে এসেছে স্মৃতি থেকে, এসেছে পাঠের বোধকে একটু ঝালিয়ে নিতে ; যথাস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। পাঠক-বর্গকে অনুরোধ তাঁরা যেন প্রবন্ধটিতে চোখ দেন।

দুই. দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উৎপলকুমার বসুর। 'লুম্পপ্জাবিধি' গল্পটি এঁর প্রবন্ধের আশ্রয় ; যার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি সেমিওটিকস কমলবাবুর এই গল্পটিতে যে দারুণভাবে উপস্থিত তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য কমলবাবুর অনেক লেখাতেই এ জিনিসটি বর্তমান, যদিও এ প্রসঙ্গে বর্তমান গল্পটির নির্বাচন সুবিবেচনার পরিচয় দেয়। এখন পাঠক হিসেবে আমরা আগ্রহী থাকি কমলকুমারের গোটা লেখালিখির জগৎটিতে, যে জগৎটি নিয়ে পূর্বপরিকল্পিত প্রহেলিকার উৎস এক সুনিশ্চিত গভীরতা ; যে গভীরতার স্বরূপ উদঘাটন আমরা জরুরি মনে করছি।

দুজন প্রাবন্ধিকের মধ্যে একটি জায়গায় ঐক্য দেখা যায় ; আর তা হল কমলবাবুর লেখায় অর্থ থেকে তাৎপর্যে পৌঁছনোর ব্যাপারটি। একটি ভাবার মতো বিষয়, সন্দেহ নেই।

রহস্য-শব্দটির প্রতি বাঙালির প্রীতি অতিমাত্রায়, প্রহেলিকাও ; ফলে বিশ শতকে এমন ব্যক্তির অন্বেষণ, যাঁর মধ্যে প্রহেলিকা আছে—এটা সম্ভব হয়। অতীতে চলে যাওয়া, ক্রমে বর্তমান থেকে নিরাপদ দূরত্বে ; এই আরেক আকর্ষণ, আরকেইক হয়ে ওঠা। এরকম নানা দুর্লক্ষণ পীড়া দিতে থাকে শব্দপত্রের কমলকুমার সংখ্যাটি পড়ে ফেলার পর। যে দেশে বস্তুত কোনো সাহিত্য-সমাজ নেই, সেখানে মূল্যায়ন বা পর্যালোচনার বিষয়টি সরলীকৃত হতে চায়, তা স্তুতি আর নিন্দায় মুখ ঢাকে।

কলকাতার কমলকুমার, এখানকারই এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেছেন, হয়ে উঠেছেন কমলকুমার মজুমদার। অতি সংবেদনশীল মানুষটির নিজস্ব সংস্কৃতি-আদর্শ একদিকে, অপরদিকে চারপাশের এলোমেলো সাংস্কৃতিক আচরণ থেকে সঙ্গত তাঁর প্রতিক্রিয়া। কমলবাবুর শিল্পসংস্কৃতির আদর্শটি ভিন্ন এটুকু বুঝি, কিন্তু সেই ভিন্নতার স্বরূপ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ধারণায় পৌঁছতে পারি না। যে মশালটি তাঁর হাতে প্রজ্বলিত ছিল, যদি তার কোনো উত্তরাধিকার না থাকে তাহলে তা যথেষ্ট ক্ষোভের শুধু নয়, প্রশ্নেরও। কেননা, সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। ফলে ভাবালুতার পরিবর্তে তাই ছিল আমাদের কাম্য, যা এই সংকলনটি পূরণ করতে বেশির ভাগটাই ব্যর্থ হয়েছে। ব্যতিক্রম মাত্র দুটি নিবন্ধ, ওই দুটি নিবন্ধে কমলকুমারের গদ্যশিল্পকে তার মূলগত স্বাতন্ত্র্যে বোঝার জন্যে পরিশ্রম করা হয়েছে।

এ ধরনের সংকলনে সাধারণত যা থাকে, সেইসব প্রথাসিদ্ধ ব্যাপারই অধিকাংশ পৃষ্ঠা দখল করেছে। স্মৃতিচারণ, গল্প, এবং কমলকুমারের প্রতিভার নানা দিক নিয়ে ওপর-ওপর কথাবলা আছে। পড়তে ভালো লাগে রাধাপ্রসাদ গুপ্তের রচনাটি। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন, কমলকুমার আলাপে-আড্ডায় কপট বিম্বজ্জনকে নিয়ে নানারকম রসিকতা করতেন, নির্দোষ মিথ্যে কথা বলতেন। তাঁর আচরণগত এইসব তথ্য সংগ্রহ করে ব্যক্তিত্ব আর মানসিক গঠনটি বোঝার কোনো চেষ্টা না থাকায় তা শুধুমাত্র গল্প হয়ে থেকেছে। মিথ ম্যানুফ্যাকচারের যে প্রবৃত্তিটি বঙ্গজ লেখককুলের আছে, কমলকুমার মজুমদারের মতো একজন উন্নাসিক, অভিমানী শিল্পীও তা থেকে রেহাই পান না। তথাপি, চিন্তা উশকে দেওয়ার মতো লেখার যখন একান্ত অভাব, তখন ঐ দুটি নিবন্ধের জন্যেই সম্পাদক ধন্য বোধ করতে পারেন।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

জটিল অসুখ আর সরল রেখাচিত্রের গুচ্ছ

বড়ই নিঃসঙ্গ—রশীদ করিম। মুক্তধারা। পঁচিশ টাকা। **নিউজপ্রিন্ট : ১৭ টাকা। বিমূর্ত বৃত্তে**—মাফরুহা চৌধুরী। মৌসুমী পাবলিশার্স। কুড়ি টাকা।

মাস কয়েক আগে বাঙলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে ঢাকা আদতে একটি বড়ো গ্রাম ; শহুরে ফন্দাণ ঢাকাতে অনুপস্থিত। মহত্বটি তাৎপর্যময়। প্রচণ্ড গতিতে যখন পলকে বদলে যাচ্ছে গতকালের মূল্যবোধ, পৃথিবীটা যখন নাগালের মধ্যে চলে আসছে খবরের কাগজ আর টিভির মাধ্যমে, তীব্র-প্রতিযোগিতাময় সভ্যতা যখন মানুষের কাছে দাবি করছে অতিমানবিক ক্ষমতা, তখন কোনো অনুভূতিশীল চিন্তকের পক্ষে (তা সে হোক না কেন কোনো উন্নতিশীল দেশের রাজধানীর মানুষ) কতোটা সম্ভব এই তীব্র আঁচ গায়ে না ঠেকিয়ে অন্তরে বিশুদ্ধ অচঞ্চল-তৃপ্ত গ্রামাতানে বাঁচিয়ে রাখা?

রশীদ করিমের উপন্যাস 'বড়ই নিঃসঙ্গ' নিঃসন্দেহে একটি শহুরে উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক শরিফ এমন এক অসুখে আক্রান্ত, যা গ্রামাদের হয় না। সহকর্মী, প্রতিবেশী, অপরিচিত প্রত্যেকেই কোনো অজ্ঞাত কারণে শরিফের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলে—অন্তত, শরিফ তাই ভাবে। তার অস্তিত্বের সংকট উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায় থেকেই বর্ণিত। আটটি অধ্যায়ে বিস্তৃত এই রচনার কেন্দ্রবিন্দু শরিফ এক ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার শিকার। লক্ষণীয়, এই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে কখনোই সংঘবদ্ধ হবার কথা ভাবে না। পরিবর্তে সে চিন্তা করে শুধু নিজেকে নিয়ে, বা বলা ভালো, আসন্ন বিপদকে নিয়ে। যদিও, বিপদটা ঠিক কিভাবে আসবে তাও তার অজ্ঞাত। এরই মাঝে-মাঝে ঘটে চলে কিছু কাকতালীয় ঘটনা। এম ডি জেনে ফেলেন শরিফ দুপুরে কী দিয়ে নাস্তা করেছে, শরিফ লিফট-দুর্ঘটনা হয় কিনা খোঁজ নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই লিফট-দুর্ঘটনা ঘটে, এইরকম বাস্তব আর সমান্তরাল-বাস্তব পাশাপাশি চলে উপন্যাসের আগাগোড়া। ফলে, গোটা রচনাটিকেই মনে হয় এমন এক স্বপ্ন, যা কেউ জেগে দেখছে!

"সামনের ঐ লোকটা কিছুতেই তার পাশ কাটিয়ে শরিফকে আগে যেতে

দৈবে না। শরিফ কয়েকবার সে চেষ্টা করেছে। সামনের ঐ লোকটা অবিশ্বাস্য রকম মোটা। নড়তেই তার কষ্ট হয়। তাই শরিফকে পেছনে পেছনে ঐ লোকটার মতোই ধীর গতিতে উঠতে হচ্ছে। বাম দিক কাটিয়ে আগে চলে আসবার চেষ্টা করলে লোকটিও বাম দিকে সরে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ডান দিকে ফিরলেও সেই দশা।" (পৃ. ১৯)

"অদূরে এক লম্বা স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক, সফেদ আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে শুভ্র দাড়ি। দেখেই খুব পুণ্যাত্মা মনে হয়। হাতে একটা ঝকঝকে ছুরি।...শরিফের চোখে তাঁকে এখন রবীন্দ্রনাথের মতো দেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে টলস্টয়ের মতো। শরিফ অপেক্ষা করে আছে তাঁর কাছে শান্তির ললিত বাণী শুনবে—কারণ ভদ্রলোককে দেখলে সত্যিই মনে সম্ভ্রম জাগে।

"গরু আর পা ছুঁড়ে কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না। এটা যখন নিশ্চিত করা হলো তখন সেই আলখাল্লাপরা সম্ভ্রম-জাগানো অতি সুদর্শন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। কি আশ্চর্য। মাত্র তিন-চারবার গরুর গলায় ছুরিটা চালিয়ে দিয়ে তিনি সেই জীবটির সকল আনন্দ সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন।" (পৃ. ২৭)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। দেখবার এই যে, রশীদ করিম ভাষা এবং বাক্যগঠনের সারল্য বজায় রেখেই ঘটনাপ্রধান চিত্র নির্মাণে অভ্যস্ত ; যদিও ঘটনা বলতে এখানে ডকুমেনটেশন বোঝানো হচ্ছে না—বরং একে 'সচেতন নিদ্রা' বা 'ঘুমন্ত জাগরণ' বলা যেতে পারে। উপন্যাসের ভেতরে আমরা এরপর দেখতে পাই শরিফ সার্থক যৌনতার কোনো সম্পর্কও গড়ে তুলতে পারে না। অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা, স্থায়িত্ব, উচ্চাশা, এবং নিরাপত্তাবোধের অভাবই তাকে অস্থির করে তোলে, অসুস্থ করে তোলে। বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিধি ক্রমেই প্রসারিত হয়, তার জাল আরো শক্ত হয়ে ওঠে। শরিফ আরো অসহায় হয়ে পড়ে।

সচেতন পাঠক হয়তো বা এই উপন্যাসের শুরুতেই আশঙ্কা করবেন যে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই শরিফের শেষ অভিযান, এবং বাস্তবিকই তাই ঘটে। দেখবার শুধু ছিল যে কিভাবে এই মৃত্যু উপস্থিত হয়, লেখক এই সবথেকে রূঢ়-অবধারিতকে কোন পোশাকে পছন্দ করেন। এক উন্মাদিনীকে আগুন থেকে উদ্ধার করতে গিয়েই তার এবং ওই উন্মাদিনীর মৃত্যু। ওই উন্মাদিনীই শরিফের হতে-পারত অনুরাগিণী। জোশেফ কের থেকে তাই হয়তো শরিফকে ভাগ্যবান বলতে হবে, কেননা সে অন্তত আঁচ করতে পেরেছিল তার মৃত্যুর কারণ।

ঢাকা এবং তার চারপাশের উচ্চবিত্ত সমাজ, অর্থনীতির অবস্থা, মানুষদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাময় সামাজিক চরিত্র শরিফের চেতনা আর অবচেতনায় একসাথে এসে ভিড় করে। ভাষা, বাক্যগঠন কখনোই খুব চমকপ্রদ নয়। বরং মাঝে-মাঝেই একটু বেশি সাধারণ। নীতির পাঁচিল ভেঙে শরিফ কাজলের সঙ্গে জবরদস্তি যৌনসম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে যখন দেখল কাজল স্তনহীনা, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় হতচকিত, ক্রুদ্ধভাব হয়তো একটু আবছাই থেকে যায়। শরিফের পড়াশুনো বলতে আমরা ইলিয়াড ছাড়া আর কোনো বইয়ের উল্লেখ গোটা উপন্যাসটিতে পাই না। কিন্তু, রশীদ করিম একটি বিষয় উল্লেখ করলে হয়তো উপন্যাসটি আরো সমসাময়িক হয়ে উঠতে পারত—তা হল একা-মানুষ শরিফ তার দেশের বামপন্থী রাজনীতি সম্বন্ধে কী মত পোষণ করে ; কেননা বামপন্থার সংঘবদ্ধতার কনসেপ্ট আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শরিফের স্নায়ুযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হতে হয়।

উপন্যাসটি শহুরে, এই বিশেষণই যথেষ্ট। তবু বলছি, লেখকের রচনাগুণে উপন্যাসটিতে টেনশনের ভরপুর এক তীব্রতা আছে। রচনাটি পড়বার পর মনে হয় সেই কবে, ১৯২০-এ যে 'বিচারে' মৃত্যু হয়েছিল আধুনিকতার পুরোধা জোশেফ কের ; আজ ৮৫-তে তার অনুগামী, ক্ষীণ ছায়ার চিহ্ন সুদূর বাংলাদেশেও!

'বিমূর্ত বৃত্তে' মাফরুহা চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ। আর্টটি গল্পের নায়ক-নায়িকা, ঘটনা এবং পরিবেশ, বাঙলা সাহিত্যের 'গল্প-বলা'র ঐতিহ্যে নির্মিত। এই ধরনের লেখায় নিটোল গল্প থাকে, তার মধ্যে চরিত্ররা সচরাচর পাঠকের আবেগকে উশকে দেয়। এই গল্পগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। ভাষা এবং স্টাইল ঝরঝরে সরল, যে-সব পাঠক-পাঠিকা গল্প পড়ে তৃপ্ত হতে চান তাঁদের অনেকের কাছে কয়েকটি গল্প সুখপাঠ্য লাগবে।

প্রথম গল্প 'বিষণ্ণ বকুল' ঘটনাপরম্পরার দিক থেকে একটু বেশি আরোপিত মনে হয় যা গল্পের সুরকে ছিন্ন করে। রহিমা হক চাকরির খোঁজে কেন লেখিকার কাছেই এল, তার স্বামীর ব্যবহার, লেখিকার প্রতিক্রিয়া ; সব মিলিয়ে গল্পটি আলগা থেকে যায়। তুলনায় দ্বিতীয় গল্প 'বিমূর্ত বৃত্তে'-তে সিদ্দিক সাহেবের চরিত্রটি বেশ আকর্ষণীয়। গল্পের বিষয় যদিও নতুন নয়, তবু বর্ণনার গুণে গল্পটি এক ধরনের আমেজ আনে। 'ক্রাচ' গল্পটি এক উচ্চাভিলাষী তরুণের, যে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সিধে হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় রত। এই গল্পটি সার্থক হয়ে উঠতে পারত যদি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সেকেলে রেশটুকু না থাকত। 'আবার কাক' খিদে নিয়ে গল্প। বাঙলা সাহিত্যের পড়ুয়ামাত্রই জানেন দারিদ্র্যের এই প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে বারেবারেই এসেছে ; এবং আশা করা যায় যতদিন দারিদ্র্যের অবসান না হবে ততদিন এই বিষয়টি আসবেই। তাই এক ধরনের তুলনামূলকতা গল্প-পড়ার সময় হাজির হয়। খিদে, মানুষের এই সবথেকে স্বাভাবিক অভোসগুলির একটি, কিভাবে মরবিডিটিতে রূপান্তরিত হয়—তাই আমাদের আলোড়িত করে। এই গল্পটিতে অবশ্য মরবিডিটি সেরকম আসে নি ; বদলে এসেছে একধরনের সুস্থ অভিলাষ, যা এক বালকের। এই গল্পটি গল্প হিসেবে বেশ পরিপাটি। 'চিত্তবনে বাঁশি বাজে'-র সুর নসটালজিক। লেখিকার সরল চিত্রণে গল্পটি সুখপাঠ্য। 'সুপ্রাচীন'-এর বিষয়ও খিদে এবং চাপা-লোভ। দেখা যাচ্ছে, মাফরুহা বিষয়বৈচিত্র্যের ডুবুরি নন, তিনি এমনও লেখেন না যা পাঠক-পাঠিকারা 'চিন্তায় অনুভব' করবে। ধারাবাহিকভাবে হয়ে-আসা বিষয়গুলিই তিনি বেছে নেন এবং গল্প লেখেন এমনভাবে যা দ্রুত পড়ে ফেলা যায়, থিম বা স্টাইল কোনোরকম বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। 'সন্দর্শন' গল্পটিতে একধরনের নীচু সুরের টেনশন এবং চমক রয়েছে। বর্তমান আলোচকের এই গল্পটিকে গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির ভেতর ঈষৎ অন্যরকম মনে হয়েছে এর মূল চরিত্র শামীম আর সীমার চরিত্রচিত্রণের জন্যে। শেষ গল্প 'আগুন'-এর নায়ক দিলদারের পশুত্ব, সাধ, অসহায়ত্ব লেখিকা যত্নে এঁকেছেন। বেদানা চরিত্রটিও যথাযথ। পরিবেশ অঙ্কনেও বাঁধুনি লক্ষ করা যায়।

মাফরুহা চৌধুরীর গল্পগুলো পড়ে ফেলা যায় এবং এটাই বইটির একটি বড়ো গুণ। লেখিকা ঝুঁকি নেওয়ায় বিশ্বাসী নন এবং নতুনত্বও তাঁর লেখার বিষয় নয়। কিন্তু এক ধরনের সনাতনী প্রবাহ তাঁর রচনায় থাকে যা 'গল্পপিপাসু' পাঠক-পাঠিকাকে নিপাট গাল্পিক বৃত্তে পৌঁছে দেয়। সাধারণ মানুষ, সাধারণ ঘটনাপ্রবাহই লেখিকার মূলধন। গল্প নিয়ে নানান ভাঙচুরে যাঁরা অভ্যস্ত, আধুনিক রচনার ঝাঁঝালো স্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, এই বইটি তাঁদের তৃপ্ত না করলেও, গল্প-পাঠে যাঁরা সময়কে তরতর করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁদের অনেক গল্পই সুখকর লাগবে। জটিলতার স্থান নেই বলেই হয়তো বইটির পড়বে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক। সেদিক থেকে লেখিকার কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কে না জানে, সরল চিত্র অঙ্কনেও এক ধরনের পটুত্বের দরকার হয়। দীর্ঘ অভ্যাসেই সেই পটুত্ব আসে। লেখিকা কয়েকটি গল্পে সেই পটুত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন।

তুহিন চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাটক

স্বাধীনতার পরে জাতীয় শিল্পসংস্কৃতির যে-ক্ষেত্রটিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং জাগরণ পরিলক্ষিত হয়, সেটা নাটক। নাটকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই প্রাণচাঞ্চল্যের পেছনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অবদান অনেকখানি। অনেকের মতো আমার নিজেরও ধারণা, মুক্তযুদ্ধকালীন নয় মাসে এখানকার অন্যান্য পেশা আর নেশার মানুষের মতো বহু নাট্যকর্মী তথা নাট্যামোদী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তাঁরা অনেকে কলকাতার অগ্রসর নাট্যজগতের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান এবং তাঁদের কেউ-কেউ নাটকে আত্মনিয়োগ করার উৎসাহও পেয়ে থাকবেন। স্বাধীনতার পর অনেকে কলকাতার সেই অভিজ্ঞতা ঢাকায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

পাকিস্তানযুগে পূর্ববাঙলায় নাটক, বিশেষ করে রেডিও-টেলিভিশনের বাইরে, মঞ্চস্থ খুব কমই হত। নাটক প্রসঙ্গে নাটক, নাট্যকার আর নাট্যকর্মীদের কথা আসে। কারণ আগে নাটক, তারপরে তার মঞ্চায়ন। আমাদের স্বাধীনতাপূর্বকালের নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যাঁদের নাম তাঁরা নূরুল মোমেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মুনীর চৌধুরী এবং আশফার ইবনে শাইখ। জসীমউদ্দীনের পল্লীজীবনভিত্তিক কয়েকটি গীতিনাট্য আর নৃত্যনাট্য ছিল যেমন, 'পদ্মাপার', 'বেদের মেয়ে', 'মধুমালা'। এগুলো একদা, এমন-কি এখনো, বেশ জনপ্রিয়। নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস', 'রূপান্তর', 'বহুরূপা', 'নয়া খান্দান', 'আলোছায়া', 'যদি এমন হতো', 'যেমন ইচ্ছা তেমন' প্রভৃতি নাটক পাক-আমলে যতটা অভিনীত হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে পঠিত। 'নেমেসিস' কলকাতায় বেশ প্রশংসিত হয়েছিল।

নাটকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কাজ করছিলেন মুনীর চৌধুরী। নাটক প্রণয়ন আর অভিনয় এবং সাহিত্যের এই

ঢাকার চিঠি

মাধ্যমটির আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। তিনি অনেকগুলো বিদেশী নাটকের তরজমা অথবা রূপান্তর করেছেন, কিন্তু তাঁর মৌলিক নাটকগুলো সংখ্যায় অল্প হলেও সেগুলোর সাহিত্যিক মূল্য অসামান্য। তাঁর মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কবর', 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'চিঠি', 'দণ্ডকারণ্য' প্রভৃতি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মূলত নাট্যকার নন, কিন্তু তিনিও গোটা দুই ভালো নাটকের প্রণেতা, যেমন 'বহিপীর' ও 'তরপ্পভঙ্গ'। আশফার ইবনে শাইখ অনেকগুলো নাটক লিখলেও সেগুলোর শৈল্পিক উৎকর্ষ নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী বা ওয়ালীউল্লাহর নাটকগুলোর সমান্তরাল নয়। নাটকে আধুনিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের আর-একজন নাট্যকারের মধ্যে। তিনি সাঈদ আহমদ। তাঁর তিনটি নাটক—'কালবেলা', 'মাইল পোস্ট' ও 'তৃষ্ণায়' উল্লেখযোগ্য।

শুধু নাট্যকার নন—এমন অনেক কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক রয়েছেন যাঁরা দু-একটি ভালো নাটকও লিখেছেন। তা ছাড়া ৬০-এর দশকে ঢাকায় বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বহু নাটক বাঙলায় অনূদিত হয়, কিন্তু তার দু-একটি বাদে কোনোটি মঞ্চে গেছে বলে শোনা যায় নি।

বলা বাহুল্য, নাটকের দুটি সংস্থিতি বা অবস্থান একই সঙ্গে বিবেচ্য : সাহিত্য হিসেবে নাটক, এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পদ্য-শিল্প (পারফরমিং আর্ট)-রূপে নাটক। বর্তমানে আমাদের নাটকের ক্ষেত্রে অভিনয়ের দিকটার প্রতিই অধিক জোর দেয়া হচ্ছে, যে-কারণে অনেক সামান্য রচনা—সাহিত্য হিসেবে যা কোনোদিন টিকে থাকবে না—মঞ্চে গিয়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। সাম্প্রতিক কালে বেশ-কিছু নাটকের অভিনয় দেখার পর আমি সেইসব নাটক পড়তে গিয়ে যারপরনাই হতাশ হয়েছি : সাহিত্য হিসেবে সেসব অতিদুর্বল রচনা। অথচ বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্য অনুল্লেখযোগ্য নয়। গত শতকের শেষ এবং এই শতকের শুরুতে আমরা পেয়েছি মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল আর রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকার। অবশ্য তাঁদের উচ্চতায় পৌঁছেছেন এমন নাট্যকার আজ সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেই বিরল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সামগ্রিকভাবে নাট্যসাহিত্যই যেখানে দুর্বল সেখানে বলিষ্ঠ নাট্যান্দোলন গড়ে উঠতে পারে কী করে? আগেই বলেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের নাটকের অগ্রগতির জন্য বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছিল। স্বাধীনতার আগে ঢাকায় নাটক মঞ্চস্থ হত কালেভদ্রে, যদিও এদেশের মানুষ নাটকের প্রতি অনুরাগী; কারণ পাক-আমলেও এখনকার মতোই গ্রাম-গ্রামান্তরে সারারাতব্যাপী যাত্রাভিনয় হত এবং তখনকার মতো এখনো গ্রামাঞ্চলে চিত্তবিনোদনের মুখ্য মাধ্যম যাত্রায় জনসমাগম হয় প্রচুর, যদিও বর্তমানে গ্রামের লোকেরও টেলিভিশন দেখার সুযোগ হচ্ছে। দেশে এখনো বহু পেশাদার যাত্রার দল রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে চলচ্চিত্রের এমন অধঃপতন হল যে তা আর কোনো রুচিশীল ভদ্রলোকের দেখার উপায় রইল না। সেই শূন্যতায় দেখা দিল কিছু পেশাদার নাটকদল। তাঁরা দর্শনীর বিনিময়ে নাটকের মঞ্চায়ন শুরু করেন। এখন আমাদের নাটক-পাড়া বেশ জমজমাট। স্বাধীনতাপূর্ব নাটকগোষ্ঠীর মধ্যে 'ড্রামা সার্কল' একদা বেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল।

স্বাধীনতার পরে জন্ম নেয় থিয়েটার, নাগরিক, বহুবচন, বহুরূপী, ঢাকা থিয়েটার, ঢাকা পদাতিক, পদাতিক নাট্যসংসদ, আরণ্যক, নাট্যচক্র, লোকনাট্যদল, জনপদ, সর্মিতা, নান্দনিক, প্রতিবন্ধী, কথক, কালান্তর প্রভৃতি নামে বিভিন্ন গোষ্ঠী। ঢাকা শিশু নাট্যম, ঢাকা লিটল থিয়েটার, চয়ন প্রভৃতি নামে রয়েছে শিশুকিশোরদের কয়েকটি দল। এইসব নাট্যসম্প্রদায় এখন নিয়মিত এবং অনিয়মিত ভাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে নাটক করে আসছে।

'নাগরিক' এ পর্যন্ত এক ডজনেরও বেশি নাটক মঞ্চস্থ করেছে এবং তা দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাদল সরকারের 'ব্যাকি ইতিহাস' দিয়ে তাঁদের যাত্রা শুরু ১৯৭৩ সালে। তারপর একে-একে এই গোষ্ঠী করেছে মোলিয়ের-এর 'বিদগ্ধ রমণীকুল', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর', ব্রেশ্‌ট-এর দুটো রূপান্তরিত নাটক 'সৎ মানুষের খোঁজে' ও 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা', সাঈদ আহমদের 'মাইল পোস্ট', রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' ও 'বিসর্জন', দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান', সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরুলদীনের সারাজীবন' প্রভৃতি। শেষোক্ত নাটকটি নিয়ে কিছুদিন আগে তাঁরা কলকাতা, নয়াদিল্লী আর জয়পুরে প্রদর্শনী করে এসেছেন। এখন শুনছি তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নিয়ে মঞ্চে আসছেন। নাটক সম্পর্কে 'নাগরিকে'র বক্তব্য : "নাটক রচনায় আমরা বিচিত্রতায় বিশ্বাস করি।...বিশেষ কোনো মতবাদ বা দর্শনে আমরা বিশ্বাসী নই বলে বিশেষ ধরনের নাটকে আমাদের আগ্রহ শূন্য।"

দেশের অন্যতম প্রধান নাট্যদল 'থিয়েটার' ১৯৭৪-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক দিয়ে যাত্রা শুরু করে। তারপর একে-একে এঁরা করেছেন কয়েকটি সামাজিক নাটক, যেমন 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'চারিদিকে যুদ্ধ', 'চোর চোর', 'অরক্ষিত মতিঝিল', 'এখানে তখন', 'সেনাপতি', 'এখনো ক্রীতদাস' প্রভৃতি। এ ছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাসের নাট্যরূপ : 'দুইবোন' আর 'ঘরে-বাইরে', শেকস্‌পীয়ারের 'ওথেলো' আর 'ম্যাকবেথ' এবং মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদারদর্পণ'। সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকটি নিয়ে 'থিয়েটার' কয়েক বছর আগে দক্ষিণ কোরিয়া ঘুরে এসেছে। এ সম্পর্কে 'থিয়েটারের' অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা রামেন্দু মজুমদারের বক্তব্য : "থিয়েটারের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ঘটনা সিউলে তৃতীয় বিশ্ব নাট্যোৎসবে যোগদান। বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম একটি নাটকের দল বহির্বিশ্বে নাট্যপ্রযোজনার সুযোগ পেল। ১৯৮১-র মার্চে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানীতে এ নাট্যোৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ আমাদের কাছে ছিলো অপ্রত্যাশিত। কিন্তু শর্ত ছিলো, যাতায়াত খরচ জোগাতে হবে আমাদেরকেই। সোজা গিয়ে ধরলাম তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। তিনি আমাদের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটক দেখেছিলেন। তাঁকে বললাম তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে—নাটক কেন বাদ যাবে! ...রাষ্ট্রপতি জিয়া আমাদের যুক্তি মানলেন এবং সরকার থেকে আমাদের দলের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিলেন।"

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা দরকার—আমাদের গ্রুপ থিয়েটারগুলো বর্তমানে শুধু যে জনসাধারণের বা দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতায় টিকে আছে তা নয়, এঁরা সকলে না হলেও অনেকে সরকারি, বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা মোটামুটি বেশ ভালোই পাচ্ছে।

নাটক সম্পর্কে 'থিয়েটারে'র বক্তব্য হল : "যে-ধরনের নাটকে সমসাময়িক জীবন আছে, জীবনের আধুনিক বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু মধ্যযুগীয় দর্শনতত্ত্বের উৎপাত নেই আমরা সে-ধরনের নাটক প্রযোজনায় আগ্রহী।"

আমাদের অধিকাংশ নাট্যগোষ্ঠীই সমাজসচেতন অর্থাৎ রাজনীতিসচেতন। এর মধ্যে 'ঢাকা থিয়েটার' এবং 'আরণ্যকে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নাটককে ব্যবহার করতে চান। প্রায় সকল দলই ঘুনে-ধরা সমাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং দুঃশাসনের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করছে তাদের নাটকে। 'আরণ্যকে'র 'ওরা কদম আলী', 'ইবলিস', 'গিনিপিগ' প্রভৃতি বক্তব্যপ্রধান সামাজিক নাটক। এঁরা সমাজের খেটে-খাওয়া মানুষের তথা অন্তেবাসীদের জীবন-চিত্রায়নের পক্ষে, এবং শাসক-শোষকের মুখোশ উন্মোচনে আগ্রহী।

সম্প্রতি 'ঢাকা থিয়েটার'-এর 'কিক্তুখোলা' বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। এই নাট্যগোষ্ঠীর বক্তব্য : "আমরা জীবনঘনিষ্ঠ হবার জন্য নাটক করি।" জীবনঘনিষ্ঠতা বলতে তাঁরা বোঝাতে চান সামাজিক দায়িত্ব পালনের কথা এবং সামা-

জিক দায়িত্ব হল : বর্তমান সমাজের কুৎসিত দিক উন্মোচিত করা যাতে ভবিষ্যতে একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণ সহজ হয়। তাঁরা আসলে চান 'প্রতিবাদী' নাটক। 'চর কাঁকরার ডকুমেন্টারী', 'বাঁচাও রাস্তা বাঁচাও', 'শকুন্তলা', 'এই নিষিদ্ধ পল্লীতে' প্রভৃতি এই শ্রেণীর নাটক। 'ঢাকা থিয়েটার'-এর 'শকুন্তলা'-ও বেশ প্রশংসিত হয়েছিল।

'ঢাকা পদাতিক'ও একটি সমাজসচেতন তথা রাজনীতি-সচেতন শক্তিশালী নাট্যদল। সমকালীন জীর্ণ সমাজব্যবস্থার তাঁরাও কঠোর সমালোচক—গোষ্ঠীবিশেষকে শ্লেষবিদ্রূপে বিদ্ধ করতে তাঁরাও পারদর্শী। তাঁদের নাটকগুলোর নামেই তাঁদের চরিত্র প্রকাশ পায়, যেমন—'ইন্‌সপেকটার জেনারেল', 'খ্যাপা পাগলার প্যাঁচাল', 'ইলেকশন ক্যারিকেচার' প্রভৃতি।

'ড্রামা সার্কেল'-এর পরে 'বহুবচন'-এর বয়সই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তাঁরা নাটক নিয়ে হাজির হন। তাঁদের নাটক "নিরীক্ষাধর্মী"। প্রচলিত নাট্য-আঙ্গিকের, সেই সাথে আনুষঙ্গিক দিকগুলোর কলা-কৌশলের উপর নিরীক্ষা।"

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার এবং প্রাচ্যের নাট্যসাহিত্যের নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। একেক যুগে একেক দেশে নাটক ভিন্ন-ভিন্ন চারিত্র গ্রহণ করেছে। যেমন, প্রাচীন গ্রীসের নাটক ছিল ট্র্যাজেডি-প্রধান : প্রকৃতি আর নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষের পরাজয়ই তদানীন্তন নাটকের মুখ্য চারিত্র। প্রাচীন ভারতের নাটক মিলনাত্মক। শেকসপীয়ারের নাটক একরকম, বারনার্ড শ-র অন্যরকম, ইবসেনের সঙ্গে মোলিয়ের-এর পার্থক্য প্রচুর, এমনকি রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে গিরিশ ঘোষ বা দ্বিজেন্দ্রলালের দূরত্ব অনেক। যাই হোক, যুগের চাহিদা তো নাটককে কিছুটা মেটাতে হবেই, কিন্তু সেই সঙ্গে যুগোত্তীর্ণ হতে হবে নাটককে। অভিনয়ের কলাকৌশলে কিছুক্ষণ দর্শককে ধরে রাখার মধ্যেই নাটকের সাফল্য নির্ভর করে না ; সাহিত্যরূপে নাটককে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে নাট্যকারের প্রখর সাহিত্যবোধ, সংবেদনশীলতা ও শিল্পচেতনা ইত্যাদি আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন। নাটক যুগের তাৎক্ষণিক দাবি মেটাতে গিয়ে মৌসুমি ফুলের মতো ঝ'রে পড়ে শুকিয়ে গেলে নাট্যসাহিত্য কী করে উর্বর হবে? যেসব সমকালীন নাটক নিয়ে আমাদের থিয়েটার গ্রুপগুলো মঞ্চে আসছে এগুলো যে অচিরেই শুকিয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান সময়ের সমালোচনা নাটকে অবশ্যই থাকবে এবং সে-সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশও থাকতে পারে, কিন্তু শুধু সমকালের সমালোচনা করাই, সমকাল নিয়ে হাসিতামাশা করাই নাটকের মুখ্য কাজ নয়, মানবজীবনের শাশ্বত বিষয়ও নাটকের প্রধান উপজীব্য হওয়া উচিত। আমাদের নাটকের ক্ষেত্রে পরিশ্রমী কর্মীর বেশ সমাগম হয়েছে, এবার দরকার মেধাবী নাট্যকারের, তা না হলে সম্ভাবনাময় নাটকের ক্ষেত্রটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। আমাদের এখানকার অধিকাংশ মঞ্চস্থ নাটকেরই রচয়িতাদের বাঙলা ক্লাসিক নাটকসহ আধুনিক বিশ্বনাটক সম্পর্কে সম্ভবত সম্যক ধারণা নেই। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। গতানুগতিকতা এড়ানোর উদ্দেশ্যেই বোধহয় মাঝে-মাঝে বাঙলা আর অন্য ভাষার ক্লাসিক নাটক নিয়েও আমাদের দলগুলো মঞ্চে আসছে।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। আমি যে-নাট্যদলগুলোর নামোল্লেখ করেছি তার প্রায় সবগুলোই ঢাকাকেন্দ্রিক। তবে ঢাকার বাইরে বড়ো-বড়ো শহরগুলোতেও তাঁদের কোনো-কোনোটির শাখা রয়েছে। কিন্তু এ'রা ছাড়াও সমস্ত দেশে এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক আরো বহু নাট্যগোষ্ঠী রয়েছে এবং তারা ইতোমধ্যে অনেকখানি উন্নতি করেছে। সেইসব দলগুলোর নামের তালিকা বেশ দীর্ঘ।

বাংলাদেশের নাট্যান্দোলনে 'থিয়েটার'-এর রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌশী মজুমদার, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, 'নাগরিক'-এর আলী যাফের, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জমান নূর, 'আরণ্যক'-এর মামুনুর রশীদ, 'ঢাকা থিয়েটার'-এর নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, সেলিম আলদীন, 'ঢাকা পদাতিক'-এর এস. এম. সোলায়মান প্রমুখের বিশেষ অবদান আছে।

গেল ১লা মে থেকে ৮ই মে পর্যন্ত 'থিয়েটার সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয় থিয়েটারের ৫০০তম প্রদর্শনী উপলক্ষে। তখন তাঁদের স্লোগান ছিল 'মঞ্চ চাই সেন্সর নয়'। উদ্বোধনী ভাষণে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী 'নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর সমালোচনা করেন এবং তা বাতিল করার দাবি জানান। যদিও নাট্যকর্মীদের অব্যাহত দাবি থাকা সত্ত্বেও তাঁর শাসনামলেও তা বাতিল করা হয় নি। উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি ১৮৭৬ সালের ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত কুখ্যাত 'নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন' বাতিল করার জন্য সমগ্র দেশে আন্দোলন শুরু হয়েছে। নাটকের মতো শিল্প-কর্ম মঞ্চায়নের জন্য সামান্য সরকারি কর্মকর্তাদের অনুমতি নেবার মতো অপমানকর কাজ আর হয় না। অবশ্য ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে এক সরকারি অধ্যাদেশে ঘোষণা করা হয় যে, এরপর থেকে মেট্রোপলিটান নগরীগুলোয় নাটক সেনসরের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তথাকথিত 'নাটক সেনসর কমিটি'র অনুমতি বা ছাড়পত্র ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের মিলনায়তন ব্যবহার করা কঠিন। বলা বাহুল্য, জাতীয় রঙ্গমঞ্চ না থাকায় আমাদের নাটকের দলগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মিলনায়তন ভাড়া করে নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৯৮১ সালে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন'। এই প্রতিষ্ঠান নাট্য-আন্দোলনের বিকাশের জন্য কাজ করছে। মিছিল, গণজমায়েত, আলোচনাসভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকে গণ-অনশন পর্যন্ত করা হয়েছে স্বাধীন নাট্য-আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। তাঁদের পেছনে সমর্থন রয়েছে সকল শ্রেণীর সচেতন বুদ্ধিজীবীর। ৮৪-র অক্টোবরে তাঁরা ঘোষণা দেন যে, "এখন থেকে সেন্সর ছাড়া নাটক মঞ্চায়ন করবেন" এবং কোনোক্রমেই নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে "সরকারের কাছে ধর্ণা" দেবেন না। অতঃপর বেশ কয়েকটি দল সেন্সর ছাড়াই পথনাটক ক'রে আসছে।

বলা যায়, নাট্যাঙ্গনে মোটামুটি প্রাণচাঞ্চল্য এবং গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। শুধু মিলনায়তন বা মঞ্চে নয়, রাস্তায় আর সড়কদ্বীপে মাঝে-মাঝেই 'মুক্ত-নাটক' মঞ্চস্থ হচ্ছে। এসব নাটকে শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ ব্যক্ত হচ্ছে : দর্শককে রাজনীতিসচেতন করা হচ্ছে।

স্টার, মিনার্ভা, নাট্যনিকেতন, রংমহল, নাট্যবসতী প্রভৃতির মতো ঢাকায়ও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হবে রঙ্গমঞ্চ। তা ছাড়া জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জন্যে আন্দোলন তো চলছেই। আমরা প্রতীক্ষা করছি যে একদিন অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী, ছবি বিশ্বাস, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখের মতো নট ও নাট্যকর্মী পাব। তবে তার আগে অবশ্যই চাই ভালো নাটক এবং জাতীয় নাট্যশালা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ

আলোচনা

রজনী

বাছাবাছি না করে গত সপ্তাহখানেকের খবরের কাগজের মধ্যে থেকে মাত্র দুটি দিনের চারখানি কাগজ তুলে নিয়ে দেখা গেল চিঠিপত্রের কলমে এই মর্মে চারখানি চিঠি :

(১) একজন ছাত্র তাঁর প্রাপ্য ন্যাশনাল স্কলারশিপের টাকা পাচ্ছেন না দেড় বছর ধরে। অফিসে খোঁজ নিয়ে শুনছেন, টাকা নেই। তিনি বি.এসসি দ্বিতীয় বর্ষে উঠলেন, বই-পত্র চাই, নতুন বছরের মাইনে দিতে হবে। টাকা নেই। (আনন্দবাজার, ২৪ জুলাই)

(২) একজন দু বছর হল সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, আজ পর্যন্ত তাঁর পেনসনের ব্যবস্থা হয় নি। (আনন্দবাজার, ১৮ জুলাই)

(৩) তিন মাস ধরে একজনের টেলিফোন অকেজো। তাঁর হার্টের অসুখ, ডাক্তারদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ করা দরকার হয়। বারে-বারে চিঠি দিয়েছেন, নিজে গিয়ে দেখা করেছেন কিংবা লোক পাঠিয়েছেন, কোনো সাড়া পান নি। (স্টেটসম্যান, ২৪ জুলাই)

(৪) গুরুতর অসুস্থ একটি শিশুকে নিয়ে একজন হাসপাতালে গেলেন, ডাকতার বললেন এক ঘন্টার মধ্যে ১৬০ মিলিলিটার রক্ত চাই। শিশুর রক্ত পরীক্ষা করে বললেন 'ও' নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত দরকার। সেনট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কে ছুটে গেলেন, শুনলেন রক্ত নেই। একজন "দালাল" এগিয়ে এসে বলল, ২৩০ টাকা দিলে রক্ত মিলবে। সে নিয়ে গেল এক নার্সিং হোমে। সেখানকার ডাকতার রক্তের নমুনা দেখে বললেন, 'ও' পজিটিভ। ছুটে গেলেন সেই হাসপাতালের রক্তের গ্রুপ ঠিক করে জানবার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে তার দরকার ফুরিয়েছে। শিশুটি মারা গেছে। (যুগান্তর, ১৮ জুলাই)

সাধারণ মানুষের এই নিত্যনৈমিত্তিক নিগ্রহ, এর প্রতিকার কবে হবে, কে করবে? এমন কোনো মন্ত্র কি কারো জানা আছে, যাতে এর অবসান হতে পারে? না, কোনো মন্ত্র নেই। তবে, কিছু দিন থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের পশ্চিম অঞ্চলে একটি নাম প্রায় মন্ত্রের মতো কাজ করছে। যারা কোনো দিন অফিস-আদালতে, রাস্তায়-ঘাটে, দুধের ডিপোয়, গ্যাসের দোকানে, হাসপাতালে কোনো রকম অবিচার, অনাচার, অমানবিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে কোনো

দেশে বিদেশে

প্রতিবাদ জানায় নি, প্রতিরোধের চেষ্টামাত্র করে নি, তারা ওই একটি মন্ত্রের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলছে, অনেক হয়েছে, আর নয়।

বোমবাইয়ের চৌপটিতে এক মহিলা একটি ট্যাকসি চাইলেন, ট্যাকসি-চালক বললেন, অত অল্প দূরে যাবেন না। মহিলা চেঁচিয়ে বললেন, আপনার মতো ট্যাকসিওয়ালাদের জন্যেই 'রজনী' প্রোগ্রাম চলছে। তখন, সেই চেঁচামেচির ফলে, অন্য দুজন ট্যাকসি-চালক এগিয়ে এসে বললেন, আমাদের ট্যাকসিতে চলুন। ওই একজনের জন্যে আমাদের সকলের নামে কালি পড়ছে।

রজনী। প্রতি রবিবার দুপুরে দূরদর্শনে ওই যে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ঘরনীর কাহিনী আমরা দেখছি, যিনি অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেন না, তিনিই লোকের চোখে এখন মূর্তিমতী সেই প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের মন্ত্র। আরব সাগরের উপকূলে তিনি যে ঢেউ তুলেছেন সেটা এখনো দেশের এই পূর্বপ্রান্তে আমাদের কাছে তেমন জোরালোভাবে এসে পৌঁছয় নি, তবে আশা করা যায় আজকে মহারাষ্ট্র যা ভাবছে পশ্চিমবঙ্গ আজ না হোক কাল তা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করবে। পূর্ব ভারতে 'রজনী'র দর্শকসংখ্যা কী-রকম তার কোনো হিসেব কেউ নিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই, কিন্তু খুব যে কম হবে না তা আন্দাজ করা যায়। কাজেই, সপ্তাহে সপ্তাহে যখন দেখছি, রজনীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা আমাদেরই অভিজ্ঞতা, রজনীর প্রতিকারের দাবি আমাদেরও দাবি (যদিও সোচ্চার নয়), তখন আমরাই বা কেন রজনীকে আমন্ত্রণ করে আনব না?

২০ জুলাই তারিখের ইনডিয়ান একসপ্রেস-এ দেখছি, বোমবাইয়ে মধ্যবিত্তের বৈঠকখানায়, ট্রেনে, সরকারি অফিসে 'রজনী-রূপিণীরা' বে-চাল ট্যাকসিচালকদের বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। আর কিছু না হোক, রাস্তায় ট্যাকসিওয়ালা থেকে আরম্ভ করে সরকারি অফিসের কেরানি, সরকারি হাসপাতালের ছোটো-বড়ো নানা ডাকতার-কর্মচারী, গ্যাসের যোগানদার, র‍্যাশনের দোকানদার ইত্যাদি যাঁরা এতকাল সাধারণ মানুষের অসহায়, নিরুপায় চেহারাটি দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা অন্তত এটুকু বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে পারে। "কনজিউমার্স গাইডেন্স সোসাইটি" নামক একটি সংস্থার একজন কর্মকর্তা বলেছেন, "রজনী" ক্রেতাদের মধ্যে একটা চেতনা এনে দিচ্ছে, তাদের একথা উপলব্ধি করতে সাহায্য করছে যে প্রতিকার পেতে গেলে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, এবং যারা লেগে থাকবে তারা কৃতকার্য হবেই।

চেতনা জাগছে, তার প্রমাণ বোমবাই দূরদর্শনকেন্দ্রে রাশি-রাশি চিঠি আসছে। 'হিন্দুস্তান আন্দোলন' নামের আরেকটি সংস্থা এ বিষয়ে একটা উদ্যোগ নিয়েছিল। 'ট্যাকসিমেনস ইউনিয়ন' দাবি করে, দূরদর্শনকে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, কারণ দূরদর্শন নাকি বোমবাই শহরের ট্যাকসিওয়ালাদের ওপর ঘোরতর অবিচার করেছে। (একটি ঘটনায় দেখা গিয়েছিল, রজনীকে একের পর এক ট্যাকসিওয়ালা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পুলিসের সাহায্য নিতে হয়।) 'হিন্দুস্তান আন্দোলন' একটি আবেদনে সাধারণ লোকের মতামত জানতে চায়, প্রশ্ন করে : (১) 'রজনী'তে যা দেখানো হচ্ছে সেটা কি যথার্থ? (২) ট্যাকসি ইউনিয়নের দাবি মেনে নিয়ে দূরদর্শনের কি ক্ষমা চাওয়া উচিত? এই আবেদন প্রচারের তিন দিনের মধ্যে দু হাজার উত্তর এসে পৌঁছয়, এবং তার প্রত্যেকটিতে দেখা যায় রজনীর পেছনে শতকরা একশ ভাগ সমর্থন।

প্রত্যেকটি চিঠি, দেখা যায়, হুবহু একই কথা বলছে : 'রজনী'তে যা দেখানো হচ্ছে তাতে কোনো অতিরঞ্জন তো নেই-ই, বরং বাস্তব অবস্থা আরও অনেক খারাপ, দূরদর্শনের কোনো-মতেই ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়। শুধু তাই নয়, চিঠিতে অনেকে লিখেছেন, আরও অনেক অন্যায়-অবিচারের কথা 'রজনী'তে প্রকাশ পাওয়া দরকার। সে-রকম নানা বিষয়ের তালিকাও অনেকে পাঠিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, সরকারি বাসের কনডাকটারদের বে-পরোয়া চালচলনের কথা, কেউ সিনেমা টিকিট নিয়ে বে-আইনি ব্যাবসার কথা, দুধের বোতলে ইঁদুরছানার কথা।

অবশ্য 'রজনী'র বিরুদ্ধেও নানা মহল থেকে প্রতিবাদ উঠছে। ট্যাকসি ইউনিয়নের কথা আগেই বলেছি। রান্নার গ্যাস সরবরাহকারীদের একটি সংস্থা আপত্তি জানিয়েছে এই বলে যে তাদের অসুবিধা এবং নানা সমস্যার কথা 'রজনী' বলে নি, শুধু অন্যায়-ভাবে তাদের ওপর দোষারোপ করেছে।

এ কথা ঠিক, প্রত্যেকেরই নিজের নিজের সমস্যা থাকে, হয়তো অসুবিধা থাকে নানারকমের। হাসপাতালের ডাকতার-নার্স ইত্যাদি কর্মীদের দুঃসহ চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়, গ্যাস-সরবরাহকারীদের হাতে সব সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাসের যোগান থাকে না, তাঁদের কর্মচারীরা হয়তো সব সময়ে ঠিকমতো কাজ করেন না, এমন-কি ট্যাকসি-চালকদেরও হয়তো কখনো কখনো যাত্রী নিতে অস্বীকার করার পেছনে এমন কোনো কারণ থাকতে পারে, যা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই, নানা প্রয়োজনে জনসাধারণকে যাঁদের ওপর নির্ভর করতে হয়, এবং জনসাধারণের সেইসব প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব যাঁরা জীবিকার প্রয়োজনে নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন, তাঁরা খুশি-মতো সে দায়িত্ব কখনো পালন করবেন কখনো করবেন না, মানুষকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে টেবিলের ওপর পা তুলে গল্পগুজব করবেন, ট্যাকসির দরজা মুখের ওপর বন্ধ করে দেবেন, এ অধিকার তাঁরা দাবি করতে পারেন না। সাধারণ একজন ঘরনী, যাঁর নাম রজনী, দূরদর্শনের পরদায় কখনো সরকারি অফিসের সেইরকম কর্মচারী, কখনো ট্যাকসিওয়ালা, কখনো গ্যাস-ওয়ালা, কখনো হাসপাতালের কর্তা, কখনো বা খোদ 'মন্ত্রীজি'-র সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলছেন, এ চলবে না, আমার কথা শুনতে হবে, আমার প্রতি আপনার যা কর্তব্য তা আপনি যতক্ষণ না করছেন, আমি এখান থেকে নড়ছি না।

বিহারের চম্পারন জেলায় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীকে বললেন, "আপনি যদি এখনই চম্পারন ছেড়ে চলে যান, এবং কথা দেন এখানে আর ফিরে আসবেন না, তা হলে আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি।" গান্ধী উত্তর দিলেন, "আমি ঠিক করেছি জেল থেকে বেরিয়ে বাকি জীবনটা এই চম্পারনেই থাকব।"

রজনী সামান্যা রমণী, গান্ধী নন। চম্পারনের চাষিদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন আর বোমবাই কি কলকাতার রাস্তায় ট্যাকসি পাওয়া-না-পাওয়ার প্রশ্ন এক নয়। তবু, মনে রাখা দরকার, ছোটোখাটো আমাদের জীবনের পরিধি, তার মধ্যে ছোটোখাটো প্রশ্নই বড়ো। আর বড়ো-বড়ো ব্যাপার নিয়ে, বড়ো-বড়ো আদায়ের আন্দোলনে সমাজ-সংসার তোলপাড় করবার লোক বরং পাওয়া যায়, ছোটোখাটো অন্যায় আর অবিচার আর নিগ্রহ বড়ো-বড়ো নেতাদের চোখ এড়িয়ে সমানেই চলতে থাকে দিনের পর দিন। এইসব দুর্গতির অবসানের জন্যে রজনীর মতো সামান্য ব্যক্তিদেরই এগিয়ে আসতে হবে, যাঁদের খবরের কাগজে নাম বের করবার প্রয়োজন নেই, নেতৃত্বের লোভ নেই।

দূরদর্শনের রজনী যদি সারা দেশে হাজার-হাজার রজনীর জন্ম দেয়, যদি সর্বত্র 'রজনী মহিলা সমিতি', 'রজনী নাগরিক সংস্থা' ইত্যাদি গজিয়ে উঠতে আরম্ভ করে তা হলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে দুর্গতির ভার খানিকটা লাঘব হতে পারে।

আরবদেশে বুদ্ধিজীবী

আরবদেশ একদা বিশ্বসংস্কৃতির এক পীঠস্থান ছিল, মানবজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডারে আরবদের দান চিরদিনের জন্যে উত্তরপুরুষদের ঋণী করে রেখেছে। সে ঋণের পরিমাপ করা অসম্ভব। গণিতে আরবদের দানের কথা কে না জানে? 'আলজেব্রা' শব্দটিই তো আরবদের কাছ থেকে পাওয়া। বলা যায়, আরব গণিতজ্ঞদের (যথা ওমর খৈয়ম) কাছ থেকেই পাশ্চাত্য জগৎ গাণিতিক হিসেবনিকেশের কৌশল শিখেছে।

এইসব কথা স্মরণ করেই দুঃখের বিশেষ কারণ ঘটে যখন দেখতে পাই এখনকার দিনে আরবজগতে বুদ্ধিজীবীরা কী রকম অবস্থার মধ্যে আছেন।

সম্প্রতি ইনটারন্যাশন্যাল হেরালড ট্রিবিউন পত্রিকায়, নিউ ইয়রক টাইমস ম্যাগাজিন থেকে গৃহীত একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বর্তমান আরব বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তা উদ্বেগজনক।

যথা : সুদানের রাজধানী খারতুমে গত জানুয়ারির এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে ৭৬ বছরের এক বৃদ্ধকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। সেই বৃদ্ধ, মোহাম্মদ তাহার, দেশে ইসলামিক আইন যেভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তার সমালোচনা-সম্বলিত একটি পুস্তিকা বিতরণ করেছিলেন। সেই পুস্তিকায় তিনি এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে হাত-পা কেটে ফেলা, চাবুক মারা, ইত্যাদি যেসব নৃশংস শাস্তি অপরাধীদের দেওয়া হয় তাতে ইসলামের আত্মাকেই বিকৃত করা হয়। সুদান সরকারের চোখে, এই কথা বলা ইসলাম-বিরোধিতা। তার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

অথচ এই আরবজগতে একদা কবি, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা সম্মানের অধিকারী ছিলেন। আজ তাঁদের ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে, তাঁদের বিপন্ন করা হচ্ছে। কারা এ কাজ করছে? আরবদের দেশে-দেশে কারা বুদ্ধিজীবীদের প্রধান শত্রু?

নিউইয়রক টাইমস ম্যাগাজিনের উক্ত বিবরণ অনুযায়ী সর্বপ্রধান প্রতিপক্ষ, সনাতনপন্থী ধর্মীয় নেতারা, যাঁরা ইসলামীয় ধর্মগ্রন্থের সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁরাই ধর্মাধর্মের বিচার করেন, তাঁরাই 'আল-সিরাত আল-মুস্তাকিম'-এর, অর্থাৎ 'সোজা রাস্তাটি' কোন্‌টি তার বিচার করেন। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা মানেই ধর্ম-বিরোধী বলে চিহ্নিত হওয়া। গোঁড়া সনাতনপন্থী ধর্মমতের যে উত্থান এখন দেখা যাচ্ছে তার ফলে শুধু পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি এবং ভালো-মন্দ-বোধ যে বর্জিত হচ্ছে তাই নয়, ইসলামের মধ্যে বর্তমান কালের উপযোগী যে প্রবণতা এবং ধারা নিহিত আছে, সেটাও বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

বুদ্ধিজীবীদের প্রধান শত্রু এই গোঁড়া ধর্মীয় উগ্রপন্থা। দ্বিতীয় শত্রু কারা? শুনলে অনেকে অবাক হবেন, দ্বিতীয় শত্রু 'সমাজতান্ত্রিক' আরব দেশসমূহের, অর্থাৎ সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেনের নেতারা, যাঁরা বৈপ্লবিক মতবাদ মুখে প্রচার করে করে থাকেন। তাঁরা নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী আরেক ধরনের 'সোজা রাস্তা' বেঁধে দিয়েছেন। সে রাস্তা ছেড়ে যদি কেউ এদিক-ওদিক যায়, তার শাস্তি কারাবাস, নির্বাসন, উৎপীড়ন, মৃত্যু।

তৃতীয় শক্তিশালী শত্রু সৌদি আরবের এবং পারস্য সাগরের উপকূল শেখ-শাসিত রাজ্যগুলির পেট্রো-ডলার-সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। সেখান থেকে সনাতনপন্থী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মতবাদসমূহ প্রসারিত হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে। এই পেট্রো-ডলারের শক্তিও এখন কম নয়। এই অস্ত্র দিয়েই কাবু করা হচ্ছে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হবার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে।

আমেরিকার জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যাঁর জন্ম লেবাননে এবং যিনি এখন, আরও অনেক আরব বুদ্ধিজীবীর মতো, আমেরিকায় বসবাস করছেন, বলেছেন —"আজকের আরব জগতে বুদ্ধিজীবীদের হয় লাঠির ঘায়ে কাত করা হচ্ছে, নয় তো লোভ দেখিয়ে বশ করা হচ্ছে।"

অতীতে মিশর ছিল আরবদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। সেখানেও বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা থেকে-থেকে অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। তাঁদের অনেকে দেশত্যাগী, গত কুড়ি বৎসরে অনেকে জেল খেটেছেন। বর্তমান প্রেসিডেনট হোসনি মুবারক গণতান্ত্রিক ধারা বহাল রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা যেন অতীতের সেই গৌরবের দিনগুলির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

ইউসুফ ইদ্রিস মিশরের একজন অগ্রগণ্য নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক। তিনি বলেছেন, "কায়রো ছিল আরব-দের সাংস্কৃতিক মক্কা। গত সপ্তাহে আমার এক বন্ধু, একজন কবি, কায়রোতে এসে ভাবলেন একটি ভালো নাটক দেখবেন, ফিলম দেখবেন, সংগীত শুনবেন। কিন্তু এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের শহরে তিনি দেখবার মতো কিছুই পেলেন না।"

মিশরের এক সংবাদপত্র-সম্পাদক বলেছেন, মিশরের বুদ্ধিজীবীদের বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিল আরব দেশগুলি। প্রেসিডেনট সাদাতের জেরুজালেম যাত্রা এবং ১৯৭৯ সালে ইজরায়েলের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আরব দেশসমূহ যে মিশরকে একঘরে করল, তাতেই মস্ত বড়ো চোট খেল আরব বুদ্ধিজীবীদের সচ্ছলতা।

ধর্মীয় জঙ্গী উগ্রতাও সেখানে সমস্যার সৃষ্টি করছে। কিভাবে তার মোকাবিলা করা উচিত সে বিষয়ে দুটো মত দেখা যায়। অনেকে বলেন, প্রকাশ্যে না বললেও গোপনে বলেন, ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কিন্তু প্রেসিডেনট মুবারক মনে করেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ ধর্মীয় উগ্রতার প্রসারে বাধা দেবে। চরমপন্থীদের দমন করতেই হবে, কিন্তু যারা অপেক্ষাকৃত নরম তাদের প্রকাশ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার শামিল করে আনলে, তারা আর গোপনে-গোপনে ক্ষতিকারক কার্যে লিপ্ত হবে না।

শেষ পর্যন্ত এই পথেই ধর্মীয় উগ্রপন্থাকে দমন করা যাবে কিনা, সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। তবে, একদিকে যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামি আছে আরেক দিকে তেমনি আরব জগতে আধুনিকতা অভিমুখে একটা প্রবণতাও তলে-তলে কাজ করছে, তাতে সন্দেহ নেই। মিশর থেকে বুদ্ধিজীবীরা যে আধুনিকমনস্কতার প্রসার করে এসেছেন, এখন রাজনৈতিক কারণে তাতে ভাঁটা পড়লেও, আশা করা যায় ভবিষ্যতে আবার আরব জগতে তার সমাদর হবে।

২৬-৭-১৯৮৫

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সিনেমা

'আদমি ঔর আওরত'
—এক সহিষ্ণু অভিযাত্রার প্রাণময় কাহিনী

গ্রামাঞ্চলের একটি প্যাসেনজার-বাস। তাতে উপছে পড়ছে ভিড়। একটি মেয়ে সম্ভবত এই প্রচণ্ড মারমুখী যুদ্ধে পরাস্ত, তাই সে নিতান্ত নৈরাশ্য আর ব্যর্থতার গ্লানিতে নুয়ে-পড়া চোখে সেদিকে তাকায়। পরমুহূর্তেই দেখা যায়, যাত্রীদের ঠেলাঠেলি, গালা-গালি আর কৌশল-কোলাহলকে সাথী করেই বাসটি ছুটছে তীরবেগে। মেয়েটি পড়ে থাকে—কারণ, প্রতিযোগিতায় সে বিফল।

ভকিলগঞ্জ নদীর ওপারের শহর। সেখানকার হাসপাতাল তার গন্তব্য। মেয়েটিকে তাই হেঁটে-হেঁটে এগোতে হয়।

বনবাদাড় - খানাখন্দ - পাথর-ইটের ছোটো-ছোটো টিলা পেরিয়ে হনহন করে এগিয়ে যায় একদল সন্দেহে সমর্থ মানুষ। মেয়েটি পড়ে থাকে পেছনে—পরিতাক্ত, অসহায়, হাঁটুভাঙা।

এ ছবির 'আদমি' চরিত্রবান নয়—পরের মেয়ে-বউকে ব্যবহার করার কুখ্যাতি তার আছে। ছবির শুরুতেই গ্রামের মানুষদের টুকরো কথার মধ্য দিয়ে পরিচালক জানিয়ে দিয়েছেন এই কথা। জনহীন প্রান্তরে একা মেয়েটির দিকে লালসার হাত বাড়াতে গিয়ে তার চোখে পড়ে—মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা।

'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', আর মানুষ যতক্ষণ বিশ্বস্ত, ততক্ষণই জীবনত আর জঙ্গম, প্রষ্টার সৃষ্টি—পরিচালক তপন সিংহ এই সত্যে আন্তরিকভাবে প্রত্যয়শীল। তাই, যে-মরদ নারীকে সম্ভোগের বস্তু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারত না, সে যেন লহমায় বেঁচে-থাকার আশ্বাসের এক অফুরান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। একা বিপন্ন মেয়েটির জীবনকে সে টেনে নিয়ে চলে, অনাগত অথচ প্রতীক্ষারত একটি মানবজীবনকে অটল সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সে আবাহন করে।

দীর্ঘ পথ উপলাকীর্ণ। শত্রুপাকার প্রস্তর। অনর্ঘুষিত প্রান্তর। কোথাও কাঁটাঝোপ। মেয়েটি সন্তানবহনের দুর্বহ ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে। তার পথচলার সামর্থ্যকে টিকিয়ে রাখে কেবল 'আদমি'—একটি মুমূর্ষু প্রাণকে আশ্বাসে, জীবনের আশার বাণীতে সঞ্জীবিত রাখে সে। এ যেন চারপাশের ক্ষিপ্ত ঝড়ের বিরুদ্ধে একটি ক্ষীণ প্রদীপশিখার অসম লড়াই।

এখানেই লজ্জিত হয় আমাদের মতো সক্ষম মানুষেরা ; লজ্জা পায় আমাদের নড়বড়ে সিদ্ধান্ত ; সহিষ্ণুতার ঘাটতি ; সংগ্রামে পরাঙ্মুখতা ; অপূর্ণ কামনার জন্যে অহেতুক অভিমান, অভিযোগ। হয়তো-বা নৈরাশ্য বা দুঃখবিলাসের অভ্যাসকে বিদ্রূপে বিক্ষত করতে চান পরিচালক। তার বদলে, একটা মহত্তর দৃষ্টান্ত হিসেবে 'আদমি'র মধ্যে সংকল্পের ঋজু টানকে পরীক্ষা করেন। যত বার হার মানতে চায় মেয়েটি, তত বার প্রাণের অমোঘ আশ্বাস আনে পুরুষ।

ছবিতে এই সংকটদীর্ণ পথচলার কাহিনী দীর্ঘ অনুপুঙ্খ। কেবল দুর্গম পথে চলাই নয়, আসন্নপ্রসবা সেই নারীকে নিয়ে পুরুষটি একটি অশান্ত নদীস্রোতও পেরিয়ে যায় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে।

অতর্কিতে দু-একটি ফ্ল্যাশব্যাকের ধাক্কায় এই তপস্যার বিনিসুতোর জাল যেন ছিঁড়ে যায়। আমাদের মনে হয়েছে, সন্তানসম্ভবা রমণীটির গার্হস্থ্য পরিস্থিতিটি ঈষৎ স্থূল ভঙ্গিতে বোঝানোর অতিসরলীকৃত আকর্ষণটাকে পরিহার করলে ছবির প্রতীকধর্ম

আরও অনেক বেশি লিরিক্যাল এবং আবেদনময় হতে পারত।

শেষ পর্যন্ত ভকিলগঞ্জের হাসপাতাল তাদের কাছে ধরা দেয়।

পৃথিবীর লড়িয়ে একরোখা মানুষেরা রাগিণ হয়। তারা সইতে পারে অনেক, কিন্তু হাসপাতালের কেরানির গা-জ্বালা-করা গাফিলতি সইবে কেন? ভকিলগঞ্জ নামের মধ্যে সেই মেটাফর। প্রশাসনের মিথ্যে সংবিধান আর ঝুটো আইনের আওতায় বন্দী আমরা; আদালত, বিচার, নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য—এসব স্রেফ পৃথিবর মলাটে বন্দী মৃত অক্ষরমালা। তেমনই যে প্রহসন, তার নাম ভকিলগঞ্জ।

কিন্তু বাঁচার আর বাঁচানোর আদিম আহবে অভ্যস্ত এই গোঁয়ার মানুষটি ঘুণধরা সমাজের দুর্বাবিহারের কাছে মাথা নোয়াবে কেন? তাই কিছুটা জবরদস্ত আয়োজনের মধ্য দিয়ে আসে ভাবী মানুষটি। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, আর সদ্য-মা-হওয়া নারীটি বিষাদ-সুখের আবেশমাখানো কণ্ঠে তার পথের বন্ধুকে কামনা করে আকুলভাবে। কিন্তু পথের সারথিকে তো স্থবির হলে চলবে না। বাসা বাঁধা তো তার কাজ নয়, তার কাজ পথচলা আর দিশা-হারা মানুষকে দুস্তর পথ পার করে দেওয়া। এইরকমই একটি চিন্তার ফিকে আভাস দিয়ে পরিচালক যবনিকা টানেন।

ছবিটি দেখতে-দেখতে গরকির ছোটোগল্প 'বারথ অব এ ম্যান' মনে পড়ছিল। গল্পটির রচনাকাল যখন তিনি ভোলগার তীরে ভবঘুরে পরিব্রাজক। সম্ভবত কেতাবি ভঙ্গিতে কমিউনিজমে দীক্ষা নেবার আগে। সুতরাং বাস্তব সম্ভাব্যতার কড়া পাহারার দিকে নজর খানিকটা আলগা করেই কবিতার সরল রোমানটিকতা আর শুদ্ধ শিল্পের অচল প্রত্যয়ের টানা রাস্তায় তিনি দৌড় করিয়েছিলেন গল্পটিকে। এ গল্পের নায়ক এক পান্থ গর্ভিণীর জঠরের অন্ধকার থেকে স্ব-হস্তে পৃথিবীর মুক্ত আলোয় মুক্ত করে আনে এক মুমূক্ষু শিশুকে। দাঁত দিয়ে ছিন্ন করা হয় নারীর গিঁট। এমন এক দুঃসাহসী কাজ, অথচ চারি-পার্শ্বিকতার সঙ্গে এমন খাপ খেয়ে যায়, অসম্ভব অবাস্তব বলে কিছুমাত্র সংশয় জাগে না।

তপন সিংহের ছবিটির পরিণাম এরকম হলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে হয়তো বিতর্ক উঠত। কিন্তু শুদ্ধ শিল্পের আবেদন তো বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। যুক্তিতর্ক বা চুল-চেরা বিশ্লেষণ নয়, ফেথ বা অন্তর্দৃষ্টির কাছে তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আধুনিক যুগে শিল্প যতই গণিতের কাছাকাছি আসুক না কেন, উভয়ের মধ্যে বিরোধ তো ঘোচবার নয়। তাই হিসেবি বুদ্ধিতে পারংগম দর্শক বা সমালোচকের কাছে এরকম পরিণাম সংগত হয়তো হত না, কিন্তু নিষ্কলুষ-বুদ্ধি শিল্পপ্রাণের আবেগ এবং রস-বোধকে তা তৃপ্ত করতে পারত।

তবে, মহুয়া রায়চৌধুরীর অভিনয়ে যথেষ্ট গ্রাম্যতার অভাব মাঝে-মাঝে পীড়া দেয়। গর্ভবতী রমণীর হাঁপানো, পথক্লান্তির নুব্জ দীর্ঘশ্বাস আর প্রসববেদনার আর্ত চিৎকার প্রায়শই একাকার হয়ে যায়। সদ্যোজাত শিশু ছিটের জামা পরে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে।

আর অমল পালেকর। তাত্ত্বিক অর্থে তাঁকে গডফাদারই বলি, প্রতিবেশীই বলি, বা একজন সহিষ্ণু কর্তব্যপরায়ণ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষই বলি, আদমির ভূমিকায় তিনি অনবদ্য। চরিত্রটির প্রবণতার সঙ্গে তার ওতপ্রোত জড়িমা, সেই আচ্ছন্নতা, সেই গ্রস্ততা থেকে হুবহু বেরিয়ে আসা, কাঙ্ক্ষিত সফলতা-সমেত—ছবিটিতে একটি অতি-রিক্ত মাত্রা যোগ করে।

সম্ভবত, দূরদর্শনের জন্য প্রস্তুত এই ছবিটি তপন সিংহের একটি শ্রেষ্ঠ ছবির মাইলস্টোন হিসেবে মাথা উঁচু করে থাকবে।

বর্ণালী দাস

স্মরণে

সুশীল রায়

সুশীলবাবু বেশ কিছুকাল বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, দেড় দশকের উপর বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদকের কাজও তাঁকে করতে হয়েছে। সুশীলবাবু যখন বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন সে সময়টাকে গ্রন্থনবিভাগের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। পুলিনবিহারী সেন তখন সচিব বা অধ্যক্ষ, অনাদিকুমার দস্তিদার স্বর-লিপি বিভাগের প্রধান, তাঁর সঙ্গে তাঁর সহযোগী শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এ ছাড়া রয়েছেন শ্রীকানাই সামন্ত, রামেশ্বর দে। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তখনো গ্রন্থন-বিভাগের সঙ্গে রয়েছেন। গ্রন্থনবিভাগ তখন নিছক রবীন্দ্রগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে ব্যস্ত নন। রবীন্দ্রনাথের অসংকলিত রচনা সংগ্রহ করে বিষয়ানুগ গ্রন্থ প্রকা-শিত হচ্ছে, 'চিঠিপত্র' খণ্ডশ সংকলিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে, নতুন নতুন স্বর-লিপি প্রকাশিত হচ্ছে, বিভিন্ন গ্রন্থে নতুন সংস্করণকালে গ্রন্থপরিচয় সন্নি-বেশিত হচ্ছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ তখন জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িতে। পুলিনবাবুর নির্দেশে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের সময় প্রকাশনার কাজ ত্বরান্বিত করতে প্রুফ দেখতে গিয়েছি। 'রবীন্দ্র-জীবনী'র সংস্করণ হচ্ছে, তারই প্রুফ দেখতে হবে। কিছু-কিছু তথ্যের সংশোধন বা পরিমার্জনের কাজও করতে হতে পারে। 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রুফকে প্রেসযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব সুশীল-বাবুর। তাঁর সঙ্গেই কাজে বসতে হয়েছে। প্রথম দর্শনে তাঁকে একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল। ঠিক রবীন্দ্র-ঘরানার লোক নন। পুলিনবাবু, কানাইবাবু বা অন্য কয়েকজনের যে ধরনের কাজে ঝোঁক, সুশীলবাবুর বোধ করি তেমন নয়। কথাবার্তায় একটা অলস ভঙ্গি। ও'কে একবার সকালে ঘুম থেকে উঠে কী করেন জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিয়েছিলেন, 'সারারাত ঘুমিয়ে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে, সকালে উঠে একটু বিশ্রাম করতে হয়।' এই ধরনের কৌতুকরসিক্ত উক্তি সুশীলবাবুর সঙ্গে যখনি দেখা হয়েছে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে।

সুশীলবাবুকে নিতান্ত অলস বা কৌতুকপ্রিয় বলেই জানতাম যদি না তিনি একদিন তাঁর ড্রয়ার থেকে কয়েক-খানা হলদে রঙের খাতা বার করে দেখাতেন। দেখে খানিক চমক লেগে-ছিল। শুনলাম তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। এগুলি সেই খাতা। বুঝতে পারলাম তিনি কেন রবীন্দ্র-ঘরানার আপেপাশে থেকেও রবীন্দ্রচর্চায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন নি। তিনি তাঁর ক্ষেত্র বেছে নিয়ে-ছিলেন। ঠিক ঐ সময়েই 'ধূপদী' পত্রিকায় শিলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত মেঘদূত ছেপেছিলেন। পরে সেটিকে সযত্নে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেও প্রকাশ করে-ছিলেন। সুশীলবাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কথা ভেবে। পরে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের নাট্যসংগ্রহ' সংকলন করেছেন তিনি। তার পরিশিষ্টে 'প্রসঙ্গকথা' সংযোজিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীসুকুমার সেন বলেছিলেন, "জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের রচনা ও শিল্পের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে বেশি টানে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক জানতে ইচ্ছা করে।...সুশীলবাবু তাঁর জীবনী-সংগ্রহে যথোচিত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে তৃপ্তি হল না। অনুরোধ করি, তিনি যেন আরও বছর-কয়েক গবেষণা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-মানুষটির জীবনী রচনা করেন।" সুশীলবাবু সুকুমার-বাবুর এ অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

সুশীলবাবু সৃজনশীল ক্ষেত্রেই হাত দিয়েছেন বেশি। তিনি মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে কাহিনীকাব্য 'প্রণয়ীপঞ্চক' রচনা করেছেন। রচনা করেছেন কালিদাসের মেঘদূত খণ্ড-কাব্যের নূতন ভাষ্য 'আলোঘাদর্শন'। লিখেছেন 'অনল-আয়তি'র মতো ঐতি-হাসিক উপন্যাস।

এর বাইরে সাংবাদিকতার সূত্রে কয়েকজন বরণীয় পুরুষের জীবনকথা সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি স্থায়ী কাজ করে গেছেন সুশীলবাবু। তাঁর 'মনীষী-জীবনকথা' গ্রন্থে তিনি তেত্রিশ জন বাঙালি মনীষীর জীবনকথা সংগ্রহ করে গেছেন তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগা-যোগের ভিত্তিতে। বইটি সে কারণে একটি রেফারেন্স গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় হাত না দিলেও তিনি একদা মধুসূদনের পত্রসাহিত্য প্রসঙ্গে কাজ করেছিলেন। মধুসূদন প্রসঙ্গে তাঁর উৎসাহ দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। লোয়ার চিৎপুর রোডে যে বাড়িতে মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্য রচনা করে-ছিলেন সে বাড়িতে মধুসূদনের জন্মোৎ-সব পালনেও অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন সুশীলবাবু।

সুশীলবাবু খুব গভীর বা সিরী-য়াস বিষয়ে গবেষণাত্মক কাজ করতে পারতেন কিনা জানি না, বোধ হয় করতে চাইতেন না। যে কারণে তিনি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' সম্পাদনার চেয়ে কবিতা পত্রিকা 'ধূপদী' সম্পাদনায় উৎসাহ দেখাতেন অধিক। এমনকি একদা কবিতা আন্দোলনের যে অস্বা-ভাবিক জোয়ার এসেছিল তখন 'কবিতা ঘণ্টিকা' প্রকাশ করে তরুণ কবিমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

কবি বা ঔপন্যাসিক হিসেবে সুশীল-বাবুর মূল্যায়ন করার ক্ষেত্র এ নয়।

এখানে উল্লেখ করব সুশীলবাবুর একটি অসাধারণ সংকলন-গ্রন্থের প্রসঙ্গ। গ্রন্থটি এখন সুলভ নয়। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে সুশীলবাবু প্রকাশ করেন তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'বঙ্গপ্রসঙ্গ'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন, "আমাদের হালের প্রবন্ধ-সাহিত্যে ভাবের চেয়ে ভঙ্গি বেশি। চিন্তার অভাব পূরণ করতে চাইছে ভাষার চাতুরী।...এই সৌখিন সাহিত্য-রচনার লোভ ও পড়ার আসক্তির একটা প্রতিষেধক আমাদের প্রাচীন প্রবন্ধ-সাহিত্যের চিন্তার গভীরতা ও সূক্ষ্মতা, ও যাকে ইংরেজিতে বলে হাই সিরীয়সনেস তার সঙ্গে পরিচয়। সেসব লেখা এখন সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা প্রয়োজন। তার শ্রেষ্ঠ উপায় এ সব প্রবন্ধ বেছে বেছে নানা সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রকাশ।...শ্রীসুশীল রায়-সম্পাদিত 'বঙ্গপ্রসঙ্গ' বইখানিকে সেই জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।...যে সকল পাঠক এই সংগ্রহ-গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধ প্রথম পড়বেন তাঁরা সম্ভব চমৎকৃত ও বিস্মিত হবেন।" ১৮২১ সালে লেখা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' থেকে সংকলিত রামমোহনের 'আদিবাণী' থেকে বিনয়কুমার সরকারের 'বাড়তির পথে বাঙালি' (১৯৩৩) থেকে সংকলিত 'হাজার-ভুজা বাঙালি' সর্বসাকুল্যে আটত্রিশটি বঙ্গপ্রসঙ্গ বাঙালি এবং বাঙলা সম্বন্ধে আগ্রহী যাঁরা তাঁদের কাছে অবশ্য পাঠ্য। গ্রন্থটির পরিকল্পনা এবং বিশেষ করে পরিশিষ্টের লেখক-পরিচয় স্মরণ করিয়ে দেয় যে এ সম্পাদনা সুশীলবাবুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়, বরং দীর্ঘদিন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এ বিদ্যা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠেছিল। (জন্ম ১৯১৫, মৃত্যু ১ জুলাই, ১৯৮৫)।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন একজন কবি ছিলেন যিনি কখনও খুব বেশি লেখেন নি অথচ কবিতা-রচনার ধারা যাঁর ছিল অব্যাহত শেষ দিন পর্যন্ত, কেননা জীবন এবং কবিতা তাঁর কাছে ছিল অভিন্ন—এবং তাঁর জীবন যেমন ছিল স্বচ্ছ, অনন্য, গোত্রসম্পর্কহীন, একমাত্র মনুষ্য-নামক নিরুপাধিক গোত্রের যিনি ছিলেন অধিকারী—ঠিক তেমনি তাঁর কবিতার ভাষাও ছিল, অন্তত যখন তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ একজন কবি, তখন তাঁর ভাষাও ছিল স্বতন্ত্র, যা তাঁর যে-কোনো কবিতাকে অনায়াসেই 'বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের' কবিতা বলে চিহ্নিত করার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত তাঁর কবিতার উপর কতটা পড়েছে—তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তিনি ছিলেন সমাজ-মানসের কবি—এবং যখনই সমাজজীবনে কোনো প্রত্যয়ও ঘটেছে—নতুন কোনো দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়েছে—তখনই তাঁর বুক কেঁপে উঠেছে—কবিতায় ভাষিত হয়ে উঠেছে তার বেদনা। সুতরাং তিনি ছিলেন একজন ধ্রুপদী কবি—যিনি ধ্রুপদী হয়েও আজন্ম রোমানটিক কেননা তিনি সমাজজীবনের সুন্দর স্বপ্নকে রক্ষা করে গেছেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। এই সমাজ কেবল পশ্চিমবঙ্গের বিপন্ন সমাজ নয়—বা কেবল ভারতবর্ষের বিপন্ন মানুষের সমাজ নয়—সমগ্র দুনিয়ার প্রত্যারিত বিপন্ন মানুষের সমাজ বলা যেতে পারে। সেইহেতু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের পরে আর-একজন সার্বজনীন কবি—প্রতিভার পরিমাপে না হোক, অন্তত সার্বজনীনতার বোধে—মৌল ভালোবাসা এবং প্রত্যয়ে। ১৯৮২ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্তির দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন, তাঁর ভক্ত পাঠকের এই পুরস্কার তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান বলে মেনে নিলেন—কিন্তু রবীন্দ্রপুরস্কার পাবার অনেক আগে থাকতেই তিনি সংস্কৃতিমনা মানুষের কাছে একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে সমাদৃত। ১১ই জুলাই ১৯৮৫ মধ্যাহ্নে ৬৫ বৎসর বয়সে এই কবির জীবনাবসান সমস্ত কাব্যপ্রেমিককে শোকাহত করেছে।

তাঁর কবিতায় কারিগরি ছিল সামান্য, কেননা হৃদয়ের ভাষায় অলংকারের প্রয়োজন খুব কম। তাঁর কবিতা তীব্রভাবে সমাজ-সচেতন হওয়া সত্ত্বেও স্লোগানধর্মী হয়ে ওঠে নি। একসময়ে যখন দলগত রাজনীতি এবং বিশেষ একধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির সমর্থনে পশ্চিমী কবিতা এবং এদেশীয় কবিতা সোচ্চার, তখন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাংকেতিক পরিভাষাকে গ্রহণ করেছেন, তার ফলে ঝড় থেমে গেলেও (কোনোদিন যদি ঝড় থামে) তখনও তাঁর এই মৃদুভাষ কবিতাগুলির কণ্ঠস্বর শোনা যাবে—পাঠক আগ্রহে বার বার করে পড়বে। কোনো-কোনো কবিতা য়ুরোপীয় একসপ্রেশনিস্ট টেকনিকের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় স্বর্গীয় সুখের উপমা নেই—তিনি এই পৃথিবীর মানুষ—মনুষ্যসমাজের অন্তর্গত—স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে থাকেন—সাধারণ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য যাঁর কাম্য, এবং কাম্য সেই পরিবেশ যা হৃদয়ের প্রেম ভালোবাসা মৈত্রী এবং সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে রাখতে পারে। তিনি জানেন—হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন—আরই সমস্ত সংস্কৃতির মূলাধার। অথচ সেই আর যা বৈজ্ঞানিক যুগে সব মানুষের পক্ষেই সুলভ হতে পারত, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্লভ। আকাশ বাতাস 'হা-অন্ন, জো অন্ন' চিৎকারে ক্লিন্ন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মানুষে-মানুষে বঞ্চনা, লুণ্ঠন, রক্তাক্ত সংগ্রাম—মানুষের মনে পরস্পরের প্রতি এত ঘৃণা—এ কোন নরকে আমরা বাস করছি! মানুষের স্বদেশ আজ মানুষের কাছে বিভীষিকা, কেননা বিদেশী লুণ্ঠনকারীর হাত সরে গেলে তার জায়গায় স্বদেশী দস্যুরা ঢাকা নখরযুক্ত হাত সদ্যোজাত শিশুর দিকে প্রসারিত।

১৯৪৪ সাল থেকে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা—তাঁর কবিজন্মের তারিখ হয়তো তার কিছু আগে এবং ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দশ বৎসর তিনি এক ধরনের কবিতা লিখেছেন যা প্রেমের সারল্য তন্ময়তা এবং দেহের ভালোবাসার পবিত্রতা নিয়ে লেখা—যা তাঁকে ও'রাওদের জীবনযাত্রা এবং ভাষার দেশের করে তোলে। আমরা যে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত তাঁর জন্ম যেন ১৯৫০-এর দশকে। তিনি স্বাধীনতা-উত্তর যুগের কবি। স্বাধীনতার পর যে দেশনির্মাণের অধ্যায় শুরু হয় তার মধ্যে যে প্রতিপদে প্রতারণা অনুপ্রবেশ করেছে কবির চোখে সেটা ধরা পড়েছে। কিন্তু কবি বিপ্লবীদের তালিকায় নিজের নাম লেখাতে পারেন নি।

একজন স্বাপ্নিক কবি রূঢ় আঘাতে যেভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়ে, সেই বিমর্ষতার গাঢ় প্রলেপ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় একটা নতুন স্বর সংযোজন করল—তাঁর কণ্ঠস্বর গেল পালটে, তাঁর ভাষাও গেল বদলে। এক নতুন কবির জন্ম হল। সেই কবি স্বদেশের হাত ধরে প্রতি পদক্ষেপে হেঁটেছেন—রক্তাক্ত পায়ে—অনেক পথ মাড়িয়েছেন। কিন্তু হাত ছাড়েন নি। তিনি জানেন না কোনোদিন স্বদেশকে তাঁর স্বপ্নের দেশে পৌঁছে দিতে পারবেন কিনা—যে স্বপ্নের দেশ তিনি পেছনে ফেলে এসেছেন—শেষ কাব্যগ্রন্থ 'আমি ভারতবর্ষ তাদের' সেই বিশ্বাসে অমলিন।

"এখন শুধু এতটুকু কথাই বলতে পারি,
মানুষের আশা অবিনাশী। চারদিকের
নরকের মধ্যেও মানুষ তাই স্বপ্ন দেখে।
তখন স্বয়ং মৃত্যু এসেও যদি তার সামনে
দাঁড়ায়—সে তাকে সংস্রেজ পথ ছেড়ে দেয়
না—প্রশ্ন করে।" কবির উক্তি :
১লা জুলাই, ১৯৮০

অনেক আগেকার একটি কবিতায় তাঁর মানসিক বিষণ্ণতা পরিস্ফুট হয়েছে একটি প্রতীকে—

মনের সারস হাঁটে
মন্থর সন্ধ্যায়
একাকী
মনের সারস হাঁটে
একাকী। গোধূলিযাত্রা, ১৯৫৬

ব্যঙ্গ তার এক বিশেষ অস্ত্র : 'কবি গোবিন্দদাস' কবিতায় তাঁর ব্যঙ্গ উছলে উঠেছে :

যে কবি তাঁর মনুষ্যত্বে
অটল ছিলেন সর্বনাশে
তাঁর চিতায় মঠ দিতে কেউ
ছিল না এই বাংলাদেশে
যাঁরা ছিলেন দেশের মানুষ
তাঁদের তখন অনেক কাজ।
১২ই অগস্ট, ১৯৭৬

অন্তরের আবেগ যখন বাগে আনতে পারেন না, তখন যেন মাতলামোকে আশ্রয় করতে চান :

গাছে ফুলের কুঁড়ি না ধরতেই
তুষারপাত শুরু হয় ;
পাখিগুলির চোখ ফুটবার আগেই
শীত এসে যায়।
একটি স্বাধীন দেশের বুক থেকে
যখন উলঙ্গের আর্তনাদ
আর নিরন্নের চিৎকারই শুধু
উচ্চারিত হতে থাকে
তখন আমাকে যত মদই গেলানো
হোক না কেন
কেউ বলতে পারবে না
আমি কোন স্বর্গকে নরক বানাচ্ছি।
১২ই জুলাই, ১৯৬৮

ক্রোধ ফেটে পড়েছে একের পর এক টুকরো কবিতায়—মানুষ-খেকো বাঘেদের বিরুদ্ধে :

মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়
হেঁড়ে গলায় ঘর দুয়ার কাঁপায়।
যখন তারা হাঁক পাড়ে বাপস্ রে
আকাশ যেন মাথায় ভেঙে পড়ে
ভয়ের চোটে খোকাখুকুরা হাঁপায়।
মানুষখেকো বাঘেরা বড় লাফায়।
নভেম্বর ১৯৬০

এই শিরোনামের আর-একটি কবিতা—'মাতলামো', 'আই ডোনট প্রোভোক, আই অ্যাম ড্রানক'—একসপ্রেশনিস্ট টেকনিকে তাঁর ঘৃণা ব্যঞ্জিত হয়েছে। দুর্মূল্যতা, মুদ্রাস্ফীতি তাঁর গাত্রজ্বালা সৃষ্টি করে

কিনবি কি তুই তিন পয়সায়
দুই পয়সায় এক পয়সায়
আমার আলাদিনের পিদিম কবিতা?
তুই বলিস : 'না!
এক পয়সার এখন অনেক দাম
দুই পয়সা থাকলে তামাম
পৃথিবী কিনতাম।' ১৯৭১

'হা অন্ন, হা অন্ন' এই ছিল তাঁর মুখের ভাষা— নিরন্ন বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি কবি :

রোদ না উঠতে, ফ্যান দাও!
রোদ চলে গেল, ফ্যান দাও!
ঘুমের মধ্যে ভয়ে
পা দুটি সরিয়ে রাখি।
১১ নভেম্বর, ১৯৭৬

নিরন্ন শিশুর ক্রন্দন তাঁর হৃদয়কে দুটুকরো করে দিয়েছে—

ঘর ফুটপাত
আহার বাতাস
ন্যাংটো ছেলেটা
দেখছে আকাশ।
২৪শে জুলাই, ১৯৭৮

ব্যঙ্গ দিয়ে তিনি খান খান করে কেটে ফেলতে চান

আলো জ্বললে স্বদেশ,
অন্ধকারও স্বদেশ।
মন্ত্রী যখন ন্যাংটো ছেলের
কান ম'লে দেন

বুঝতে পারি
চতুর্দিকে সভা করছে স্বদেশ! ১৯৭৭

আর একটি নিরন্ন দিনের চিত্র : দাউ দাউ জ্বলছে উনুন। ১৯৭৭

নিরন্নতা যেমন জাতির নিরবিচ্ছিন্ন অভিশাপ, আর-এক অভিশাপ সেচের জলের এবং পানীয় জলের অভাব।

তেমনি দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, ভায়ের বুকে ভায়ের আমূল বিশ্ব ছুরি কবিকে আতঙ্কিত করে তোলে। বলা যায়, এইসব সাময়িক অথচ ঐতিহাসিক ঘটনায় বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের আর কোনো কবিকেই আমরা এতটা বিচলিত দেখি নি : কবিতার পর কবিতায় তাঁর ক্রোধাগ্নি বিমূঢ় মুখের প্রতিফলন দেখি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহে পাঠক এইরকম অনেক কবিতা পাবেন—আমি একটি মাত্র কবিতার উল্লেখ করছি :

দুটি মানুষ দুই পথে চলে গেল ;
যতক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে
থাকা যায়
ওরা, অপেক্ষা করে ছিলো। ১৯৭৮

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে, মৃত্যুর পর কুড়ি বছর' কবিতায় বলেছেন

ভীষণ সব সর্বনাশগুলি
দেখতে হয় নি, তোমাকে চোখ মেলে ;
জ্বলতে হয় নি ছেচল্লিশের যন্ত্রণায়,
মার এবং মহামারীর
ভীষণ রোগ রক্তে নিয়ে
দেখ যখন সন্তানের হিংসা ক্ষোভ,
মায়ের দেহের মাংস নিয়ে
কাড়াকাড়ির নরক।—
দেখতে হয় নি সাতচল্লিশে
লুম্পিনীর চেয়ে ইতর
ভারত জুড়ে দেশভাগের উত্তেজনা।

এইসব দেখে কবির দুচোখ জ্বলে গেছে। কখনও যদি মেজাজ একটু নীচু পর্দায় নামাতে পারেন, তখন চোখে ভেসে ওঠে টেলিভিশনের স্বপ্ন :

রোজ তারা দেখে ট্যালিভিশনে খেলা
দেখে অলিম্পিকের দৌড়ঝাঁপ
তাদের দেশ পায় নি কোনো মেডেল ;
তাদের দেশে খেলার মাঠ নেই।
অগস্ট, ১৯৭৬

স্বাভাবিকতার ফিরতে পারলে সামান্য চার পঙ্‌ক্তিতে ছবি আঁকেন পৌষের

সারা দুপুরে পাখিগুলি
রোদ পোহায় ;
সমস্ত রাত পাখিগুলি
শীত তাড়ায়।
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৭

আবার আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কথা ভেবে কবি বিনিদ্র রজনী যাপন করেন—কিন্তু তিনি আরও বেশি ভাবিত মানুষের ক্লীবত্বে, যেমন স্বদেশে, তেমনি বিদেশে—

আমাদের স্বপ্নগুলি
বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের মতো
সমস্ত দিন, সমস্ত রাত যাকেই
সামনে পায়
তারই পা জড়িয়ে ভিক্ষা চায়
যে দৃশ্য আমরা জন্ম থেকে
দেখে আসছি।
গোপাল মৈত্রকে স্মিরচিত্র—
২৮শে জুন, ১৯৭৭

কখনও স্বদেশের মানুষের প্রতি, কখনও সমগ্র মানবসমাজের প্রতি এই অসহ আত্মগ্লানি, অবক্ষয়কে রোধ করার জন্য উঠে দাঁড়াতে বলেছেন—

তুমি মাটির দিকে তাকাও,
সে প্রতীক্ষা করছে ;
তুমি মানুষের হাত ধরো,
সে কিছু বলতে চায়। ১৯৭০

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আশ্চর্য কবিতা সৃষ্টি করেন সেই অসহায়তার বোধ থেকে

দীর্ঘ দেবদারুবীথি আজ কোনো
আকাশ দেখে না।
এখন আকাশ জুড়ে নষ্ট চাঁদ,
শুক্র হবে পিশাচের নাচ,
এখন বাতাস দগ্ধ দুঃখকলা দিয়ে
পোষা সাপের নিঃশ্বাসে...
ভাল আছে—নিরাপদ—আমাদের
মাননীয় মানবসমাজ॥ ১৯৭১

মঙ্গলকাব্যের বেহুলা-লখীন্দরের মিথ আধুনিক যুগজীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। অনেকগুলি কবিতা-গ্রন্থের রচয়িতা—প্রত্যেকটির নামের মধ্যেই একই ধ্বনি উচ্চারিত—তবু সব ধ্বনি মিলে একটি হৃদয় ও মননকে ঘোষণা করছে—তাই তাঁকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। আমাদের বুকের কাছাকাছি এই কবি—আমাদের বুকের ভাষায় যিনি কথা বলেন, আশা করব আমাদের মগজে সে কবি অনেক দিন স্থায়ী হবেন।

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

দেবপ্রসাদ ঘোষ

দেবপ্রসাদ ঘোষের মৃত্যু হলো একানব্বই বছর বয়সে।

আমাদের কৈশোরে প্রায় কিংবদন্তির মতো শুনেছি তাঁর পাণ্ডিত্যের কাহিনী, যে-পাণ্ডিত্য কেবল অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের যৌবনে, কিছুটা হততকিত ভাবেই, দেখেছি তাঁকে রাজনৈতিক ভূমিকায়, যে-রাজনীতির ছিল একটা আক্রমণাত্মক রক্ষণশীল চরিত্র। তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষতা থেকে কোনো-এক সময়ে অনেকদূরে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছেন তিনি, অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মানুষ ছাড়া আর কেউ জানতেন না যে বৈঠকখানা অঞ্চলে অসুস্থ শরীর নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি অনেকদিন ধরে, পুরোনো কিছু স্মৃতি আর কিছু বই-পত্রের মাঝখানে। মৃত্যুর খবরটা কোনো কোনো মানুষকে হয়তো নতুন করে একবার জানিয়ে যাবে যে তিনি বেঁচে ছিলেন এতদিন।

বরিশালে, রজমোহন স্কুল আর কলেজের খ্যাতিমান ছাত্র ছিলেন দেবপ্রসাদ, কলকাতার রিপন কলেজ বা রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রখর অধ্যাপক ছিলেন, কিংবা একসময়ে হিন্দুত্বের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে 'হিন্দু কোন পথে' বা 'সতের বৎসর পরে'র মতো দু-একটি বইও লিখেছিলেন, এসব কথা হয়তো আমাদের ভাবনা থেকে দূরে সরে যাবে, কিংবা হয়তো কারো কারো তা মনে থাকবে কেবল রক্ষণশীল চিন্তার কোনো ক্ষণিক ইতিহাস হিসেবে। কিন্তু তাঁর যে বইখানি আরো কিছুদিন আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে মনে হয়, তার নাম 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান', কেননা বাংলা বানানের শৃঙ্খলাবিধান নিয়ে একটি নবীন এবং স্বাস্থ্যকর উত্তেজনা এই দশক জুড়ে আমরা লক্ষ করছি দেশে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায়, বানান-ব্যাপারে একটা নব-বিধানের প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল, আর তাকে ঘিরে তর্কে আলোচনায় বেশ তপ্ত হয়ে উঠছিলেন অনেকেই। 'বাংলায় সব-রকমই লেখা যায়' কিংবা 'এটা রবীন্দ্রনাথের বানান'—যে-কোনো ভুল বানান প্রসঙ্গে এসব কৈফিয়ৎসূচক প্রবাদগুলির উদ্ভব হলো সেই সময় থেকেই। 'বাংলা বানানের সু-নীতি আর কু-নীতি' নিয়ে মধ্যবর্তী এক সংক্ষিপ্ত আলোড়ন ছাড়া, তারপর প্রায় চল্লিশ বছর আর তেমন-কোনো বিচার হয় নি এ নিয়ে। অনেকদিন পর, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সংবাদপত্র, পণ্ডিতসমাজ কিংবা কর্মীসমাজ, আবার কিছুদিন ধরে একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালী খুঁজে নিতে চাইছেন বাংলা বানান আর লিপির প্রসঙ্গে, খুঁজে নিতে চাইছেন একটা সমতা আর সরলীকরণের পথ।

এই পথের বিচারে বসে আজ একবার মনে করা ভালো, পঞ্চাশ বছরের পুরোনো বিতর্কে সদ্যপ্রয়াত দেবপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা ছিল কতটুকু। 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান' বইটির 'বাঙ্গালা' এবং 'বানান' শব্দদুটির বর্ণক্রম দেখেই অবশ্য তাঁর ভাবনার কাঠামো অনেকটা বুঝে নেওয়া যায়। বুঝে নেওয়া যায় যে রাজনৈতিক দৃষ্টির মতো এই ভাষানৈতিক দৃষ্টিতেও দেবপ্রসাদ ঐতিহ্যবাদী, প্রাচীনের প্রধাবিহিত সংরক্ষণেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ। 'বর্ণন' থেকে আগত শব্দ বলে দন্ত্যে সরে যাবে, কিংবা হয়তো কারো কারো তা মনে থাকবে কেবল রক্ষণশীল চিন্তার কোনো ক্ষণিক ইতিহাস হিসেবে। কিন্তু তাঁর যে বইখানি আরো কিছুদিন আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে মনে হয়, তার নাম 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান', কেননা বাংলা বানানের শৃঙ্খলাবিধান নিয়ে একটি নবীন এবং স্বাস্থ্যকর উত্তেজনা এই দশক জুড়ে আমরা লক্ষ করছি দেশে।

আনবে, না কি হয়ে উঠবে বিশৃঙ্খলারই নতুন সূচনা?

তরুণ লেখকদের বিরুদ্ধেই হোক ('তরুণিমা'), কমুনিজম বা কমুনিজমের 'প্রপ্রদাতা' নেহরুর বিরুদ্ধেই হোক ('সতের বৎসর পরে') কিংবা ব্যাকরণপণ্ডিতদের বিরুদ্ধেই হোক, দেবপ্রসাদের ভাষা হতো সবসময়েই ব্যঙ্গে ক্ষুরধার, সামান্যতম স্খলনের জন্য সম্ভতি-অতিক্রান্ত রবীন্দ্রনাথকেও নিষ্ঠুর উপহাসে বিদ্ধ করতে ইতস্তত করেন নি তিনি। এই তীব্রতা নিশ্চয় কারো কারো মনকে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন, ঝাপসা হয়ে এসেছিল যুক্তি। কিন্তু আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, দেবপ্রসাদের উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি মাননীয় না হলেও তাঁর কোনো কোনো কথার মধ্যে একটা ভাববার বিষয় ছিল।

যেমন, 'বাণানকমিটিতে ঘন্টা কয়েক' নামের লেখাটি থেকে বোঝা যায় যে পুরনো সেই সমিতির সদস্যরা কখনো কখনো একটু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আর সে-সিদ্ধান্ত কখনো-বা নির্ভর করেছে নিছক ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দের ওপর। উপরন্তু, যে-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 'প্রাকৃত বাংলা'র বানান-সংস্কারের জন্য, সেই সমিতি নতুন নীতির উৎসাহ নিয়ে এলেন তৎসম শব্দের প্রসঙ্গেও। অবশ্য তৎসমই হোক আর তদ্ভবই হোক, নতুন বিধানের প্রয়োগ যদি সর্বাত্মক হতো, তাহলে হয়তো পরবর্তী বানানের ইতিহাসে এতটা বিপর্যয় দেখা দিত না। কিন্তু আমাদের সংস্কারনীতি ভরে রইল কেবল বিকল্প-বিধানে, আর কখনো-বা অহেতুক সংস্কারে। আর এর ফলে দেবপ্রসাদ ঘোষের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে আমাদের বিশৃঙ্খলা বেড়েই গেছে দিনে দিনে, সরলীকরণের চেষ্টায় একটা জটিলতার দিকেই আবর্তিত হয়েছে বাংলা বানান।

আজ আবার যখন সংগতভাবেই সংস্কারপ্রসঙ্গের আলোচনা হচ্ছে নানা স্তরে, তখন নতুন বানানবিধি স্থির করবার সময়ে দেবপ্রসাদের যুক্তিগুলিকে আরেকবার লক্ষ করলে আমরা উপকৃত হব। এটা ঠিক যে পঞ্চাশ বছরের চর্চার ফলকে হঠাৎ আবার আজ উলটে দেওয়া যায় না, সংগতও নয় সেই চেষ্টা, কিন্তু 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান'এর মতো কোনো কোনো পুরোনো বই সামনে রাখলে হয়তো আমরা ধরতে পারব : সংস্কারের অত্যুৎসাহে আবার আমরা কোনো ভিন্নতর সংকটের দিকে পা বাড়াচ্ছি কি না। সাম্প্রতিক কর্তৃবিচারে তাঁর ভাবনাকেও যদি এইভাবে কিছু-পরিমাণে গণ্য করি, সদ্যপ্রয়াতের প্রতি সেইটেই হবে আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা-নিবেদন। (১৫ মার্চ ১৮৯৪—১৪ জুলাই ১৯৮৫)

শঙ্খ ঘোষ

সোমেন্দ্রনাথ বসু

'অন্যায় অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ/কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ/বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্তবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম—/তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল নির্মম,/করুণকোমল।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উদাত্ত উচ্চারণ সাপ্রতিক কালে যাঁর সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তিনি হলেন 'রবীন্দ্রচর্চা-ভবন' ['টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট']-এর প্রাণপুরুষ অধ্যাপক ড. সোমেন্দ্রনাথ বসু। সর্বচিত্তাকর্ষক তাঁর প্রসন্ন-সুন্দর ব্যক্তিত্ব ছিল কুসুমের মতো কোমল, অথচ অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল অর্জুনের অগ্নিবাণসম। চিকিৎসার অতীতপ্রায় 'প্যানক্রিয়াটাইটিস'-এ আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ জুলাই ১৯৮৫ মাত্র আটান্ন বছর বয়সে তিনি পরলোকগত হয়েছেন।

১৯২৭ সালের পনেরো মার্চ উত্তর-কলিকাতার দর্জিপাড়ায় সোমেন্দ্রনাথের

জন্ম। পিতা বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন জনহিতব্রতী ডাক্তার। সোমেন্দ্রনাথের শিক্ষা সরস্বতী ইনস্টিট্যুশনে, স্কটিশ চার্চ কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। কর্মজীবন শুরু কলিকাতার এথিনিয়াম ইনস্টিট্যুশনে ; তারপর হিপ্‌রার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ এবং সবশেষে দক্ষিণ-কলিকাতার চারুচন্দ্র কলেজে। ছাত্রজীবন থেকেই সোমেন্দ্রনাথ ছিলেন সুবক্তা ও সুতার্কিক। কলেজের ক্লাসেই হোক আর বিশাল জনসভাতেই হোক, তাঁর পরিশীলিত ভাষণ ছিল উদ্দীপনাময়।

সোমেন্দ্রনাথ আকৈশোর স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। বিয়াল্লিশের অগস্ট-আন্দোলনের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। সেই বয়সেই 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা। ধীরে ধীরে তিনি সাম্যবাদী আন্দোলনের শরিক হলেন। এক্ষেত্রে তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন বিপ্লবী ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের অধিনেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৌম্যেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য তাঁর জীবনে নানাদিক দিয়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঠাকুরবাড়ির এই বলিষ্ঠ বিপ্লবী সন্তান যুবক সোমেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর রবীন্দ্র-সংগীত-প্রতিষ্ঠান বৈতানিকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সোমেন্দ্রনাথকে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রসংস্কৃতি-চর্চার প্রতি সোমেন্দ্রনাথের দিক্‌পরিবর্তনের সূত্রপাত সম্ভবত এইভাবেই হয়েছিল। রবীন্দ্রচর্চা-ভবন প্রতিষ্ঠার আগে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। 'রবীন্দ্র-অভিধান' রচনা। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে। তার পরের বছরেই প্রকাশিত হয় রবিশুরু সম্পর্কে দশটি প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থ 'সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ'। কিছুদিন পরেই, ১৯৬৫ সালে সৌম্যেন্দ্রনাথের বাড়িতেই 'রবীন্দ্র-চর্চা-ভবন' প্রতিষ্ঠিত হল। সেইদিন থেকে জীবনের শেষ কুড়ি বছর সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রানুশীলনের এই অভিনব কেন্দ্রটিকে তিলে তিলে একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করার কাজে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রানুরাগী শিক্ষারতীদের দল ভবনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কালীঘাট পার্কে ভবনের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু ছাত্র-ছাত্রীর জন্য নিয়মিত পঠনপাঠন চলছে। দু বছরের এই পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল ও মননশীল রচনাবলীর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়লাভের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষারও আয়োজন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গবেষণা। সাময়িক-পত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ সংগ্রহের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভবন থেকে এমন-সব গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের ভাণ্ডার।

সোমেন্দ্রনাথ দেশে বিদেশে রবীন্দ্র-চর্চা যাতে সম্প্রসারিত হয় তারও আয়োজন করেছিলেন। চর্চা-ভবনের একাধিক শাখা কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এবং অন্য রাজ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রানুশীলনকে সম্মিলিতভাবে সার্থক করার জন্য সোমেন্দ্রনাথ 'টেগোর ইনটারন্যাশনাল'-এর পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিক্রমা করেছেন।

শেষ জীবনে সোমেন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র ছিল : 'রবীন্দ্রচর্চাই আমাদের জীবনচর্চা'। আমরা অনেকে ভুলে যাই যে, উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতে যে নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল তার শেষপরিপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথে। তাঁর তিরোধানের পরে অর্ধশতাব্দীও অতিক্রান্ত হয় নি। কিন্তু এই কালসীমার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। স্পর্ধিত রবীন্দ্রবিদ্বেষে লজ্জিত হন না এমন বুদ্ধিজীবীরও অভাব নেই। জাতীয় জীবনের এই দুর্দিনে রবীন্দ্রচর্চার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যে মহৎ ব্রত সোমেন্দ্রনাথ পালন করে গেলেন, তা তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অনুশোচনার বিষয় এই যে, তাঁর জীবনের সাধনা অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে চলে যেতে হল। তাঁর 'রবীন্দ্র-অভিধান' চার খণ্ড মাত্রই প্রকাশিত হয়েছে। যে যোলোখানি উচ্চকোটির গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন, তাঁর কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যাশা আমাদের ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রচর্চা-ভবনকে কেন্দ্র করে তিনি যে সমর্পিতচিত্ত রবীন্দ্রানুরাগী সমাজ গড়ে দিয়ে গেলেন, আমরা আশা করব, তাঁদের সম্মিলিত সাধনা ও নিঃস্বার্থ সেবায় তাঁর অসমাপ্ত কৃত্য একদিন পরম সার্থকতার তীর্থে উপনীত হবে।

জগদীশ ভট্টাচার্য

সুভো ঠাকুর—শেষ বোহেমিয়ান

সুভো ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলাপ অন্তত চল্লিশ বছরের, কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে হয়তো তার দু-এক বছর আগে থেকে। এই দুই ভিন্নধর্মী দিকপাল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জানাশোনা আমার পরম সৌভাগ্য আর গর্বের বিষয়। তবে পরিচয়ের দীর্ঘতার জন্যে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। তাতে আমার বয়সের প্রবীণতাই প্রকাশ পাচ্ছে। তা ছাড়াও বলতে চাই যে, বহুদিনের পরিচয়ের ফলে আমি যে এঁদের বিচিত্র আর জটিল চরিত্র ভালো করে বুঝতে পেরেছি, সে দাবিও আমি করব না।

সুভো ঠাকুরের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের আগেরও একটা ইতিহাস আছে। উনিশ শো পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশে আমি কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে সবে ঢুকেছি। কলেজ থেকে ইন্টিশান ছিল সাইকেলে চার-পাঁচ মিনিটের রাস্তা। আমরা দু-চার জন বাঙালি ছেলে প্রায়ই দুপুরবেলা ইস্টিশানে গিয়ে হুইলারের স্টলে বই আর পত্রপত্রিকা দেখতে যেতাম। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী' ছাড়া আরো অনেক রকমের কাগজ থাকত। যেমন, সিনেমার কাগজ 'ছেয়ালী' আর 'দীপালি'। 'নবশক্তি', 'দেশ' তখন সবে উঠেছে। 'পরিচয়'-ও হয়তো থাকত। কিন্তু তার কঠিন পাণ্ডিত্য তখন আমাদের বুঝিল না। তাঁর নাগালের বাইরে ছিল। কিন্তু এইসব কাগজগুলোর মধ্যে যে-দুটো আমাদের অবাক করে দিত তা হল সুভো ঠাকুরের সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' আর মাসিক 'ভবিষ্যৎ'। এখনকার পারমিসিভ বা সব-কিছু-চলার যুগের তুলনায় তেমন কিছু না হলেও সেই সময় এই কাগজ দুটির দুঃসাহসিক লেখা, ছবি, লে-আউটের অভিনবত্ব আমাদের চমকে দিত। আমার এখনও মনে আছে ভবিষ্যতের সেই সংখ্যা যাতে একুশ-বাইশ বয়সে লেখা সুভো ঠাকুরের 'প্যানসি ও পিকো' বেরিয়েছিল। পুরু মোটা হলদে কাগজে ছাপা প্যারায় প্যারায় ছবি দেওয়া 'প্যানসি ও পিকো'' তার চটুল ঠুনকো ছন্দে আমাদের কাছে রঙিন বন্ধুদের মতন এক মায়াময় জগতের ছবি তুলে ধরেছিল। যার মধ্যমণি ছিল রোমানটিক বেপরোয়া বোহেমিয়ান যুবক টুটুল টেগোর, যার প্রেমে লীলা, লটি, বুলু, ডলি, লীনা, ওমোলা গুপ্তা সবাই হাবুডুবু। টুটুল টেগোরের বাহন ছিল ইতালিয়ান রোলস আই-সোটা থার্টিসিক্স যে নামটার ইউফনি মনটাকে রাঙিয়ে দিত আর যার নাম সে তার একদা-প্রেমিকা ইতালিয়ান কনসালের মেয়ের কাছ থেকে শুনে কিনেছিল। টুটুলের জগৎ ছিল এখনকার তুলনায় তখনকার অমরাবতীর মতন সাহেব কলকাতা। ফারপো, ব্রিসটল, মার্চেন্টির আইসক্রিমের দোকান, হোয়াইটওয়ে লেডল আর নিউ মার্কেট ছিল দৈনিক বিহারস্থল। বারগানডি, শ্যামপেন গিমলেট তার প্রিয় পানীয়। সারা রাত বঞ্জরীবিতানে সহজিয়া প্রেমের পর আবার রোজ তার শুরু হত অবিরাম অভিসার। প্রোফিতভর্তৃকা মিসেস সেনের বাগানঘেরা বাড়িতে তার মধ্যরাত্রেও অবাধ প্রবেশ। মাঝরাতে উল্কার গতিতে রেস করে একদা দারজিলিঙে দেখা প্যানসি পাইনের রেনি পারকের বাড়ির শোবার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে যামিনীযাপন তার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু সবচেয়ে মজা—এইসব তন্বী দেবভোগ্যা ইঙ্গবঙ্গ সুন্দরীরা কেউ তাদের নরম নিটোল বাহুপাশে টুটুলকে বেঁধে রাখতে পারে নি। টুটুলের কথায়, "উল্কার মত অস্থির আমি ব্যাপত আলোকপারা।/আপনারে শুধু আপনি বাঁধিল বাঁধিতে আসিল যারা।/..... যৌবন মোর সাহারার মত তপ্ত বালুকা যেন/প্রণয় লুটিয়া চলেছি আমি যে তাতার দস্যু হেন।/নিষ্ঠুর হায় আমার মতন দুনিয়ায় কেহ নাই।/ হৃদয় পেলেই ছুরি মেরে প্রেম চুরি করে নিয়ে যাই।" কিন্তু তার পরেই বাইশ বছরের টুটুল বলছেন, "(কিন্তু ক্লান্ত হয়েছি)/পথ হতে পথে ঘুরে ঘুরে হায় শ্রান্ত পথিকসম/শীতল কোমল বাহুবল্লরী বাঁধুক হৃদয় মম।"

পনেরো-ষোলো বছর বয়সে এই কবিতার আর অন্যান্য কাহিনীর লেখক সুভো ঠাকুর আমাদের কাছে এক স্বপ্নের মতন পুরুষ ছিলেন। রবি ঠাকুরের নাতি, সামাজিক আর নৈতিক পোশাকি আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে আমরা যে সত্যি মিথ্যে কত গল্প শুনেছি তার ঠিক নেই। আমি কটক ছাড়ার কিছু পরে শুনেছিলাম তাঁর বাবা তাঁকে কটকের দক্ষিণে তাঁদের কুজঙের জমিদারিতে খাজনা আদায়ের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর বড়ো ছেলে ঠিকঠাকভাবে খাজনা উসুল করে সময়মতো বাড়ি ফিরবে। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন ছেলে ঘরে ফিরল তখন বাবা অবাক। কোথায় খাজনা। কোথায় টাকা! ছেলে কুজঙ আর তার কাছেই সমুদ্রকূলের স্বর্ণকুদায় বসে কিছু পদ্য লিখে নিয়ে এসেছিলেন। এর পরে অবশ্য সকলেই জানেন যে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির তাঁর অংশ যখন তাঁর হাতে আসে তখন তিনি কিভাবে তা কয়েক বছরে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। তবে সাহিত্যচর্চা, বন্ধুপোষণ আর নানান বিচিত্র খেওয়ালে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হরির লুঠ করে দেওয়ার কথা বা তার জন্যে আক্ষেপ তাঁর মুখে থেকে কেউ কোনোদিন শুনেছেন বলে মনে হয় না।

সুভো ঠাকুর সম্বন্ধে উনিশ শ পঁচাশি সনে যে ওপরের কথাগুলি লিখলাম তা পড়ে আজকের অনেক যুবকযুবতীও হয়তো আমাদের কিশোর বয়সের রোমানটিসিজমের বহর দেখে বিলিতি কায়দায় শ্রাগ করবেন। আর সমাজচেতনওয়ালাদের কথা নাই-বা বললাম। তবে ব্যাপারটাকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে সেটাকে তখনকার কালের বেড়ের মধ্যে ফেলে ভেবে দেখা দরকার। সময়টা উনিশ শো পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। আমাদের দেশে সাম্যবাদের আবির্ভাবের একটা সূচনা দেখা দিয়েছিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়। সি.পি.জি.বি.-র রজনী পাম দত্ত বা হ্যারি পলিট তখনও আমাদের ভারতীয় কলোনিতে মার্ক-এঙ্গেলস-লিখিত সুসমাচার আর সোভিয়েটের প্রচণ্ড অগ্রগতির বার্তার প্রচার শুরু করেন নি। ভিকটর গোলান্‌জের লেফট বুক ক্লাবের বই তখনও এদেশে আসতে শুরু করে নি।

সিভনি আর বিয়েত্রিশ ওয়েবের 'সোভিয়েট রাশিয়া : এ নিউ সিভিলাইজেশন ?' তখন বেরিয়েছিল কিনা মনে নেই। স্প্যানিশ সিভিল ওয়র শুরু হব-হব করছে। কিয়াংসি থেকে সেনসি অবধি ১৯৩৬-৩৬ সনের মাও সে টুং-এর লং মার্চের খবর এডগার স্নো তখনও আমাদের দেন নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরদেশি অনীকিনীরা তখনও দেশে দেশে উপবনে ঢুকে পড়ে নি। যাকে বলে সোস্যাল কনশাসনেস বা সমাজ-সচেতনতা তখনও লোকেদের ঘাড়ে ভর করে নি। একটিপ নস্যিতে সোস্যাল কনটেনট টইটুম্বর না থাকলে নস্যি না নেওয়ার লেখক কবি শিল্পীর সমালোচকরা তুড়ুম ঠুকে তখনও আসরে নামেন নি। লোকেরা তখন আমেরিকার মিউজিক্যাল ফিলম দেখতে গিয়ে ব্যাটলশিপ পোটেমকিন দেখছে না বলে নিজেদের অপরাধী বোধ করত না।

আমাদের যুবকদের কাছে বাঙলায় তখন রমলার যুগ। সম্রাট পঞ্চম জর্জ সিংহাসনে থাকলেও বিদেশী প্রভাব যেটা আমাদের দেশে প্রকট ছিল তা হল এডোয়ার্ডিয়ান ইংল্যানডের গ্যাসালোকিত লনডন। স্ট্যানড ম্যাগাজিনের বোধহয় তখনও জয়জয়কার। লেখক মাইকেল আরলেনের তখন এদেশে ভারি দাপট। মনে পড়ছে না তাঁর বা অন্য কারুর একটা গল্পের দুঃখ বা মৃত-প্রায় বোহেমিয়ান নায়ক যখন কিছু পয়সা পায় তখন সে তা দিয়ে রুটি না কিনে গোলাপফুল শুঁকতে-শুঁকতে রাস্তায় পড়ে মারা যায়। গল্পটার সত্যি-মিথ্যে জানি না। কিন্তু এইরকম সময় সুভো ঠাকুর বিলেত থেকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে সুবিখ্যাত লানসিয়া-লামদা মোটরগাড়ি কিনে এনে এক রানীর গাড়ির সঙ্গে রেস করতে গিয়ে নিজের গাড়িটাকে এমনভাবে চুরমার করে দেন যে সেটাকে তখন এদেশে সারানো গেল না। আগের কথাগুলো মনে রাখলে আমাদের ছেলে-বয়সের রোমানটিসিজম আর সুভো ঠাকুরের বোহেমিয়ানিজমকে অত তাচ্ছিলের সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তারপর তিরিশের যুগ কেটে গিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এল। তখন সাম্যবাদ লোকের মুখে-মুখে। আমরাও তখন যুদ্ধের সেই দুঃস্বপ্নের বছরগুলোতে মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। মার্কস - এঙ্গেলস-লেনিন - স্তালিনের লেখা, মার্কসবাদী লিটারেচার আর জন রীডের 'টেন ডেজ দ্যাট শুক দি ওয়ার্ল্ড'-এর মতন বইপত্তর পড়ে কলকাতার অবস্থা দেখে মনে হত বিপ্লব এলো-এলো। মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেও সত্যি কথা বলতে কি পুলিসের ভয়ে আমি অন্তত কোনোদিন কোমপানির খাতায় নাম লেখানোর সাহস পাই নি। তাই যাঁরা সক্রিয়ভাবে ধাতীর মতন কালের গলিত গর্ভ থেকে নতুন যুগের জন্ম আনতে লড়তেন তাঁদের দেখে আমি আমার নিষ্ক্রিয়তার জন্যে বড়ো মনকষ্টে কাল কাটাতাম। মনে হত ইতিহাস আমাদের মতন ঠুঁটো লোকদের আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিচ্ছে।

উনিশ শো তেতাল্লিশের সেই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের দিনগুলির কথা ভাবলে এখনও শরীর আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সুভো ঠাকুর সে সময় কাশ্মীরে শুনেছি রাজবাড়ির মেয়েদের আর অন্যদের ছবি-আঁকা শিখিয়ে মহানন্দে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কথা শুনে তিনি সব ছেড়েছুড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাঁর এক সাকরেদ বংশী চন্দ্রগুপ্তকে যাঁর এখানে পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই।

আমি তখন রাজা বসন্ত রায় রোডে আমার দিদির কাছে থাকতাম। তার কিছু আগে এস আর দাশ রোড আর সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের বাড়িতে বহুদিন ছিলাম। সুভো ঠাকুর আর বংশী এসে এস আর দাশ রোডে আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তার ঠিক পরের পরের বাড়িতে এসে উঠলেন। এই সময়ের সুভো ঠাকুরের কথা, তাঁর সঙ্গে কালকাটা গ্রুপের সম্পর্কের কথা, তাঁর বিচিত্র খেয়ালের কথা, রাস্তায় রাস্তায় নৈশবিহারের কথা বলতে পারত বংশী আর পারেন খানিকটা পরিতোষ সেন মশাইয়ের মতন লোকেরা। সেসব গল্প কিছু-কিছু আমি শুনেছি কিন্তু তাঁর বিষয়ে লেখার আমার অন্তত এক্তিয়ার নেই।

এইখানেই সুভোবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এ পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল তিনি নিশ্চয় চলনে-বলনে চরম অভিজাত, অত্যন্ত আত্মাভিমানী আর দাম্ভিক মানুষ যিনি দুনিয়ার সবাইকেই তাচ্ছিলোর চোখে দেখেন। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম তাঁর মার্জিত ব্যবহার, তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বর, অপার বিনয় আর নম্র স্বভাব দেখে। তাঁর এই যে ধীর-স্থির শান্ত-সৌম্য চেহারা সেদিন দেখেছিলাম, এর পরে চল্লিশ বছরে তার এতটুকুও হেরফের হতে দেখি নি। ক্রমে-ক্রমে তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মালে যে গভীর ভালোবাসা আমার পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তা আমার জীবনের একটা বড়ো সম্পদ। ভালোবাসার 'সম্পদে'র কথাই যখন তুললাম তখন সময়ের দিক থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা কথা কবুল করি। যাটের দশকের গোড়ার দিক বা তার কিছু আগে থেকে আমি পুরনো বাঙলা বই, কোমপানির আমলের বই, সাহেবদের ছবির প্রিনট ; কলকাতার পুরোনো কিছু কিছু লিথোগ্রাফ সংগ্রহ করতাম। অন্য কিউরিও কেনার সংগতি বা ঝোঁক কিছুই ছিল না। এই সময়ে আমার আফিসে সুভোবাবু একজন কিউরিওর দালালকে পাঠিয়েছিলেন। সেই লোকই আমায় আমার প্রথম কালীঘাটের পট দেয় : এক অতি সুন্দরী যুবতী তার বজ্জাত যুবক গুরুকে ঝাঁটিপেটা করছে। এই আমার কালীঘাটের পটে হাতেখড়ি। এরপর সুভোবাবু আমায় অনেক পট আমার সাধ্যমত দামে জোগাড় করে দিয়েছেন আর আমিও সেই সূত্র ধরে কিছু পট জোগাড় করেছি। এইসব পট যে আমায় কী আনন্দ দেয় তা বলার আমার ক্ষমতা নেই। আর এগুলোর পার্থিব দিকের কথা নাই বা বললাম।

আবার পুরোনো দিনে ফেরা যাক। এখানে আমি বলা দরকার মনে করছি যে তাঁর বোহেমিয়ানিজম সত্ত্বেও মদ বা নারীতে আসক্তি আমি অন্তত কোনো দিন দেখি নি। শুধু একবার মনে আছে যে গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলে বছর পঁচিশেক আগে আমরা তাঁকে আর কয়েকজন শিল্পীকে জগৎবিখ্যাত আর্ট ডিজাইনার লিও লিয়োনিকে 'মিট' করতে নেমন্তন্ন করেছিলাম। সেখানে সবাই আরাম করে স্কচ খাচ্ছিলেন, কেবল সুভোবাবু ছাড়া। বহু অনুরোধের পর যাতে সদাশয় লিয়োনিও যোগ দেন সুভোবাবু হুইস্কি খেতে রাজি হলেন। যখন তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, জল না সোডা—কী দিয়ে খাবেন, তিনি বললেন, জল দিয়ে খেতে ভালো লাগে না আর সোডা দিয়ে খেলে মাথা ধরে। অতএব তিনি নীট ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে একটা নয়, দুটো নয় ছটা-আটটা বড়ো নীট হুইস্কি অম্লান বদনে খেলেন। গল্পটা বলার উদ্দেশ্য হল যে যদিও মদে তাঁর তেমন আসক্তি দেখি নি, কদাচিৎ খেতে শুরু করলে বাঘা-বাঘা মদপরাও তার সঙ্গে পেরে উঠত না। আমার সঙ্গে আলাপের পর আমি তাঁর বেশ কয়েকজন সুন্দরী, বিদুষী বান্ধবীকে মাঝে-মাঝে দেখেছি। নৈর্ব্যক্তিকভাবে তাঁদের হাবভাব, কথাবার্তা, চাহনি ইত্যাদি দেখে আমার মনে হত তাঁরা সুভোবাবুতে মুগ্ধ কিন্তু সেই ক্লান্ত টুঁটলের মতন শেষ অব্দি তিনি খানিকটা স্থিরতা, গভীর সুখ আর শান্তি পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী শ্রীমতী আরতি, তাঁর নয়নের মণি মেয়ে চিত্রলেখা আর দুই ছেলের সান্নিধ্যে।

পঞ্চাশের দশকে সুভো ঠাকুরের সঙ্গে প্রায়ই সন্ধেবেলায় দেখা হত গণেশ অ্যাভিনিউর চতুরঙ্গ অফিসে। সেখানে যে আড্ডা হত তাতে নিয়মিত থাকতেন আতাউর রহমান, নীহার চক্রবর্তী, কমলকুমার মজুমদার আর সুভো ঠাকুর। আরো অনেকে আসতেন মাঝে-মাঝে। যেমন মনে পড়ছে চতুর বুদ্ধিমান ক্রশ-ওয়ার্ডপাগল সুরঞ্জন সরকারের কথা। বছরের পর বছর সেই সন্ধেগুলো কী জমজমাটভাবে কেটেছে বলা যায় না। বলা বাহুল্য, কমল মজুমদার ছিলেন মূল গায়েন। তবে সুভো ঠাকুরের মৃদু রসিকতাও ছিল সেই আসরের একটা বড়ো সম্পদ।

সুভোবাবুর মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের যে জিনিসগুলো আমার সবচেয়ে মনোগ্রাহী বলে মনে হয়েছে তার মধ্যে আমি প্রথমে বলতে চাই যে, বাঙালিসুলভ সাবধানী মনোভাব তাঁর জীবনে লেশমাত্র ছিল না। সবাই তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'প্যানসি ও পিকো'-র "বাবার খুড়ো হন শুনেছি, মোর কেহ হয় নাক" লাইনটা আকছার উদ্ধৃত করেন। অথচ কেউ বললেন না যে তাঁর জীবনটা তাঁর বাবার খুড়োর আর-কয়েকটা লাইনের সঙ্গে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেত। তিনি পদে পদে ঠাকুরবাড়ির, বাঙালি বাড়ির নিষেধের ডোর ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া আর উদুনচণ্ডে হয়ে জীবন কাটান। লক্ষ্মীছাড়া আর উদুনচণ্ডে কথা দুটো তাঁর পক্ষে কতখানি সত্যি তা আমার বলার দরকার নেই। চল্লিশ-পঞ্চাশ সালের কথা বলছি। তখন তাঁর খুব সচ্ছল অবস্থা নয়। কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ পয়সা হাতে এলে তক্ষুনি তা নয়ছয় করে কয়েক দিনের আয়হোসেনি, লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানো, দামি অ্যানটিক কেনা, আর তারপর আবার ফকির। আমি শুনেছি, চল্লিশের দশকে তিনি তাঁর স্বাভাবিক নাটকীয় ধরনে লোককে বলতেন তাঁর ঠিকানা ফুটপাত। কথাটা মূলত সত্যি। তখন তিনি কোন্ আস্তানা থেকে কোন্ আস্তানায় ভেসে বেড়াতেন, কোন্ গ্যারেজ থেকে কোন্ গ্যারেজ বদলাতেন তা আমি তাঁর কিছুটা ঘনিষ্ঠ হলেও জানতুম না। উনিশ শো সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালে আমি যখন একটা বিজ্ঞাপন কোমপানিতে সামান্য চাকরি করি তখন তিনি প্রায় দুপুর বা বিকেলবেলা আমার কাছে অভুক্ত অবস্থায় আসতেন। আমরা তার পর মিশন রো পার হয়ে বন্দুকওলা গলি দিয়ে ফিয়ার্স লেনের বাঁকাচোরা গলি ধরে চিনেপাড়ার গভীরে একটা রেসটুরেনটে খেতে যেতাম। সেই বিরাট হলঘরের মতন রেসটুরেনটে বড়ো-বড়ো গোল-গোল মারবেলটপ টেবিল পাতা থাকত। কাউনটারে থাকত হিসেব রাখার অ্যাবাকাস। সেখানে চীনা ছাড়া বাইরের লোক খুব কমই খেতে যেত। আমরা পয়সা থাকলে একপ্লেট করে রাইস ছাউ ছাউ অর্থাৎ স্টীমড ভাতের উপর ডইকিরা সস-দেওয়া তরকারি আর মাংসের টুকেরা খেতাম। দাম ছিল ষাট পয়সা ; যেদিন পয়সা কম থাকত সেদিন একপ্লেটই দুজনে ভাগ করে খেতাম। গরিব চীনেদের এই খাবারে আমরা যে কী রাজসিক সুখ পেতাম তা বলা যায় না। আজকালকার বাঙালি খদ্দেরদের জন্যে পাড়ায়-পাড়ায় রেসটুরেনট। কলকাতায় এক-আধটা ছাড়া কোনো রেসটুরেনটেই এই খাবার পাওয়া যায় না। আবার পকেটে পয়সা থাকলে সুভোবাবুর কাণ্ডের একটা নমুনা দিই। এই সময় আমরা দু-চার জন বন্ধু মিলে প্রতি রোববার সকালে বসুশ্রী সিনেমার দুতলায় কফি হাউসে আড্ডা মারতাম। একদিন দুপুরবেলা তখন বেলা একটা, সবাই চলে গেছে, কেবল আমি আর দুজন বসে আছি। হঠাৎ সুভো ঠাকুর হাজির হয়ে বললেন, এক্ষুনি চলুন, ট্যাকসি দাঁড়িয়ে। তারপর সটান ফার-

পোয়। তখন তাজা ফলের রস, জুলেপ মিনট আর জিন-দেওয়া ফ্রুট কাপ বলে একটা ড্রিনক ছিল যা ফারপোর মতন কেউ করতে পারত না। খানাপিনার পর বিল এল বোধহয় গোটা ষাটেক টাকার। সুভোবাবু একটা একশো টাকার নোট বার করে বয়কে দিয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। কথাটা বলার উদ্দেশ্য যে একটু পরেই দেখলাম যে তাঁর পকেট প্রায় ফাঁকা।

সুভো ঠাকুর স্টেটসম্যানের প্রাক্তন সম্পাদক নানপোরিয়ার মতন ছিলেন সূক্ষ্ম ভোজনবিলাসী। আমরা তিনজনে কত জায়গায় যে খাওয়ার অ্যাডভেনচারে বেরোতাম তার ঠিক নেই। উত্তর দক্ষিণ মধ্য কলকাতার অলিগলির পাইস হোটেল বার নানান খাবারের জায়গা। মোগলাই, পানজাবি, মাদ্রাজি আর চীনে পাড়ার অলিতে-গলিতে ছোটো-বড়ো অজস্র রেসটুরেনট, কলিন স্ট্রীটের গোয়ান মেসের প্রাইভেট রেসটুরেনট—কোথাকার কী খাবারদাবার ভালো তা ছিল তাঁর নখদর্পণে। রাস্তার খাবার যেমন প্রিয় ছিল তেমনিই ছিল নানান অভিজাত জায়গা। হোয়াইটওয়ের দোতলায় বিলিতি কায়দার চমৎকার রেসটুরেনটের হালকা লানচ আর বিকেলে বোন-চায়নার কাপে চা আর স্কোনস, আরমি-নেভির চায়ের দোকান যেখানে ঢুকতে আমাদের বুক দুরদুর করত, পুরোনো দিনের অবিভক্ত সুইস-পরিচালিত ফ্লুরি অ্যান্ড ট্রিনকার চা, গেলাসে-দেওয়া নিজেদের তৈরি আইসক্রীম আর পেসট্রি—সব জায়গাতেই আমি তার সঙ্গী হয়ে গেছি।

বুড়ো বয়সে যখন খাবার নিয়ে তাঁর শরীরের জন্যে বিশেষ কড়াকড়ি, তখন সুখাদ্য খাওয়া আর খাওয়ানোর উৎসাহ সুভোবাবুর একরত্তি কমে নি। তাঁর মৃত্যুর শোকসংবাদে অনেকেই লিখেছেন যে, যে মানুষ যৌবনে লানসিয়া চড়তেন তিনিই শেষ জীবনে ফকিরের মতন জোব্বা পরে রিকশায় চড়ে হাসিমুখে বেড়াতেন। রিকশায় তিনি চড়তেন সত্যি। তবে আমি জানি তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে মাসে দু-তিন হাজার টাকা ট্যাকসিতে খরচ করতেন। আর এও সত্যি যে শেষের দিকে প্রায় প্রতিদিন কোনো-না-কোনো সঙ্গীকে নিয়ে বিকেলে চা খেতেন। আর ডিনার খেতেন স্কাইরুমে যে বারবিহীন রেসটুরেনটে, খাদ্যরসিকদের মতে কলকাতা কেন সারা দেশের একটা সবচেয়ে 'ইউরে পিয়ান' খাবারের জায়গা। সুভো ঠাকুরের বাবু-মেজাজ কোনোদিনই যায় নি। হাজার হোক, প্রিন্স দ্বারকানাথের রক্ত যাবে কোথায়। সুভো ঠাকুরের আর-একটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল তাঁর বুকের পাটা। এইরকম বিনম্র, মৃদুভাষী, উদাসীন মানুষের ভেতরে কী-রকম ছাইচাপা আগুন বা বলতে গেলে গনগনে লাভা ছিল তা ভাবা যায় না। দরকার হলে অপ্রিয় সত্য কাউকে তোয়াক্কা না করে বলতে পারতেন কল্পনা করা যেত না। এর আমি একটিমাত্র উদাহরণ দোব : গত বছর দেশ পত্রিকায় তাঁর লেখা 'বিস্মৃতিচারণা'।

আর-একটা কথা বলে আমি লেখা শেষ করব। সুভোবাবুকে দেখে অনেক সময় আমার বাইবেলের যোশেফের সম্বন্ধে সেই উক্তির কথা মনে পড়ত : যোসেফ হ্যাড এ কোট অব মেনি কলারস অ্যানড হ্যাঁ ওরজ এ ড্রীমার অব ড্রীমস। শীতকালে মাঝে-মাঝে তিনি যে নকশি কাঁথার মতন বালাপোশ গায়ে দিয়ে বসে থাকতেন তা যোসেফের নানা-রঙের কোটেরই সামিল। আর সারা জীবন তাঁর ছিল কত কল্পনা, কত উদ্দীপনা। বয়সে প্রবীণ অথচ মনে নবীন কথাটা স্থূল হস্তে এত ব্যবহৃত হয় যে বর্ষীয়ানের মনের তারুণ্যের কথা লিখতে গেলে হাতটা কেঁপে ওঠে। তবুও সুভো ঠাকুরের ব্যাপারে কথাটা ভেবেচিন্তেই বলছি। যেমন বলতে পারি জীবনতারা হালদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাধারমণ মিত্র, নীরদচন্দ্র চৌধুরী আর মুলকরাজ আনন্দ সম্পর্কে। মারা যাবার মাত্র মাস কয়েক আগে তাঁর বুকে প্রায় সর্বক্ষণ ব্যথা, দু পা হাঁটলে হাঁপাতেন, শরীর প্রায় বইত না। তখনও খাওয়াদাওয়া খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যাপারে কী উত্তেজনা, মনের মধ্যে কত ফন্দি, কত মতলব, কত স্বপ্ন ঘুরছে ফিরছে। নতুন পদ্যের বই লিখবেন, স্মৃতিকথা শেষ করবেন, ইংরিজিতে আর্ট কুলেটিন বার করবেন, নতুন জিনিসপত্র কিনে চলেছেন, মিউজিয়ামের পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে সর্বক্ষণ। আনন্দবাজার কোমপানির বিখ্যাত আর্ট ডিজাইনার শ্রীমান বিপুল গুহ তাঁকে আদর করে বলতেন, 'সুভো ঠাকুর আমার বড়ো ছেলে।' যুবক বিপুলের সত্তরোত্তর সুভো ঠাকুর সম্বন্ধে এই কথাটা তাঁর চিরনবীন মনের সোনার জলে লিখে রাখার মতন সার্টিফিকেট। লোকের সব সাধ মেটে না, সুভোবাবুও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে দুঃখের কথা যে তাঁর বিরাট বিচিত্র সংগ্রহের সম্ভার নিয়ে মিউজিয়াম করার ব্যাপারটার সুরাহা করে যেতে পারলেন না। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কী হবে, সেটা আমি কেন কেউই বলতে পারেন না। তবে সুখের কথা যে বছর দু-চার আগে আমাদের প্রিয় বন্ধু তাঁর অকালমৃত্যুর আগে সুভোবাবুকে নিয়ে যে 'দি লোনলি পিলগ্রিম' বলে একটি তথ্যচিত্র করেন তাতে তিনি বেশির ভাগ ঠেশটা দেন সুভোবাবু আর তাঁর সংগ্রহের ওপর যা তাঁকে শেষ জীবনে অনির্বচনীয় শান্তি দিত। সেই ফিলমে সুভোবাবুর শিল্পসংগ্রহের একটা অন্তত ক্ষণীন স্মৃতি থেকে গেছে।

প্রায় পাঁচশো বছর আগে হ্যামলেট বড়ো দুঃখে বলেছিলেন যে তাঁর বাবার মতো লোক আর দুনিয়ায় দেখা যাবে না। তারপর লক্ষ-লক্ষ লোক লক্ষ-লক্ষ মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেছে। ফলে কথাগুলো এখন মৃতের প্রতি অর্থহীন সৌজন্যে নয়, চূড়ান্ত হাস্যকর ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। সুভোবাবু সম্বন্ধে কথাগুলো কিন্তু অনেকখানি খাটে। তাঁর সময়ে তাঁর চেয়ে বড়ো বহু লেখক বহু কবি বহু শিল্পী ছিলেন ; যদিও শিল্পসংগ্রাহক হিসেবে কিন্তু তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর চেয়ে রকমারি চরিত্রের, খামখেয়ালি নাটকীয় আর বিতর্কিত লোক আর কারুর কথা চট করে মনে পড়ে না।

এর পরে আমাদের এই বাঙলায় অনেক বিচিত্র চরিত্রের অনেক অনেক লোক জন্মাবেন। কিন্তু সুভো ঠাকুরের মতন খাঁটি ষড়গুণবালীজারিত স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের মতন খাঁটি দিশি ভাবের সঙ্গে ফরাসি বোহেমিয়ানিজম আর যাকে বলে পাগলামো আর নানান মজাদার 'অ্যাফেকটানস' মেশানো লোক আর কি ঝড়ের-গতিতে-বদলে-যাওয়া বাঙালি সমাজে জন্মাবে? আমার তো মনে হয় না।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

ভ্রম সংশোধন

জুলাই ১৯৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নির্মলকুমার বসু' প্রবন্ধের কয়েকটি লাইনের শুদ্ধ পাঠের প্রতি আমরা পাঠকদের সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পৃ ১৮২, কলম ১, লাইন ৬—তবু মনে রাখতে হবে বর্তমান লেখক মানুষ নির্মলকুমারকে তাঁর দেশ ও

পৃ ১৮২, কলম ১, লাইন ২১—সর্বস্বত্যাগ পরে। ফল হল, ১৯২৫-এ মেধাবী ছাত্র নির্মলকুমার

পৃ ১৮৩, কলম, ১, লাইন ১৪—তাঁর আলোচনার বিস্তার এবং হিন্দু সমাজের অভি-

পৃ ১৮৪, কলম ২, লাইন ১০—থিয়োরি অব হেরিডিটি ইন হুইচ হি বিলীভড দ্যাট দ্য 'সীড'

পৃ ১৮৫, কলম ২, লাইন ২১—গোড় পর্যন্ত যেন তাঁকে দেখতেই হবে। যাকে বলে যা দেখছেন

পৃ ১৮৬, কলম ১, লাইন ১২—অ্যানপ্রপলজিক্যাল সারভে অব ইনডিয়ার ডিরেকটর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের

পৃ ১৮৬, কলম ১, লাইন ১৮—তিনি লোকসভায় পেশ করেছিলেন, আজ আমাদের প্রশাসক-

পৃ ১৮৯, কলম ১, লাইন ২২—এবং যুক্তি তৈরি করেছিলেন, এসব আমরা আজও তেমন ভালো

পৃ ১৮৯, কলম ২, লাইন ১১—স্টাডি অব ইনডিয়ান সোসাইটি পর্যন্ত। তেমনই দুর্বার বেগে

পৃ ১৯০, কলম ১, লাইন ১১—কেননা তখন জনগণের স্বরাজ স্বপ্নের মতো অলীক

পৃ ১৯০, কলম ১, লাইন ২৮—কিছু কম দুধ কিন্তু একেবারে খাঁটি দেবেন—এই ছিল তাঁর

পৃ ১৯০, কলম ২, লাইন ৩১—সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালি একজনের ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে

পৃ ১৯০, কলম ২, লাইন ৩৪—জজপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

পাঠকের দৃষ্টিতে

প্রসঙ্গ : এম জে আকবরের 'দ্য সীজ উইদিন' গ্রন্থের শিবনারায়ণ রায়-কৃত সমালোচনা

১

শ্রী রায় চারটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

প্রথম প্রশ্ন : "ভারত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বটে, কিন্তু ভারতবাসীরা কি সাধারণ-স্বীকৃত অর্থে একটি নেশন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর—"অবশ্যই"। ভৌগোলিক দিক দিয়ে ভারতবাসীরা সমুদ্র এবং পর্বত দিয়ে বিচ্ছিন্ন একটি ভূখণ্ডে বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে আসছে। মানসিকতার দিক দিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনধারার উপর বেদ-উপনিষদাদির দৃশ্য অদৃশ্য প্রভাব নৈসর্গিক প্রভাবের মতোই কাজ করে এক সমন্বয় সাধন করে আসছে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর 'ইনডিয়া থ্রু দি এজেস' বইটিতে একটি একটি করে এই সমন্বয়ের কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। একটি কারণ এদেশবাসীর বহু কাল ধরে এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তীর্থদর্শনে যাতায়াত, এবং নিজেদের মধ্যে নিরন্তর যোগাযোগ এবং ঐক্যবোধ। ইংরেজ শাসকেরা যদিও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তাঁদের টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে ইত্যাদির ভেতর দিয়েই ভারতবাসীরা একটি নেশন হবার সুযোগ পেয়েছে, ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বস্তুত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন অধিবাসীদেরও একরূপত্ব (ইউনিফরমিটি) আগেই ছিল।

বিভিন্ন সময়ে এদেশে বিভিন্ন জাতি উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়ে বা দক্ষিণ-পশ্চিম সাগর পাড়ি দিয়ে এদেশে ঢুকে পড়ে হত্যা, লুটপাট করে দেশের কোনো কোনো অংশকে তছনছ করে চলে গেছে ; কেউ-বা রয়ে গেছে।

যদি প্রশ্ন হয়, এতগুলি বিভিন্ন উপাদানে কি কোনো নেশন হতে পারে ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়—ইউরোপের বিভিন্ন নেশনের পেছনে ইতিবৃত্ত একই। ব্রিটিশ নেশনের পেছনে যেমন আছে কেলটিক, অ্যাঙ্গলো-স্যাকশন, নরউই-জীয়ান, নরম্যান-ফ্রেনচ—এতগুলি বিভিন্ন জাতের লোকের সংমিশ্রণ। ভারতেও এ ব্যাপারই ঘটেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : "বিকাশ ও সংহতির জন্য ভারতের পক্ষে নেশন হওয়া কি জরুরি অথবা অনিবার্য ?"

আবারও উত্তর—"অবশ্যই"। কোনো জাতির বিকাশ মুখ্যত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ বর্তমান কালের সঙ্গে তাল রাখার স্বার্থেই। কোনো এক বিশেষ ভূখণ্ডে বসবাস, বিশেষ প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং বিশেষ এক ধরনের চিন্তা-ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনিবার্যভাবে প্রভাবিত হবার ফলে এই বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়ে যায়। ভারতের বৈশিষ্ট্য অতি প্রাচীন এবং অনন্যসাধারণ।

তৃতীয় প্রশ্ন : "ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি এবং মূল্য দিয়ে এখানে কি এমন এক যথার্থ ফেডারাল বা আমেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় যেখানে বহুজাতিকতা রাজনৈতিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক সংহতি ব্যাহত না করে বরং উপমহাদেশব্যাপী সমামেল বা কনফেডারাল ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে ?"

এ দুটোই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তার সময় এটা নয়। এ ঝুঁকি এ মুহূর্তেই নেবার চেষ্টা করলে সম্ভবত লাভের চেয়ে লোকসানের মাত্রাই বেশি হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের উগ্র প্রকাশ দেশের একাধিক অংশে আপাতত লক্ষ করা যাচ্ছে। এ সমস্যা যে বাস্তব সেটা স্বীকার করে নিয়ে তার সুষ্ঠু সমাধান হলেই এবং জাতির সংহতিবোধ দানা বেঁধে উঠলেই অর্থপূর্ণভাবে আমরা ফেডারাল বা কনফেডারাল ব্যবস্থার কথা নিরুদ্বিগ্ন মনে ভাবতে পারি এবং সে পথে নিরাপদে পদক্ষেপ করতে পারি।

চতুর্থ প্রশ্ন : "নেশনের সামূহিক সত্তার উপরে অতি-রিক্ত ঝোঁক কি গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রবণতাকে দুর্বল করে না ?"

এ প্রশ্নে নেশন আর গণতন্ত্রকে দুই পরস্পরবিরোধী বস্তু বলে ধরে নেওয়া হয়েছে মনে হয়। কিন্তু এই দুটো কি একই পর্যায়ে ? গণতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কত্ব—এগুলি দেশের শাসন-ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা। নেশন তো শাসনব্যবস্থা থেকে ঢের বড়ো জিনিস। একটি নেশন সু-সংহত হলে সেটা গণতন্ত্রের বিকাশকে দুর্বল করবে কেন ? নেশনের ভিত গড়ার কাজ সেদেশের লোকের বিচারবুদ্ধি অনুসারে গণতন্ত্রের মাধ্যমে বা অন্য কোনো শাসনব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আসতে পারে।

কল্যাণকুমার দত্ত
বি-১১/২০ কল্যাণী, নদীয়া

২

সমালোচক শিবনারায়ণ রায় খুবই প্রয়োজনীয় একটি প্রশ্ন তুলেছেন : প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ একজাতি-একদেশ কিনা। ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক নানা ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই মনে হয়, ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি অহরহ-উচ্চারিত শব্দগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে কি আদৌ জড়িত ? ভারতবর্ষের মতো বহুজাতি-বহু-ভাষা-বহুধর্মকেন্দ্রিক দেশে জাতীয়তার প্রকৃত কনসেপটা কী, তা আমাদের এখন ভেবে দেখার সময় হয়েছে। আমি ভারতীয়, এটা বললেই কি আমার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে যায় ?

শিবনারায়ণবাবু ঠিকই বলেছেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে জিন্না দেখালেন যে ভারতবর্ষ একজাতি-একদেশ নয়। আজ আমরা পানজাব-আসাম-কাশ্মীরের ঘটনাবলীতে যা দেখছি তার তাৎপর্য কী ? এসব ঘটনার শিকড় যে অনেক গভীরে প্রোথিত, তা আজ হয়তো আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছি। এই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

তাপস রায়
দেবগ্রাম, নদীয়া

৩

রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, "'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না, সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যাধিক আদর করিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণে নাই। আমাদের ইতি-হাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না।"

ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থে 'নেশন' কিনা, তার উত্তরের অনেকটাই রবীন্দ্রনাথ দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী অনেক বিদগ্ধজনও 'নেশন' শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। ইতালি, ফ্রান্স, জাপান, যে অর্থে এক-একটা দেশ, এবং সেসব দেশের মানুষেরা এক-একটা জাতি, সে অর্থে ভারতবর্ষ একটা দেশ নয়—জাতি তো নয়ই। ভারতবর্ষ চিরদিনই একটা রাজ্যসমবায় বা ফেডারেশনের মতো থেকেছে। ধর্মীয় প্রভাব বা রাজনৈতিক প্রভাব—কোনোটাই ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলোকে একজাতি-একদেশ-মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করতে পারে নি।

আজকের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ঐক্যের কাঠামো তৈরি করেছিল ব্রিটিশ তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে। বহু জাতিসত্তা একমত হয়ে ভারত-রাষ্ট্র গঠন করেছে। এই ঐক্যমতা ছিল কতগুলো শর্তের অধীন। সেই শর্তগুলোর একটি অপরি-হার্য দিক হল ভারতের সংঘ কখনো কোনো জাতিসত্তার প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করবে না। তবে পানজাব, আসাম, গুজরাত, মণিপুর ইত্যাদি অঙ্গরাজ্য এত বিক্ষুব্ধ কেন ? অতিকেন্দ্রিকতার ঝোঁক এবং কিছু-কিছু রাজ্যের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ আমাদের ফেডারাল কাঠামোর অনেক ক্ষতি করেছে। আজ স্থিরভাবে সমস্ত পরিস্থিতিকে অনু-ধাবন করার সময় এসেছে।

তন্ময় ভট্টাচার্য
ডি-২৯/১১ বৈশাখী আবাসন
সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৬৪

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি মন্তব্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। যাঁরা এ বিষয়ে লিখতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে ২০ অগস্টের মধ্যে লেখা পাঠাবেন। শব্দসীমা ৬০০।